# উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ'-গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সামনে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই নতুন শিক্ষাক্রম এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে নির্বাচনভিত্তিক এই পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি. কর্তক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস. পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের পরম্পরা অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যায়তনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একথা বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির এই বিদ্যায়তনিক উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

**অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার**
উপাচার্য

**Under Graduate Degree Programme**
**Choice Based Credit System**
**Honours in Commerce**
**[B. Com (Hons)/HCO]**
**Management**
**Course Code : [CC-CO-04]**

প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, 2021
First Print : September, 2021

---

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

# পরিচিতি

Bachelor Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা)

**বিষয় : সাম্মানিক বাণিজ্য**
**Subject : B.Com(H)/HCO**

পাঠক্রম : ব্যবস্থাপনা (Management)
**Course Code : CC-CO-04**


**: বিষয় সমিতি :**

**সদস্যবৃন্দ**

**ড. অনির্বাণ ঘোষ**
*Professor of Commerce*
*NSOU (Chairperson)*

**ড. উত্তম কুমার দত্ত**
*Professor of Commerce*
*NSOU*

**ড. সজল কুমার মাইতি**
*Professor of Commerce (PG Dept.)*
*Hooghly Mohsin College*

**ড. আশিস কুমার সানা**
*Professor of Commerce*
*University of Calcutta*

**সি.এ. শুভায়ন বসু**
*Associate Professor of Commerce*
*Ananda Mohan College*

**শ্রী সুদর্শন রায়**
*Assistant Professor*
*NSOU*

**: রচনা :**

**ড. বিশ্বজিৎ ভদ্র**
*Associate Professor of Commerce*
*Nataji Nagar College*

**: সম্পাদনা :**

**ড. উত্তম কুমার দত্ত**
*Professor of Commerce*
*NSOU*

**বিন্যাস সম্পাদনা**
**ড. অনির্বাণ ঘোষ**



**প্রজ্ঞাপন**

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

**কিশোর সেনগুপ্ত**
নিবন্ধক

# নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

## নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা

## (HCO)

## ব্যবস্থাপনা (Management)

## CC-CO-04

### পর্যায় ১


**একক ১** ❑ ব্যবস্থাপনা—কী ও কেন 7–31

**একক ২** ❑ ব্যবস্থাপনার তত্ত্বসমূহ ও নীতিসকল 32–55

**একক ৩** ❑ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ 56–72

**একক ৪** ❑ সংগঠন গড়ে তোলা 73–99


### পর্যায় ২


**একক ৫** ❑ অনুপ্রেরণা 100–116

**একক ৬** ❑ নেতৃত্ব 117–134

**একক ৭** ❑ সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ 135–150

**একক ৮** ❑ জ্ঞাতকরণ 151–157

# একক ১ ❑ ব্যবস্থাপনা—কী ও কেন (Management—What and Why)

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ ব্যবস্থাপনা—অর্থ ও সংজ্ঞা

১.৪ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ

১.৫ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১.৬ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা

১.৭ ব্যবস্থাপনা—কলা না বিজ্ঞান

১.৮ ব্যবস্থাপনা কি পেশা?

১.৯ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী

১.১০ ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতা

১.১১ সারাংশ

১.১২ অনুশীলনী

## ১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারব :

- ব্যবস্থাপনার ভূমিকা, অর্থ ও সংজ্ঞা
- ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব
- ব্যবস্থাপনা—কলা না বিজ্ঞান
- ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী ও সর্বজনীনতা।

## ১.২ প্রস্তাবনা

বর্তমান যুগকে বলা হয় **বিজ্ঞান, বিজ্ঞাপন ও ব্যবস্থাপনার**। ব্যবস্থাপনা প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে জড়িয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ হয়তো বুঝতে পারে না কারণ, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রথাগত ধারনা

বা প্রথাগত শিক্ষায় তারা শিক্ষিত নয়। কিন্তু যে কোন কাজই তারা করুক না কেন, তার পিছেন একটি ভাবনা বা পরিকল্পনা থাকে, কিভাবে কাজটি করবে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কাজের শেষে তারা মিলিয়ে দেখে কি তাদের ভাবনা বা পরিকল্পনা ছিল এবং কাজটি সেই ভাবনা অনুযায়ী কতটা সম্পন্ন হয়েছে। এসমস্তই ব্যবস্থাপনার অঙ্গীভূত। সুতরাং ব্যবস্থাপনা হল **সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি সঠিক ভাবে** সম্পাদন করার ব্যবস্থা করা। বস্তুতঃ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গুণাবলী কমবেশী সমস্ত মানুষের মধ্যেই আছে। তবে এই গুণাবলীকেই ব্যবস্থাপনারূপে আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ বর্তমানে ব্যবস্থাপনা আরও অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান সময়ে মানবসভ্যতা যখন বিংশ শতাব্দীকে অতিক্রম করে একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেছে ব্যবস্থাপনা ধারণার মধ্যেও পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। বিংশ শতাব্দী যেখানে **বস্তুগত প্রযুক্তির** উপর বেশী গুরুত্ব দিত, বর্তমান শতাব্দী বেশী গুরুত্ব আরোপ করে **তথ্য-প্রযুক্তি** (Information Technology) **ব্যবস্থার উপর**। একে সংক্ষেপে **'আই. টি.'** বলা হয়। যদিও ভারতবর্ষে **'আই. টি.'** বলতে এযাবৎকাল **'ইনকাম ট্যাক্স বা আয়করকে'** বোঝাতো এবং একে জড়িয়ে একটি ভয়ের ব্যাপার সাধারণের মনে ছিল। কিন্তু বর্তমানে শব্দটি অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে গৃহীত হয় এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার সাথে শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যমে সার্বিক সাফল্য, অগ্রগতি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। আর এর জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা ও সর্বোপরি কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োগ। আর এসব কাজের মধ্যে প্রাথমিক কাজ হল পরিকল্পনা রচনা করা, যা আবার সঠিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য বর্তমানে ব্যবস্থাপনার অনেকাংশ জুড়ে থাকে সংগৃহীত তথ্যের ব্যবহার বা ব্যবস্থাপনা (Management Information system—MIS)। সঠিক তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্তমানে নির্ভুল পরিকল্পনা যেমন গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার (Decision-making process) মধ্যেও দক্ষতা আনা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমানে ব্যবস্থাপনা বলতে কেবলমাত্র মানসিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নির্দেশদান, পরিকল্পনা প্রণয়ন এসব বোঝায় না। এসব মানসিক প্রক্রিয়ার সাথে আজ যুক্ত হয়েছে মস্তিষ্ক সহায়ক যন্ত্র, যার নাম যন্ত্রগণক বা **কম্পিউটার**। বস্তুতঃ কম্পিউটার আজ আর অপরিচিত শব্দ নয় এবং কেবলমাত্র সহায়ক যন্ত্রই নয়। এর বহুমুখী কার্যকলাপ আজ যেন মানুষকেও অতিক্রম করতে চলেছে। প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ কম্পিউটার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিশ্বজুড়ে কম্পিউটারের সাফল্য এক ধরনের পরিবর্তনের ঢেউ নিয়ে এসেছে যাকে 'Third Wave' বলা হয়। তাই কম্পিউটার ছাড়া আধুনিক ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করা যায় না। এই যন্ত্র বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে, সেগুলি সংরক্ষণ করে, বিশ্লেষণ করে এবং বিভিন্ন জটিল গণনা করে তার ফল (Result) ব্যবহারকারীকে জানিয়ে দেয়। ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও পরিকল্পনা রচনা করা অনেকক্ষেত্রেই সহজ হয়েছে এবং বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা কম্পিউটার ছাড়া অচল না হলেও অনেকাংশেই পঙ্গু বলে মনে করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় ব্যবস্থাপনা হল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় (means to an end)। প্রতিষ্ঠানের সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার উপর—উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনা, আর্থিক

ব্যবস্থাপনা, কর্মী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর। ব্যবস্থাপনা হল প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের হাতিয়ার। একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের নিয়ামক হল ব্যবস্থাপনা। সমীকরণের আকারে প্রকাশ করলে বলা যায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য = ব্যবস্থাপনার দক্ষতা × প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সম্পদের কার্যকারিতা। প্রতিষ্ঠানের সম্পদ প্রচুর থাকলেও কাম্য ব্যবস্থাপনা যদি না থাকে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার মান শূন্য হলে সাফল্যও শূন্য হয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। আবার অন্য ভাবেও বিষয়টি তুলে ধরা যায়। যদি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে ভিত্তি করে ধরি এর মান 1 এবং আর্থিক অন্যান্য সম্পদগুলির জন্য এই মানের ডান দিকে একটি করে শূন্য বসানো যায়। তাহলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাচ্ছল্যের জন্য একটি শূন্য বসালে প্রতিষ্ঠানের মান গিয়ে দাঁড়ায় 10, প্রতিষ্ঠানে দক্ষ কর্মী থাকলে তার জন্য আর একটি শূন্য বসালে প্রতিষ্ঠানের মান গিয়ে দাঁড়ায় 100, প্রতিষ্ঠানের উন্নতমানের যন্ত্রপাতি থাকলে আর একটি শূন্য বসিয়ে, প্রতিষ্ঠানের মান গিয়ে দাঁড়ায় 1000। কিন্তু যদি ব্যবস্থাপনার মান শূন্য হয়, তাহলে ডানদিকে যত শূন্যই বসানো হোক না কেন, মানের কোন পরিবর্তন হয় না, শূন্যই হয়। সেজন্য বর্তমানে ব্যবস্থাপনা ছাড়া সব ধরনের প্রতিষ্ঠানই অচল। অর্থাৎ কেবলমাত্র কারবারী প্রতিষ্ঠানেই নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সরকারী প্রতিষ্ঠানসহ স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল থেকে শুরু করে গ্রামীণ ক্লাব বা সমবায় সমিতি বা ধর্মস্থান প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। **ব্যবস্থাপনাই হল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের চাবিকাঠি।**

## ১.৩ ব্যবস্থাপনা—অর্থ ও সংজ্ঞা

● **অর্থ (Meaning) :** 'ব্যবস্থাপনা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবাচক বিশেষ্যপদ হিসাবে ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠী বা দল (a group of persons)। ব্যবস্থাপনা (managing) ক্রিয়াপদ হিসাবে যখন ব্যবহৃত হয় তখন একে প্রক্রিয়া (process) বোঝায়। এছাড়াও ব্যবস্থাপনা শব্দটি একটি শিক্ষণীয় বিষয় (discipline) ও কাজ (activity) বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে 'ব্যবস্থাপনা' নতুন। সেজন্য ব্যবস্থাপনার কোন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠেনি যা অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়—যেমন হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে IAA (International Accounting Association)। ফলে এরূপ সংগঠন প্রদত্ত ব্যবস্থাপনার আদর্শ কোন সংজ্ঞাও পাওয়া যায় না। এছাড়া 'প্রশাসন' (Administrations) শব্দটিকে অনেক ক্ষেত্রেই 'ব্যবস্থাপনার' (management) পরিবর্তে ব্যবহার করতে দেখা যায়। অনেক বিদগ্ধ লেখকও এই দুই শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন সীমারেখা টানেননি, যদিও প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশেও আমরা দেখি ব্যবস্থাপনা শিক্ষার সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা শিক্ষার শেষে ছাত্রছাত্রীদের যে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা দিয়ে থাকেন সেখানেও এই দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, স্নাতকোত্তর স্তরে কেউ দিয়ে থাকেন M.B.A. (Master of Business Administration), আবার, কেউ দিয়ে থাকেন M.B.M. (Master of Business Management)। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণের মধ্যে একধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

**বস্তুতঃ** 'প্রশাসন' কথাটি আমেরিকায় বেশী ব্যবহৃত হয় এবং ঐ দেশে ব্যবস্থাপনা শিক্ষার শেষে MBA ডিগ্রী দেওয়া হয়। আমেরিকাতে 'প্রশাসন' কথাটি বলতে বোঝায় 'ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন'। অন্যদিকে ইউরোপের

দেশগুলিতে দেখা যায় যে তারা 'কারবার প্রশাসন' (Business administration)-এর বদলে 'কারবার ব্যবস্থাপনা' (Business management) কথাটিই ব্যবহার করতে বেশী পছন্দ করে। সেজন্য ব্রিটেনের ব্যবস্থাপনা শিক্ষার দায়িত্বে থাকা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেন্ট (British Institute of Management)। যাই হোক্ ব্যবস্থাপনার আলোচনা কালে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কথা দুটির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা অগ্রাহ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

আবার ইংরাজীতে 'management' শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয় তাতেও অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল :

(1) আমি যেভাবে হোক একটা **ব্যবস্থা** করে ফেলব (I will **manage** it somehow).

(2) আমি তাদেরকে **বোঝাতে** পারব (I shall be able to **manage** them),

(3) আমি জানি কিভাবে পরিস্থিতির **মোকাবিলা** করতে হবে (I know how to **manage** the situation),

(4) কোম্পানীর **ব্যবস্থাপনা** আমাদের দাবীগুলির ব্যাপারে উদাসীন (**Management** of the company is indifferent to our demands),

(5) আমাদের প্রতিষ্ঠানের **ব্যবস্থাপকরা** রক্ষণশীল (**Management** of our concern are conservative),

প্রথম বাক্য থেকে প্রকাশ পায় যে অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বক্তা সংকট থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারবে। এখানে 'কৌশলগত ব্যাপার' (strategy) হিসাবে ব্যবস্থাপনা ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে বক্তার 'সহমত পোষণের' বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের নিজের মতের সমর্থনে নিয়ে আসার জন্য বক্তা সচেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে তৃতীয় বাক্যে পরিস্থিতির সাথে বক্তার 'অভিযোজন' অর্থাৎ 'মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা' প্রকাশ পেয়েছে। চতুর্থ বাক্যে 'প্রশাসনের উচ্চস্তরে আসীন' ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও ঐ ব্যক্তিদের কোন বিশেষ সমস্যার প্রতি মনোভাব (attitude) প্রকাশ পেয়েছে। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ বাক্যে তাদের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের নিরেট চিন্তা ভাবনা ও পরিবর্তনের প্রতি তাদের অনীহা প্রকাশ পেয়েছে।

যাই হোক্, ব্যবস্থাপনা মূলতঃ তিনটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এগুলি হল—

(1) ব্যবস্থাপনা একটি সর্বোপরি প্রক্রিয়া (overall process), যার দ্বারা একটি কারবারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় (managed);

(2) বিভিন্ন স্তরের (grades) ও বিভিন্ন ধরনের (types) পরিচালন সংক্রান্ত প্রচেষ্টার (managerial effort) ফলই হল ব্যবস্থাপনা; এবং

(3) ব্যবস্থাপনা হল সেসব ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যারা এরূপ প্রচেষ্টার জন্ম দেয় (put forth such effort)।

এছাড়াও ব্যবস্থাপনা হল একটি কাজ (activity) ও একটি শিক্ষণীয় বিষয় (discipline)।

● **সংজ্ঞা (Definition) :**

'ব্যবস্থাপনার একটি আদর্শ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে এটি নতুন ও কোন মৌলিক বিষয় নয়। অর্থনীতি, সমাজনীতি, কলা, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান (psychology) রাশিবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয় থেকে এই বিষয়টি গড়ে উঠেছে। আবার নতুন বিষয় বলে এখনও কোন সর্বগ্রাহ্য আন্তর্জাতিক সংগঠনও গড়ে ওঠেনি। ফলে ব্যবস্থাপনার যেসব সংজ্ঞা আমরা পাই সেগুলির মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান। এর পিছনে কারণ হল যে প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অর্থনীতিবিদরা এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একে **'অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও উৎপাদনের উপাদান'** (Economic process and factor of production) বলেছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা একে বলেছেন **'ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠী বা শ্রেণী'** (class of persons) আর ব্যবস্থাপনাবিদরা একে বলেছেন **'ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি'** (system of authority)।

ব্যবস্থাপনার কয়েকটি গ্রহণযোগ্য ও বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা নিচে তুলে ধরা হল :

**রালফ্ সি ডেভিস্ (Ralph C. Davis)** তাঁর 'The Fundamentals of Top Management' গ্রন্থে ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'ব্যবস্থাপনা হল সর্বক্ষেত্রেই কার্যনির্বাহী নেতৃত্বের কাজ' (management is the function of executive leadership everywhere)।

**লরেন্স এ অ্যপলি (Lawrence A. Appley),** তাঁর 'Management in Action' গ্রন্থে বলেছেন—'অপরের প্রচেষ্টা দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশলই হল ব্যবস্থাপনা' (the art of getting things done through the efforts of other people)।

**পিটারসন্ (E. Peterson)** ও **প্লোম্যান (E.G. Plowman)** তাঁদের 'Business Organisation and Management' গ্রন্থে ব্যবস্থাপনার যে সংজ্ঞাটি তুলে ধরেছেন, সেটি হল—*ব্যবস্থাপনা হল এমন এক কৌশল যার সাহায্যে কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয় এবং কার্যকর করা হয় (...a technique by means of which the purpose and objectives of a particular human group are determined, clarified and effectuated)*।

**হেনরী ফেয়লকে (Henry Fayol)** আধুনিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'General Industrial Management'-এ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'ব্যবস্থাপনা হল পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করা, সংগঠন গড়ে তোলা, আদেশ দেওয়া, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা' (To manage is to forecast and plan, to organise, to command, to co-ordiante and to control)। এছাড়াও অন্য একজায়গায় তিনি বলেছেন, একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা বলতে বোঝায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদগুলির কাম্য সুবিধা আদায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করা এবং ছয়টি অপরিহার্য কাজের বাধাহীন সম্পাদন সুনিশ্চিত করা।

বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনাবিদ **পিটার ড্রাকার (Peter Drucker)** ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলেছেন যে 'ব্যবস্থাপনা হল একটি প্রয়োজনীয়, পৃথক এবং প্রধান প্রতিষ্ঠান যা' সামাজিক ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে।

এটি সম্পদকে উৎপাদনমুখী করার দায়িত্ব নিয়েছে।.....সুতরাং এটি আধুনিক যুগের চেতনাকে প্রতিফলিত করে। **ড্রাকার** (P.F. Drucker) তাঁর বিখ্যাত 'The Practice of Management' গ্রন্থে ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা হিসাবে আরও বলেছেন যে ব্যবস্থাপনা হল বহু উদ্দেশ্য সাধক ব্যবস্থা যা 'কারবার পরিচালন করে, ব্যবস্থাপককে পরিচালনা করে এবং কর্মী ও কাজকে পরিচালনা করে' (Management is a multipurpose organ that manages a business and manages a manager and manages a worker and work)।

উপরের সংজ্ঞাগুলি থেকে এই ধারণাই পাওয়া যায় যে বিভিন্ন সংজ্ঞা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করেছে এবং খুব কম সংজ্ঞাই একে একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া রূপে বর্ণনা করেছে। উপরের সংজ্ঞাগুলির উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনার একটি সুসংহত সংজ্ঞা যদি গড়ে তোলা যায় তাহলে বলা যায় যে—

**ব্যবস্থাপনা হল সে সমস্ত কাজের যোগফল যা উদ্দেশ্য স্থির করে, পরিকল্পনা রচনা করে এবং কর্মসূচী প্রণয়ন করে, কর্মী, অর্থ, কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে, কর্মপ্রক্রিয়ায় তাদের যোগসূত্র স্থাপন বা ব্যবহারের ব্যবস্থা করে এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন এবং কর্মীদের বস্তুগত পুরস্কার এবং মানসিক তৃপ্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে।**

## ১.৪ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ

দু'এক কথায় বলা যায় যে ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্যকলাপ গ্রহণ করে সেগুলি যাতে সঠিক সময়ে, সঠিক দক্ষতায় ও সঠিক ব্যয়ে সম্পাদন করা সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা করা। তাই বলা হয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনই ব্যবস্থাপনার একমাত্র উদ্দেশ্য। যাই হোক্, ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে তিন শ্রেণীর উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। এগুলি হল—

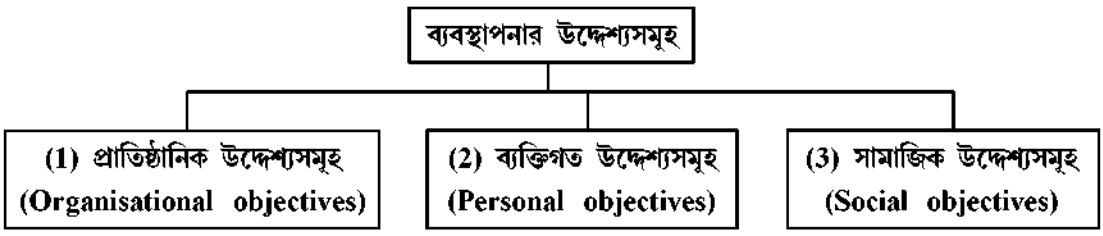


নিচে এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

**(1) প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যসমূহ (Organisational objectives)**

কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে কাজ করে। একটি প্রতিষ্ঠান যে ধরনের কার্যকলাপই গ্রহণ করুক না কেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হল অস্তিত্বরক্ষা (survival ও উন্নয়ন (growth)। এই উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যান্য যেসব উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে অর্থাৎ যেসব উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কাজ করে সেগুলি হল—

(ক) ন্যূনতম প্রচেষ্ঠার প্রয়োগ দ্বারা সর্বাধিক ফল লাভ সুনিশ্চিত করা;

(খ) প্রতিষ্ঠানের মূলধনের কাম্য ব্যবহার ও লগ্নির উপর যাতে ন্যায্য লাভ সুনিশ্চিত করা;

(গ) কারবারের আর্থিক তারল্য (solvency) বজায় রাখার ব্যবস্থা করা;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের যাতে ধারাবাহিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ঘটে তার ব্যবস্থা করা;

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও সুনাম যাতে বৃদ্ধি পায় তার ব্যবস্থা করা; এবং

(চ) সর্বোপরি আর্থিক, মানবিক, ভৌতিক সম্পদের অপচয় রোধ করা।

**(2) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসমূহ (Personal objectives)**

ব্যবস্থাপনা মূলতঃ আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ও মানবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। যেখানেই কর্মীরা দলবদ্ধ ভাবে কাজে নিযুক্ত থাকে ব্যবস্থাপনা সেখানেই কর্মীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দলীয় উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে চালিত করে। প্রতিষ্ঠানে যে বিভিন্ন ধরনের কর্মী কাজ করে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত লক্ষ্য থাকে। কর্মীদের ব্যক্তিগত লক্ষ্যের সাথে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের যাতে বড় ধরনের সংঘাত না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনার কাজ করে। এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলি হল—

(ক) মালিক ও কর্মীদের জন্য সর্বাধিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা,

(খ) কর্মীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও কর্মপরিবেশের ব্যবস্থা করা,

(গ) প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মীদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো,

(ঘ) কর্মীদের চাকুরীর ন্যায়সঙ্গত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

**(3) সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ (Social objectives)**

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সমাজের একটি অংশ এবং প্রতিষ্ঠান সমাজের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই কাজ করে যায়। সমাজের কাছে যে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। সেজন্য ব্যবস্থাপনাকে কেবলমাত্র মালিক ও কর্মীদের প্রতিনিধি হিসাবেই গণ্য করা হয় না, তারা প্রতিষ্ঠানের বাইরের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবেও গণ্য হয়। ব্যবস্থাপনা যেমন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণের স্বার্থে কাজ করে তেমনি সাথে সাথে তাকে সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যেও কাজ করতে হয়। সামাজিক উদ্দেশ্যের মধ্যে যেসব উদ্দেশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল—

(ক) ক্রেতাদের সঠিক গুণমান সম্পন্ন পণ্য বা সেবা সঠিক দামে, সঠিক সময়ে ও সঠিক জায়গায় সরবরাহের ব্যবস্থা করা,

(খ) দ্রুত এবং সততার সাথে সরকারের কর ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা,

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে কাজ করা ও পরিবেশ দূষণ যাতে না ঘটে সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা,

(ঘ) প্রতিযোগী, সরবরাহকারী ও অন্যান্যদের সাথে ভদ্র আচরণ করা ও লেনদেন করা, এবং

(ঙ) সর্বোপরি সমাজের নৈতিক মূল্যবোধকে (ethical values) অটুট রাখার উদ্দেশ্যে কাজ করা।

## ১.৫ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

কোন প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সাথে কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। দক্ষ ব্যবস্থাপনাই প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল রাখে। দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে না পারলে প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে, নানা ধরনের সমস্যা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে ধরে। প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা, উৎপাদনশীলতা, সামগ্রিক সাফল্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। একটি প্রতিষ্ঠানকে যদি মানবদেহের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে ব্যবস্থাপনা হল মানুষের মন। যে কোন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষের মনের এক বিশেষ ভূমিকা থাকে। একে দেখা যায় না কিন্তু মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার ক্ষেত্রে মন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মনহীন মানবদেহ জড়বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়। মন-ই মানুষের বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, উদ্দেশ্যমুখী করে ও সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সর্বাধিক। সেজন্যই ড্রাকার (P.F. Drucker) মন্তব্য করেছেন—'ব্যবস্থাপনা হল কোন প্রতিষ্ঠানের জীবনদায়ী উপাদান, ব্যবস্থাপনা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনযোগ্য সম্পদগুলি কেবলমাত্র সম্পদ হয়েই থেকে যায়, কখনই উৎপাদনে পর্যবসিত হয় না।' ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায় :

**(1) দলীয় উদ্দেশ্যসাধন (Achievement of group goal)**

**(2) সম্পদের কাম্য ব্যবহার (Optimum utilisation of resources)**

**(3) ব্যয়-হ্রাস (Reduction of cost)**

**(4) স্থায়িত্ব ও উন্নয়ন (Survival and growth)**

**(5) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Generation of employment opportunity)**

**(6) জাতীয় উন্নয়ন (National development)**

**(7) সাফল্যের চাবিকাঠি (Key to success)**

**(1) দলীয় উদ্দেশ্যসাধন (Achievement of group goal)**

প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সাধারণতঃ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। এই দলের প্রত্যেক সদস্য সামগ্রিক কাজের একটি অংশ সম্পাদন করে। এই ধরনের প্রত্যেক ব্যক্তি দক্ষতার সাথে নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করলেও তাদের মধ্যে যদি পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তোলা না যায় তাহলে দলীয় উদ্দেশ্য সফল হয় না। ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় ও দলীয় উদ্যম (team-spirit) গড়ে তোলে। ব্যবস্থাপক পরিষ্কার ভাবে কর্মীদের কাছে দলীয় উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এবং প্রতিটি কর্মীকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করে যাতে তারা তাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা দ্বারা দলীয় উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে কাজ করে। এভাবে ব্যবস্থাপকরা দলের প্রতিটি কর্মীকে নেতৃত্ব দেয় ও দলীয় উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করে।

**(2) সম্পদের কাম্য ব্যবহার (Optimum utilisation of resources)**

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই দু'ধরনের সম্পদ থাকে—**বস্তুগত সম্পদ ও মানবিক সম্পদ**। এই সম্পদগুলির সঠিক ব্যবহারের উপরই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। ব্যবস্থাপকরা উভয় প্রকার সম্পদেরই এবং বিশেষ করে মানবিক সম্পদের কাম্য ব্যবহার যাতে সুনিশ্চিত হয় তার ব্যবস্থা করে।

ব্যবস্থাপকরাই প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের সম্পদ কি পরিমানে লাগবে তার পূর্বানুমান করেও সেগুলি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে। একই সাথে তারা সুনিশ্চিত করে যে সংগৃহীত সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কোন সম্পদই অলসভাবে (idle) পড়ে নেই। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের সম্পদগুলি ব্যবহারের জন্য তারা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও কোন পদ্ধতিতে কাজ করলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হবে সে ব্যাপারেও তাঁরা নির্দেশ দিয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে।

**(3) ব্যয়-হ্রাস (Reduction of cost)**

বর্তমান যুগে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে হয়। কারবারে সাফল্য পেতে হলে অবশ্যই কারবারকে প্রয়োজনীয় সেবা বা পণ্যের সরবরাহ সম্ভাব্য ন্যূনতম দামে করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পণ্য বা সেবার উৎপাদন ব্যয় যাতে কমানো যায় সেজন্য দু'ভাবে কাজ করে। প্রথমতঃ তারা উৎপাদনের উপাদানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপচয় রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি, অপচয় নিবারণ ও আনুষঙ্গিক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ব্যবস্থাপকরা তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারেও কম দামে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে ও লাভ অর্জন করতে সহায়তা করে।

**(4) স্থায়িত্ব ও উন্নয়ন (Survival and growth)**

কারবারী জগৎ দ্রুত পরিবর্তনশীল। নতুন নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি কারবারী পরিবেশের মধ্যে নিত্য নতুন পরিবর্তনের সূচনা করছে। কারবারী জগতে সেসব প্রতিষ্ঠানই টিকে থাকতে পারে যারা এই পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে চলতে পারে ও পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ব্যবস্থাপনা যেমন কারবারের বর্তমান পরিবেশের মধ্যে কাজ করে তেমনি ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের গতি, প্রকৃতি সম্পর্কেও পূর্বানুমান করে। এর দ্বারা ভবিষ্যতে কারবারী পরিবেশের মধ্যে যে পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার জন্য প্রতিষ্ঠানকে আগাম প্রস্তুত করে। কারণ পরিবেশের পরিবর্তন প্রতিষ্ঠানের কাছে যেমন ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠতে পারে, তেমনি আবার নতুন সুযোগও নিয়ে আসতে পারে। ব্যবস্থাপনা সেজন্য আগাম সচেষ্ট হয় যাতে ঝুঁকির সম্ভাবনা কমানো যায় ও সুযোগের সম্ভাবনা বাড়ানো যায়। এভাবেই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব, ধারাবাহিকতা এবং উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে।

**(5) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Generation of employment opportunity)**

বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্বও তারাই গ্রহণ করে। আর এর মাধ্যমেই জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপায় হয়। এছাড়াও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে এমন এক কর্ম পরিবেশ গড়ে তোলে যাতে কর্মীরা সেখানে কাজ করে তৃপ্তি পায় ও খুশি হয়। এভাবে ব্যবস্থাপনা কর্মীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে।

**(6) জাতীয় উন্নয়ন (National development)**

প্রতিষ্ঠানের কাছে যেমন দক্ষ ব্যবস্থাপনা অবশ্য প্রয়োজনীয় তেমনি দেশ বা রাষ্ট্রের কাছেও তারা অপরিহার্য। একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অপরিসীম। উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এসব দেশ বহু দক্ষ ব্যবস্থাপক গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ হল এসব দেশে ব্যবস্থাপনা সেভাবে উন্নত হয়নি। কোন দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে সেই দেশে সম্পদ ব্যবহারের গুণগত মানের উপর। কেবলমাত্র মূলধন বিনিয়োগ করে ও প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল আমদানি করেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো যায় না। এর সাথে অবশ্যই দেখতে হয় যে সম্পদ সৃষ্টির উপাদানগুলি দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যবস্থাপকরা সম্পদ উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেন। এর ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পায়। এসব কারণেই ব্যবস্থাপনাকে একটি দেশের অর্থনৈতিক **উন্নয়নের চাবিকাঠী** (Key to economic growth) হিসাবে অভিহিত করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে কারবারী ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব বৃদ্ধির পিছনে যেসব কারণ বর্তমান সেগুলি হল—

(1) কারবারের আয়তন ও জটিলতা বৃদ্ধি;

(2) বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি;

(3) কাজের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বিশেষায়ন (specialisation);

(4) শ্রমিক সংঘের উন্নয়ন;

(5) কারবারী ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি;

(6) মূলধন-নিবিড় শিল্পে পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব;

(7) শক্তি ও কাঁচামালের মত সম্পদের অভাব;

(8) কারবারের ক্রমবর্দ্ধমান সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি।

## ১.৬ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা

বর্তমান যুগে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই—সামাজিক, কারবারী, সরকারী বা অন্যান্য যে ধরণেরই হোক না কেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে কারবারী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম যেহেতু দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে সেহেতু কারবার পরিচালনার ক্ষেত্রে উৎপাদন, বিপণন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজকর্মের সাথে সাথে ব্যবস্থাপনার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দক্ষ ব্যবস্থাপনা কারবারের উন্নতির প্রধান সহায়ক ও নিয়ামক। দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রতিষ্ঠিত কারবারও রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েছে এরূপ বহু নিদর্শন দেশে ও বিদেশে বহু রয়েছে। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব কারবার ও শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বাধা হিসাব কাজ করে। ভারতের রুগ্ন শিল্পগুলির রুগ্নতার পিছনে একটি বড় কারণই হল দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব। অপরদিকে জাপান ও পশ্চিমী দেশগুলির উন্নতির

পিছনে দক্ষ ব্যবস্থাপনার ভূমিকাই প্রধান। এ বিষয়ে ভারতের প্রথম সারির শিল্পপতি ও বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পের পথিকৃৎ **জে. আর. ডি. টাটার** উক্তিটি খুবই **যথার্থ**। তিনি বলেছেন—'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ব্যবস্থাপনার'। প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনাবিদ **পিটার ড্রাকার** (P. Drucker)-ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিচার করতে গিয়ে বলেছেন—'ভূতপূর্ব কলোনীগুলি স্বাধীন দেশ হিসাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে, না সাম্যবাদী দেশগুলির পথ অনুসরণ করতে তা' অনেকাংশে নির্ভর করবে তারা কত দ্রুত দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরি করতে পারবে তার উপর।' তাই, সাম্প্রতিক কালে চীনের মত সমাজতান্ত্রিক দেশও মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে সাথে দক্ষ ম্যানেজার তৈরির উপর গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে চীনে ম্যানেজার তৈরির জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে যাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায়। ব্যবস্থাপনার ভূমিকা নিম্নোক্তভাবেও বিচার করা যায় :

**(1) উৎপাদনের প্রাথমিক উপাদান (Primary factor of production) :** উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা আটটি 'M'-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করি। এগুলি হল কর্মী বা মানুষ (Man), কাঁচামাল (Materials), অর্থ (Money), যন্ত্রপাতি (Machinery), পদ্ধতি (Method), বাজার (Market), প্রেষণা (Motivation) ও ব্যবস্থাপনা (Management)। উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে ব্যবস্থাপনা। সেজন্য ব্যবস্থাপনাকে উৎপাদনের প্রাথমিক উপাদান বলা হয়। অন্যান্য সাতটি উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও ব্যবস্থাপনার অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

**(2) ব্যবস্থাপনা হল কারবারের মন (Management is the mind of business) :** কারবারকে জীবদেহের সাথে তুলনা করলে ব্যবস্থাপনাকে উহার মন (mind) বলা চলে। মন না থাকলে জীবদেহ একটি জড় বস্তুতে পরিণত হয়। তেমনি ব্যবস্থাপনার অভাবে কারবারের কাজকর্মও অচল হয়ে পড়ে। ব্যবস্থাপনা কারবারের মধ্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করে, তাকে কর্মক্ষম করে তোলে ও কারবারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

**(3) সৃজনশীলতা (Creativity) :** কারবারী ক্ষেত্রের এই তীব্র প্রতিযোগিতায় কারবারকে টিকে থাকতে হলে গতানুগতিক ধারায় কাজকর্ম পরিচালনা করলে প্রত্যাশিত ফল (result) পাওয়া সম্ভব যায় না। এজন্য প্রয়োজন নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন। ব্যবস্থাপনা নতুন নতুন পথের সন্ধান করে কারবারের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে।

**(4) অপচয় রোধ (Prevention of wastage) :** উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কারবারের সম্পদের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সঠিক ব্যবস্থাপনার দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং সম্পদের অপচয় রোধে ও সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করতেও এর গুরুত্ব অনেকখানি।

**(5) বিকাশ (Growth) :** কারবারের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ব্যবস্থাপনা উৎপাদন ও বিপণনে যেমন সাফল্য আনে, তেমনি চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে। ব্যবস্থাপনা কর্মীদের প্রতি মানবিক আচরণের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করে ও কারবারে শান্তি স্থাপনে সাহায্য করে। এছাড়াও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করে কারবারের সুনাম ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই কারবারের সার্বিক বিকাশ ঘটে।

**(6) সার্বিক কল্যাণ (Welfare) :** ব্যবস্থাপনা সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে উপযুক্ত গুণমানের পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ করে ভোক্তাদের যেমন সন্তুষ্ট করে তেমনি কর্মীদের কাজের পরিবেশ উন্নত করে তাদের সন্তুষ্ট করে। এভাবে প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সব পক্ষের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে। এগুলি ছাড়াও নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও বণ্টন, মুদ্রাস্ফীতি রোধ ও সরকারের রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা করে দেশের সার্বিক কল্যান সাধনে ব্যবস্থাপনা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**(7) বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক (Friend, Philosopher and Guide) :** ব্যবস্থাপনা হল কাজ সম্পাদনের জন্য নীতি প্রণয়ন ও নীতির প্রয়োগ। প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় বের করে ব্যবস্থাপকরা। সেজন্য প্রতিষ্ঠানের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক রূপে ব্যবস্থাপনাকে চিহ্নিত করা হয়।

সুতরাং দু' এক কথায় বলা যায় প্রতিষ্ঠান বা কারবারের কাজকর্মের সর্বস্তরেই ব্যবস্থাপনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের উন্নতি অসম্ভব। ভারতের মত বিকাশশীল দেশের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর তাৎপর্য অনুধাবনে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ L.L. Robbins-এর একটি উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, "You could have management without development, ..... But you can not have development without management."

## ১.৭ ব্যবস্থাপনা—কলা না বিজ্ঞান

ব্যবস্থাপনা কলা না বিজ্ঞান এব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ একে বলেন বিজ্ঞান, আবার কেউ একে বলেন কলা। বহু বিতর্কের পরেও এ প্রশ্নের পুরোপুরি সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি। মধ্যপন্থীরা এর মাঝামাঝি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলেছেন—**ব্যবস্থাপনা কেবলমাত্র বিজ্ঞান বা কেবলমাত্র কলা নয়, উভয়ের সংমিশ্রণ**। তবে ব্যবস্থাপনাকে যাঁরা বিজ্ঞান বলেন বা যাঁরা কলা বলেন, প্রত্যেকেরই কতকগুলি সুনির্দিষ্ট যুক্তি রয়েছে এবং এগুলিকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। যাইহোক, উভয়েরই মতগুলি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে ব্যবস্থাপনা কলা বা বিজ্ঞান না অন্যকিছু সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

● **বিজ্ঞান হিসাবে ব্যবস্থাপনা (Management as a science)**

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হল 'বিশেষ জ্ঞান' বা 'বিশেষ ভাবে জানা'। এটি হল অভিজ্ঞতা লব্ধ ও রীতিবদ্ধ বিশেষ জ্ঞান। বিজ্ঞান হল কোন নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কিত প্রথাগত জ্ঞানভাণ্ডার। এর মধ্যে সাধারণ নীতি ও সূত্র থাকে যা কোন আশ্চর্যজনক বা বিস্ময়কর ঘটনার (Phenomenon) ব্যাখ্যা দেয়। এই নীতিগুলি দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক (cause-and-effect relationship) স্থাপন করে। এই নীতি ও সূত্রগুলি যেমন অতীত কোন ঘটনার ব্যাখ্যা দেয় তেমনি আবার ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার ব্যাপারেও পূর্বানুমান করতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানের এই নীতি ও সূত্রগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা অনুসরণ করা হয়। বিজ্ঞানের নীতি ও সূত্রগুলির সর্বজনীন প্রয়োগ ও বৈধতা (application and validity) রয়েছে।

সুতরাং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল—

(ক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোনো ঘটনার বিশ্লেষণ করে যে সত্যে উপনীত হওয়া যায় তাই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। এই পরীক্ষিত সত্য থেকেই বিজ্ঞানের নীতি, সূত্র, তত্ত্ব ইত্যাদির সৃষ্টি হয় এবং এগুলিকেই একত্রে বলে বিজ্ঞান।

(খ) বিজ্ঞানের নীতিসমূহ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

(গ) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে কার্য-কারণ সম্পর্ক বিদ্যমান বিজ্ঞান সে ব্যাপারে আলোকপাত করে।

(ঘ) বৈজ্ঞানিক নীতি বা সূত্রসমূহ পরীক্ষিত সত্য এবং এদের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ পূর্বানুমান করা সম্ভব।

এখন দেখা যাক্ ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি কতখানি মেনে চলে বা পূরণ করে। তাহলেই বোঝা যাবে ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞান বলা যাবে কি বলা যাবে না।

**(1) রীতিবদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার (Systematic body of knowledge) :** ব্যবস্থাপনার একটি রীতিবদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার রয়েছে যা সাধারণ নীতি ও কলাকৌশল সমৃদ্ধ। এই নীতি ও কলাকৌশলগুলি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপকদের কাছে পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে এবং বিভিন্ন ঘটনা মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।

**(2) নীতিসমূহের সর্বজনীনতা (Universality of principles) :** বৈজ্ঞানিক নীতিসমূহ কোন বিশেষ বিষয়ের অনুসন্ধান সম্পর্কিত বিশেষ ঘটনা তুলে ধরে। এই নীতিগুলি সকল পরিস্থিতিতে ও সব সময়েই প্রয়োগ করা যায় এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেও যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ অভিকর্ষের সূত্র অনুসারে যদি কোন জিনিসকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যায় তাহলে তা আবার মাটিতে ফিরে আসে। এর পিছনে কারণ হল যে পৃথিবী তার উপরিস্থিতি সমস্ত বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এই ঘটনা পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় এবং সব সময়েই ঘটতে থাকে।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপনার মধ্যে অনেকগুলি মৌলিক নীতি রয়েছে যেগুলি সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যায়। যেমন, নির্দেশের একতার নীতি অনুসারে একজন কর্মী কেবলমাত্র একজন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকেই নির্দেশ পাবে এবং একজনের কাছেই জবাবদিহি করবে। এই নীতিটি সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োগ করা যায় এবং সকল দেশেই অনুসৃত হয়। তবে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলিকে পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নবিদ্যার নীতিগুলির মত একই শ্রেণীতে ফেলা যায় না। কারণ বিজ্ঞানের নীতিগুলি অনমনীয়, কিন্তু ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি নমনীয় (flexible)। এর পিছনে কারণ হল ব্যবস্থাপনা হল সমাজবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের মত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়। সেজন্য ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিমার্জনের প্রয়োজন হয়।

**(3) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা (Scientific enquiry and experiments) :** বৈজ্ঞানিক সূত্র ও নীতিগুলি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও পরীক্ষালব্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়। এতে সমস্যাজনক পরিস্থিতির নিরপেক্ষ (Unbiased) মূল্যায়ন করা হয় এবং সমস্যা সমাধানের জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বৈজ্ঞানিক নীতি বা সূত্র কোন ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব মতামত তুলে ধরে না। এগুলি বারে বারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং বারে বারে একই ফল পেলে তবেই নীতিরূপে গ্রাহ্য

হয়। উদাহরণস্বরূপ পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত বলেই এটি বিজ্ঞানের নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলিও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে। কোন কোন নীতি যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে তেমনি অনেক নীতি বহু ব্যবস্থাপকের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল হিসাবেও গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে যখন একজন কর্মী দুই বা ততোধিক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একই সাথে নির্দেশ পায় তখন নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

**(4) কার্য-কারণ সম্পর্ক (Cause-effect relationship) :** বৈজ্ঞানিক নীতিগুলি কোন ঘটনায় জড়িত বিষয়গুলির মধ্যে যে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে সেগুলি ব্যাখ্যা করে। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা সৃষ্টিতে আলোর প্রতিসরণ কিভাবে কাজ করে, 4° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কেন জলের ঘনত্ব সর্বাধিক হয় বা দুটি বরফ খণ্ডকে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে কেন জোড়া লেগে যায় ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলিও বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটলে ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা ও দক্ষতা হ্রাস পায়।

**(5) পূর্বানুমান ক্ষমতা ও বৈধতার পরীক্ষা (Tests of predictability and validity) :** বৈজ্ঞানিক নীতির বৈধতা যেকোন সময় ও যতবার খুশী পরীক্ষা করা যায় এবং প্রতিবারই পরীক্ষায় একই ফল পাওয়া যায়। আবার, বৈজ্ঞানিক সাহায্যে কোন বিষয়ে পূর্বানুমান অনেকখানি নির্ভুলভাবে করা যায়। অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপনার নীতিরও বৈধতার পরীক্ষা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'নির্দেশের একতা' নীতিটি দুজন কর্মচারীকে নিয়ে পরীক্ষা করা যায়। একজন কর্মচারীকে একজন ব্যক্তিই নির্দেশ দেবেন এবং অপর কর্মচারীকে দু'জন ব্যক্তি নির্দেশ দেবেন। দেখা যাবে যে প্রথম ব্যক্তির সম্পাদিত কাজ দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্পাদিত কাজের চেয়ে বেশী।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্যবস্থাপনা একটি বিজ্ঞান। এরও একটি রীতিবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার আছে এবং এর সাধারণ নীতিগুলি সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। এই নীতিগুলি পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ। তবে পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়ন বা জীবনবিজ্ঞান যে অর্থে বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ঠিক সেই অর্থে বিজ্ঞান নয়। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদিকে বলা হয় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (Pure science) কিন্তু ব্যবস্থাপনা হল সমাজবিজ্ঞান (Social science) বা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় আচরণগত বিজ্ঞান (behavioural science)। বস্তুতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি যে অর্থে বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনাও সেই একই অর্থে বিজ্ঞান। একে বলা হয় নরম বিজ্ঞান (soft science)। মানুষের আচরণকে কেন্দ্র করে ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে বলে এর নীতিগুলি পরিস্থিতি ভেদে পরিমার্জিত হয় এবং সেজন্য নমনীয় (flexible), বিজ্ঞানের মত অনমনীয় (rigid) নয়। সেজন্যই ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি সর্বজনীন হলেও সকল পরিস্থিতিতে যে একই ফল পাওয়া যাবে তা কিন্তু আশা করা যায় না, সামান্য বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে **ব্যবস্থাপনা একটি সমাজবিজ্ঞান (social science), একটি আচরণগত বিজ্ঞান (behavioural science) ও নমনীয় বিজ্ঞান (soft science)**।

● **কলা হিসাবে ব্যবস্থাপনা (Management as an art)**

কলা হল অধীন জ্ঞানের প্রয়োগ। অর্থাৎ কলা বলতে বোঝায় এরূপ জ্ঞান বা মানবিক দক্ষতা যা অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ব করতে হয়। জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফললাভের প্রচেষ্টাই হল কলা। বিজ্ঞানে **'পরীক্ষা'** বেশী গুরুত্ব পায়, কিন্তু কলার ক্ষেত্রে **'প্রয়োগ'** (Application) বেশী গুরুত্ব পায়। কলার উপাদান মূলতঃ দুটি—**ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা** ও **কর্মদক্ষতা**। সৃজনশীলতা যেখানে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত চারিত্রিক উপাদান, কর্মদক্ষতা হল অভ্যাসের ফসল। বারেবারে অভ্যাস ও প্রয়োগের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি কলাবিদ্যায় পারদর্শী হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষানবিশী যখন গান শেখে তখন সে স্বরলিপির সাহায্যে গানের রেওয়াজ করে। এভাবেই একদিন সে নিজেকে গায়ক হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পারে। এখানে স্বরলিপিকে ব্যবস্থাপনার নীতির সাথে তুলনা করা যায় এবং এর প্রয়োগকে কলা বলে গণ্য করা হয়। কলার অপরিহার্য উপাদানগুলি হল—

(1) বাস্তবিক জ্ঞান;

(2) ব্যক্তিগত দক্ষতা;

(3) ফলাফল ভিত্তিক কর্মধারা;

(4) সৃজনশীলতা ও

(5) ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নয়ন।

এখন দেখা যাক ব্যবস্থাপনার মধ্যে কলার উপরোক্ত উপাদানগুলি বর্তমান রয়েছে কিনা। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা কলার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি কতটা পূরণ করতে সম্ভব হয় এবং এর থেকেই বোঝা যাবে যে ব্যবস্থাপনাকে কলা হিসাবে অভিহিত করা যায় কিনা।

**(1) বাস্তবসম্মত জ্ঞান (Practical knowledge) :** প্রত্যেক কলারই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল বাস্তবসম্মত জ্ঞান। একজন কলাবিদ কেবলমাত্র তত্ত্বই শেখে না তার সাথে বাস্তবে এর প্রয়োগও শেখে। তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগ এই উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শী হলে তবেই তাকে দক্ষ কলাবিদ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ডাক্তার যে চিকিৎসার তত্ত্বগত জ্ঞান কোন প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করেনি তাকে বলা হয় **হাতুড়ে ডাক্তার,** আবার প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু কর্মজগতে বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পারে না এমন ডাক্তারকে বলা হয় **আনাড়ি ডাক্তার।** কেবলমাত্র যারা প্রথাগত শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে তার শিক্ষার্জিত জ্ঞান প্রয়োগে দক্ষতা দেখা পারে তাদেরই বলা হয় **বিশেষজ্ঞ ডাক্তার।** অর্থাৎ একজন ডাক্তার কেবলমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন করলেই ভাল ডাক্তার হতে পারে না। বাস্তবে ঐ জ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখানোর উপরই তার সাফল্য নির্ভর করে। অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপনা শিক্ষায় ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা অর্জন করলেই ভাল ব্যবস্থাপক হওয় যায় না। বাস্তব জীবনে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে তার জ্ঞান প্রয়োগে দক্ষতার উপরই ব্যবস্থাপকের সাফল্য নির্ভর করে। সুতরাং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও কলার মতই বাস্তবিক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে।

**(2) ব্যক্তিগত দক্ষতা (Personal skill) :** প্রত্যেক কলাবিদের কাজ করার একধরনের নিজস্ব শৈলী থাকে। বিভিন্ন কলাবিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এক হলেও কাজের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু সমানভাবে সফল হয় না।

এই পার্থক্যের কারণ হল তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতার পার্থক্য। যেমন আমাদের রাজ্যের সঙ্গীত জগতে অনেক উচ্চমানের গায়ক থাকা সত্ত্বেও স্বর্গীয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। অনুরূপভাবে, ব্যবস্থাপনাও ব্যক্তি সম্বন্ধীয়। প্রত্যেক ব্যবস্থাপকেরই কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের একটি নিজস্ব ধারা থাকে। একজন ব্যবস্থাপকের সাফল্য তার জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে না, তার ব্যক্তিগত দক্ষতার উপরও নির্ভর করে।

**(3) ফলাফল ভিত্তিক কর্মধারা (Result-oriented approach) :** কলা সবসময়ই সঠিক ফল লাভ করতে চায়। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াও অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যেই কাজ করে। প্রত্যেক ব্যবস্থাপকই প্রত্যাশিত ফললাভের জন্য যেমন তার জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটায় তেমনি তার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যও কাজে লাগায়। এজন্যই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবস্থাপকরা কর্মী, অর্থ, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করে।

**(4) সৃজনশীলতা (Creativity) :** কলা মূলতঃ সৃজনমূলক। একজন কলাবিদ এমন কিছু সৃষ্টি করতে চান যার অস্তিত্ব এখনো পর্যন্ত নেই, অর্থাৎ যা কিনা নতুন ধরনের। সেজন্য কলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কল্পনা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য প্রতিটি কলার মতই ব্যবস্থাপনাও সৃষ্টিধর্মী। একজন ব্যবস্থাপক উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলি কার্যকর ভাবে সংযুক্ত ও সমন্বয় করে পণ্য এবং সেবা উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মীর কাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণকে এমনভাবে পরিচালিত করেন যাতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য সহজেই সফল হয়। আর ব্যবস্থাপকদের এধরনের কাজ উচ্চমানের কলার পর্যায়ে পড়ে।

**(5) ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নয়ন (Improvement through continuous practice) :** অধীত বিদ্যার প্রয়োগ তথা অনুশীলনের মাধ্যমেই শিক্ষা সম্পূর্ণতা পায়। বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে একজন আরও দক্ষ হয়ে ওঠে। যেমন, একজন নর্তকী ধারাবাহিকতার সাথে তার নাচ অনুশীলনের মাধ্যমে নাচে দক্ষ হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে, একজন ব্যবস্থাপকও কার্যক্ষেত্রে তার জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ও আরও দক্ষ হয়ে ওঠে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কলা হিসাবে গণ্য হয়। আবার ব্যবস্থাপনা হল 'অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল' এবং যেহেতু বিভিন্ন মানুষের আচরণে বিভিন্নতা দেখা যায়, তাই ব্যবস্থাপককে অবশ্যই কলাবিদ্যায় পারদর্শী হতে হয়। অন্যথায় কর্মীদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না। ব্যবস্থাপকরা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই জটিল কাজ করতে সমর্থ হয় এবং জটিল কাজ সম্পাদনই একে কলার পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

### ● ব্যবস্থাপনা কলা ও বিজ্ঞান-উভয়ই (Management is both art and science)

'কলা হিসাবে ব্যবস্থাপনা' ও 'বিজ্ঞান হিসাবে ব্যবস্থাপনা' আলোচনাকালে দেখা গেছে যে ব্যবস্থাপনার মধ্যে কলা ও বিজ্ঞান উভয়েরই বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে। এটিকে কেবলমাত্র বিজ্ঞান বা কেবলমাত্র কলা হিসাবে অভিহিত করা যায় না। রীতিবদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে এটি **বিজ্ঞান,** আবার এই জ্ঞানের বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি **কলা।** আর এজন্যই বলা হয় ব্যবস্থাপনা একাধারে বিজ্ঞান ও কলা উভয়ই। এ যেন **'দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি'** (two leaves and one bud)। যার পাতা দুটি হল কলা ও বিজ্ঞান এবং কুঁড়িটি হল

ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কলা ও বিজ্ঞান হল পরস্পরের পরিপূরক, প্রতিপক্ষ নয়। বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় **'জানতে'** (to know) আর কলা ছাড়া বিজ্ঞান হল জ্ঞানের অপচয় (Art without science has no guide and science without art is wastage of knowledge)।

উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি ভাল শল্যবিশারদ হতে পারে না যদি তার মানবশরীর সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকে এবং তার জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অপারেশন টেবিলে দক্ষতা ও নৈপুণ্য দেখাতে না পারে। অনুরূপভাবে একজন সফল ব্যবস্থাপককে অবশ্যই ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি যেমন জানতে হবে, তেমনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে এই নীতিগুলি প্রয়োগের দক্ষতাও অর্জন করতে হবে। ব্যবস্থাপনার নীতি ও তত্ত্ব জানা জরুরী, কিন্তু এই জ্ঞানকে কার্যকরী করতে হলে তার বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটানো দরকার। একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি ভালভাবে রপ্ত করলেই ভাল ব্যবস্থাপক হতে পারে না। ব্যবস্থাপনার সাফল্যের জন্য বিজ্ঞান (নীতি ও তত্ত্ব) এবং কলা (প্রয়োগ) উভয়েরই প্রয়োজন।

পরিশেষে অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ সম্পর্কিত একটি মন্তব্য তুলে ধরে আমরা এই আলোচনা শেষ করব। তিনি বলেছেন—'ব্যবস্থাপনা শুধু কলা-কৌশল নয়, আবার বিজ্ঞানও নয়, এ-দু'য়ের সংমিশ্রণ। কলা-কৌশল ও বিজ্ঞান—এরা যেন দুটি যমজ সন্তান। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভাল হতে পারে না। একদিকে বিশেষ শিক্ষা ভাবী ব্যবস্থাপকের মধ্যে নতুন নতুন ধ্যান ধারণার সৃষ্টি করে, অপরদিকে সেই শিক্ষণ অভিজ্ঞতার পুণ্য স্পর্শে সে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।' সেজন্য ব্যবস্থাপনাকে যথার্থভাবেই বলা হয় **'প্রাচীনতম কলা ও নবীনতম বিজ্ঞান'** (Oldest of the arts and youngest of the sciences)।

## ১.৮ ব্যবস্থাপনা কি পেশা?

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি **এ. লরেন্স লয়েল** (A Lawrence Lowell) মন্তব্য করেছিলেন যে ব্যবস্থাপনা হল **প্রাচীনতম কলা** ও **নবীনতম পেশা** (the oldest of the arts and the newest of professions)। **মেরী পার্কার ফলেট** (M. P. Follet) তাঁর 'Management as a profession' শীর্ষক প্রবন্ধে গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন—'মানুষ অবশ্যই তাদেরকে পেশার জন্য ততটাই যত্নের সাথে তৈরি করবে যতটা তারা অন্য ব্যাপারে করে থাকে। পেশাজীবী হিসাবে তারা সমাজের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে।' **জেমস বার্নহাম** (James Burnham) বলেছিলেন যে 'ব্যবস্থাপকরা পেশাজীবীদের অভিজাত গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠছে' (Managers are becoming an elite of professionals)। **ফরচুন** (Fortune) পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন 'ব্যবস্থাপনা পেশা হিসাবে গড়ে উঠছে'। অর্থাৎ বিগত শতকে ব্যবস্থাপনাকে অনেকেই পেশা হিসাবে দেখতে শুরু করেছিলেন।

ব্যবস্থাপনা পেশা কিনা এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রথমেই 'পেশা' বলতে কি বোঝায় তা জানা দরকার। **Webster's Dictionary**-তে পেশার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'এমন এক বৃত্তি যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তার অর্জিত বিশেষ জ্ঞানের দক্ষতার প্রকাশ ঘটায় অপরকে নির্দেশ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে অথবা সেবা দিয়ে।' **হর্ণবি** (A. S. Hornby) পেশার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন পেশা হল 'এমন এক বৃত্তি যাতে বিশেষ শিক্ষা ও

বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।' **অ্যালেন** (Louis A. Allen) পেশাজীবী ব্যবস্থাপকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'যেসব ব্যক্তি পরিকল্পনা প্রণয়নে, সংগঠন গড়ে তুলতে, নেতৃত্ব দিতে এবং অন্যের প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বিশেষায়ন (specialisation) অর্জন করেছে এবং এসব করার জন্য রীতিবদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটায় এবং একটি সাধারণ নীতি মেনে চলেন তাকেই পেশাজীবী ব্যবস্থাপক বলে।'

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্যপক সমীক্ষার পর **ডঃ আব্রাহাম ফ্লেক্সনার** (Dr. Abraham Flexner) পেশার কয়েকটি মান নির্ধারক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছিলেন, এগুলি হল :

(1) একটি বিশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকবে এবং তা শেখার জন্য একটি অনুমোদিত শিক্ষাক্রম থাকবে;

(2) পেশায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য উপযুক্ত মানের যোগ্যতা থাকতে হবে;

(3) পেশাজীবীদের নিজেদের মধ্যে, জনসাধারণের সাথে ও মক্কেলদের সাথে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি উপযুক্ত মানের আচরণবিধি থাকবে;

(4) বৃত্তির মধ্যে সামাজিক দায়িত্বের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং জনস্বার্থে তা ব্যবহৃত হবে; এবং

(5) একটি সমিতি বা সমবায় থাকবে যা পেশায় যুক্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক স্বার্থ দেখার সাথে সাথে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টির উপরও লক্ষ্য রাখবে।

সংক্ষেপে বলা যায় পেশার অপরিহার্য উপাদানগুলি হল নিম্নরূপ :

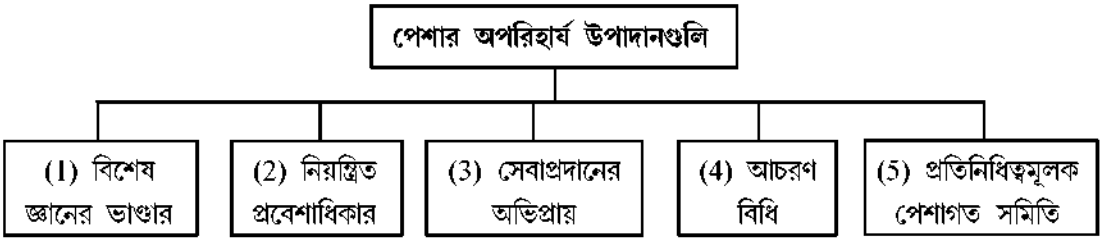


এখন দেখা যাক ব্যবস্থাপনার মধ্যে এই উপাদানগুলি কতখানি বর্তমান।

**(1) বিশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডার (Body of specialised knowledge) :** প্রত্যেক পেশারই একটি বিশেষ রীতিবদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকে এবং এই জ্ঞান ভাণ্ডার বিশেষায়নের সাথে সম্পর্কিত। পেশায় যুক্ত ব্যক্তিদের ঐ জ্ঞান ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত নীতি ও পদ্ধতিগুলি আয়ত্ব করতে হয়। উপরন্তু তাকে পেশায় দক্ষতা অর্জন করার প্রচেষ্টা চালাতে হয়।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ ধরনের জ্ঞান ভাণ্ডার রয়েছে। একজন ব্যবস্থাপককে অবশ্যই ব্যবস্থাপনার বিজ্ঞানকে ভালভাবে জানতে হয়। এছাড়াও এই জ্ঞান জটিল সমস্যা সমাধানে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করতে হয়। বর্তমানে ব্যবস্থাপনা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিক্ষণীয় বিষয়, হিসাবে ও রীতিবদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

**(2) নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার (Restricted entry) :** বৃত্তি হিসাবে পেশাকে গ্রহণ করা অবাধ নয়। যে কেউ ইচ্ছা করলেই পেশায় নিযুক্ত হতে পারে না। পেশাসংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। শিক্ষার নির্দিষ্ট পাঠক্রম শেষ না করে কেউ পেশায় প্রবেশাধিকার পায়

না। উদাহরণস্বরূপ একজন ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ না করে ডাক্তারী পেশায় ঢুকতে পারে না। অনুরূপভাবে আইন পাশ না করে কেউ ওকালতি করতে পারে না।

বর্তমানে দেশে এবং বিদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যারা ব্যবস্থাপনার নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে শিক্ষাদান করে। ব্যবস্থাপনায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা সফল ব্যবস্থাপক হওয়ার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পায়। এর ফলে কারবার পরিচালনা সংক্রান্ত জটিল সমস্যা সমাধান করা তাদের পক্ষে সহজ হয়। তবে আমাদের দেশের কোন আইনেই ব্যবস্থাপকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে কোন নির্দেশ না দেওয়ায় ব্যবস্থাপকদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়, যা অন্য পেশায় দেখা যায় না। তাই এখনো পর্যন্ত বৃত্তি হিসাবে ব্যবস্থাপনাকে গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। এখনও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার লক্ষ্য করা যায়।

**(3) সেবা প্রদানের অভিপ্রায় (Service motive) :** একথা সত্য যে পেশাকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। পেশাজীবীরা জাতির প্রতি সেবা প্রদানের ইচ্ছা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েও পেশাকে গ্রহণ করে। যেমন একজন ডাক্তার ডাক্তারী থেকে তাঁর জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু ডাক্তার কখনই কেবলমাত্র অর্থ-উপার্জনেই জন্যই রোগীর চিকিৎসা করেন না। অন্যের কষ্ট লাঘব করার মধ্য দিয়ে জাতির প্রতি সেবা প্রদানের ইচ্ছাও তাঁকে ডাক্তারী করতে উৎসাহিত করে। এভাবে পেশা জাতির অনুমোদন ও সমাজের শ্রদ্ধা লাভ করে।

অনুরূপভাবে একজন ব্যবস্থাপক সমাজের এক বিশেষ শ্রেণী হিসাবে মর্যাদা পেয়ে থাকে। এরা বিশৃঙ্খল অবস্থাকে শৃঙ্খলায়, প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল অবস্থায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। শিল্পে নিযুক্ত ব্যবস্থাপকরা কেবলমাত্র মালিকের প্রতিই দায়বদ্ধ থাকেন না। সমাজ তাঁদের কাছে আশা করে যে তাঁরা উন্নতমানের পণ্য ন্যায্য উৎপাদন ব্যয়ে উৎপাদনের ব্যবস্থা করবেন এবং এভাবে সমাজের কল্যাণের স্বার্থে তাঁরা কাজ করবেন।

**(4) প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতি (Representative association) :** প্রত্যেক পেশারই একটি বিধিবদ্ধ সমিতি বা প্রতিষ্ঠান থাকে যা' পেশাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ, The Institute of Chartered Accountants of India নিরীক্ষকদের উপযুক্ততার মান নির্ধারণ করে ও মান নিয়ন্ত্রণ করে।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ভারতে এবং বিদেশে সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে। ব্যবস্থাপকরা তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়মিত বিনিময়ের জন্যও বিভিন্ন সমিতি গড়ে তুলেছেন। ভারতেও All India Management Association গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ব্যবস্থাপকদের কাজকর্মে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই সমিতির হাতে কোন বিধিবদ্ধ ক্ষমতা (statutory power) নেই। এমনকি তাদের কাজকর্ম মূল্যায়নের জন্য কোন সর্বজনগ্রাহ্য মানক (standard) এখানো তৈরি করা হয়নি। এমনকি ব্যবস্থাপক হতে হলে এই সমিতির সদস্য হতে হবে এরকম কোন বাধ্যবাধকতাও নেই।

**(5) আচরণবিধি (Code of conduct) :** প্রত্যেক পেশারই একটি আচরণবিধি থাকে। এই আচারণ বিধি কতকগুলি নিয়মকানুন নিয়ে গঠিত যেগুলি পেশার আদর্শ, সততা ও পেশাগত নৈতিকতা রক্ষা করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট তার ফার্মের জন্য বাণিজ্যিক ভাবে বিজ্ঞাপন দিতে পারে না।

পেশাজীবিদের সমিতি এই আচরণবিধি তার সদস্যদের মেনে চলার নির্দেশ দেয়। সদস্যরা তা মেনে না চললে পেশার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত (disqualified) বলে গণ্য হয়। সমিতি এরূপ সদস্যকে শাস্তি দিতে পারে, এমনকি তার সদস্যপদও বাতিল করতে পারে।

অনুরূপভাবে The All India Management Association-ও ব্যবস্থাপকদের জন্য একটি আচরণবিধি গড়ে তুলছে। এতে উল্লেখ আছে যে ব্যবস্থাপকরা অবশ্যই তাদের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করবে। ব্যবস্থাপকরা প্রতিষ্ঠানের কোন **'ব্যবসা সংক্রান্ত গোপনীয়তা'** (trade secret) প্রকাশ করবে না। এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ থেকে **'ব্যক্তিগত স্বার্থ'** (personal gain) চরিতার্থ করতে পারে না। কিন্তু এই আচরণবিধির আইনগত কোন অনুমোদন নেই।

উপরের আলোচনা থেকে প্রকাশ পায় যে ব্যবস্থাপনা পেশার বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলিই পূরণ করে। কিন্তু অন্য পেশার মত নতুন ব্যবস্থাপকের প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। এমনকি ব্যবস্থাপকদের কোন ন্যূনতম যোগ্যতাও স্থির করা হয়নি। কোন ব্যবস্থাপনা সমিতি তার সদস্যদের **'সার্টিফিকেট অব্ প্র্যাকটিস'** দেবার বা নতুন ব্যবস্থাপকদের প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষমতা পায় নি। এমনকি সমিতি তার প্রবর্তিত আচরণবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন আইনানুগ অধিকার ভোগ করে না। এছাড়াও ব্যবস্থাপকদের এমন কোন সমিতি নেই যাতে অধিকাংশ ব্যবস্থাপক সদস্য হয়েছে এবং যে সমিতি আইন দ্বারা অনুমোদিত। এমনকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকরা যাদের প্রতি আনুগত্য দেখাবেন তারা একাধিক শ্রেণীভুক্ত। অন্যান্য পেশাজীবীরা কেবলমাত্র একটি শ্রেণীর প্রতিই তাদের আনুগত্য দেখান, যেমন ডাক্তার তার রুগীর প্রতি, উকিল তার মক্কেলের প্রতি, কিন্তু একজন ব্যবস্থাপককে অনুগত থাকতে হয় তার মালিকের প্রতি, কর্মচারীদের প্রতি, প্রতিষ্ঠানের প্রতি, এমনকি সমাজের প্রতি।

সুতরাং অন্যান্য পেশার মত ব্যবস্থাপনাকে, প্রকৃত অর্থে, সম্পূর্ণভাবে পেশা বলে গণ্য করা যায় না। ডাক্তার, উকিল, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইত্যাদি যে অর্থে পেশাজীবী, ব্যবস্থাপকরা সেই অর্থে পেশাজীবী নন। তবে একথা নিশ্চয় বলা যায় যে ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি পেশা না হলেও পেশার দিকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে এবং অদুর ভবিষ্যতে অন্যান্যদের মত এটিও পেশার স্বীকৃতি পাবে। সেজন্য **ক্লড় এস. জর্জ** (Claude S. George) মন্তব্য করেছেন—"Management is not outright a profession but it is taking a giant step in that direction." অর্থাৎ ব্যবস্থাপনাকে পুরোপুরি পেশা বলা যায় না, তবে ওইদিকে একটি বড় পদক্ষেপ।

## ১.৯ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী

আধুনিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম পথিকৃৎ **হেনরী ফেয়ল** (Henry Fayol) 1916 সালে তাঁর বিখ্যাত 'Administration Industriellet general' গ্রন্থে ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পর্কে লিখেছিলেন 'To manage is

to forecast and plan, to organise, to command, to co-ordinate and to control'। অর্থাৎ 'ব্যবস্থাপনার কাজ হল পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করা, সংগঠন করা, আদেশ দেওয়া, সমন্বয় করা ও নিয়ন্ত্রিত করা।'

**লুথার গালিক** (Luther Gullick), যিনি আমেরিকার জাতীয় জন-প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের (National Institute of Public Aministration) প্রথম সভাপতি ছিলেন ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ছিলেন, তিনি ফেয়লের চিন্তাধারা গ্রহণ করে ব্যবস্থাপনার কাজের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। প্রতিটি কাজের প্রথম অক্ষর নিয়ে তিনি '**PODSCORB**' নামে একটি শব্দ গঠন করেছিলেন। অর্থাৎ এই শব্দের '**CO**' ছাড়া প্রতিটি অক্ষর এক একটি কার্যনির্বাহী দায়িত্ব বা কাজকে সূচীত করে। এগুলি হল—

**(1) পরিকল্পনা (P for Planning) :** প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যেসব কাজ করা দরকার তার ব্যাপক রূপরেখা অর্থাৎ পরিকল্পনা তৈরি করা ও কিভাবে সেগুলি করা হবে তা স্থির করা। এটি হল ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক কাজ।

**(2) সংগঠন (O for Organising) :** প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিধিসম্মত সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের বণ্টন সম্পন্ন হয়।

**(3) নির্দেশদান (D for Directing) :** ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেগুলি সাধারণ বা নির্দিষ্ট আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন পক্ষকে জানানো এবং তাদের নেতৃত্ব দেওয়া হল নির্দেশদান।

**(4) কর্মীসংক্রান্ত (S for Staffing) :** এটি হল ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কর্মীদের নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে কর্মীসংক্রান্ত সকল কাজই ব্যবস্থাপনার কাজের অন্তর্ভুক্ত।

**(5) সংযোজন বা সমন্বয় সাধন ('Co' for Co-ordinating) :** ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কাজ হল সমন্বয়সাধন এর মাধ্যমে কাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও ভারসাম্য গড়ে তোলা হয়।

**(6) রিপোর্টিং (R for Reporting) :** কার্যনির্বাহী ব্যবস্থাপকরা কাজের ক্ষেত্রে যাদের প্রতি দায়বদ্ধ তাদেরকে প্রতিবেদনের মাধ্যমে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

**(7) বাজেট প্রণয়ন (B for Budgeting) :** অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সম্পদের ব্যবহার পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে যাতে হয় তার জন্য বাজেট তৈরি করা এবং প্রতিটি কাজ বাজেট অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা দেখার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ বলে গণ্য হয়।

**লুথার গালিক** (Luther Gullick) এই যে সাত ধরনের কাজ উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে দেখা যায় যে কর্মী-সংক্রান্ত কাজটি (Staffing) প্রকৃতপক্ষে সাংগঠনিক কাজেরই বর্দ্ধিত রূপ। অনুরূপভাবে রিপোটিং ও বাজেট প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসাবে গণ্য হয়, কাজেই নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। তবে এগুলির সাথে ব্যবস্থাপনার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যুক্ত করা যায় সেটি হল **অনুপ্রেরণা বা অনুপ্রাণিতকরণ** (Motivation)। কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ও উদ্দেশ্যসাধনে তাদের মুখ্য ভূমিকার কারণে এবং ব্যবস্থাপনার মানবিক সম্পর্কের গুরুত্বের কারণে বর্তমানে এই কাজটি ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে গণ্য হয়।

## ১.১০ ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতা

ব্যবস্থাপনার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল 'সর্বজনীনতা' (Universality) ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতা বলতে বোঝায় স্থান ভেদে, কালভেদে, কালভেদে ও প্রতিষ্ঠানভেদে যে কোন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বা উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ যেখানেই মানবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করতে হয় সেখানেই ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা যায়। আর ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থান বা সময় বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি কোন বাধা হিসাবে দেখা দেয় না। যে কোন দেশেই এবং যে কোন প্রতিষ্ঠানই—কারবারী, সরকারী, সামাজিক, সেবামূলক, অর্থনৈতিক যাইহোক না কেন ব্যবস্থাপনা সর্বত্রই প্রযোজ্য হয়। বস্তুতঃ ব্যবস্থাপনা কলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে আর যেহেতু বিজ্ঞান সর্বজনীন। সেহেতু ব্যবস্থাপনার নীতিগুলিও সর্বজনীন। যেটুকু পার্থক্য দেখা যায় তা কলা হিসাবে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগের ক্ষেত্রে। কারণ কলা প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। যেহেতু পরিবেশের পার্থক্যের সাথে সাথে সাংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে সেজন্য ব্যবস্থাপনার নীতি ও পদ্ধতিগুলি পরিস্থিতিভেদে পরিমার্জিত করে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপনার রীতিগুলির মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় না, সেগুলি এক থাকে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপাদানগুলি সর্বত্র একই থাকে।

বস্তুতঃ ব্যবস্থাপনাকে সংগঠিত কাজের ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া (a universal process) বলে গণ্য করা হয়। **হেনরী ফেয়লকে** ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চৌদ্দটি নীতি প্রবর্তন করার জন্য সর্বজনীনতার প্রবক্তা হিসাবে গণ্য করা হয়। **Fayol** বলেছেন যে কেবলমাত্র কারবারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দুষ্প্রাপ্য সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে যেকোন প্রতিষ্ঠানেরই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি গবেষণাকেন্দ্র একটি হোটেল, ব্যাঙ্ক, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত সরকার ইত্যাদি প্রত্যেকেই সীমিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে। ব্যবস্থাপনা এই সীমিত সম্পদের সংহতি সাধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কাম্য দক্ষতা ও কার্যকারিতার বিকাশ ঘটায়। ব্যবস্থাপনা সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যমুলক ও সংগঠিত কাজে প্রযুক্ত হয় বলেই ব্যবস্থাপনাকে সর্বজনীন আখ্যা দেওয়া হয়।

অবশ্য একথাও সত্য যে ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব, নীতি ও পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, সরকারী বা বেসরকারী বা যৌথ বা সমবায় প্রতিষ্ঠানে অথবা জাপান বা ভারত বা জার্মানী যে কোন দেশে, এমনটি একটি সংস্থার দুটি ডিভিশনে যেমন কলকাতা ও দিল্লীতে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগে পার্থক্য হতে পারে যদিও তার মূলগত বিষয়ে কোন পরিবর্তন হয় না। ব্যবস্থাপনার অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতিভিত্তিক অর্থাৎ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এবং একারণেই ব্যবস্থাপনার মধ্যে বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে।

● **ব্যবস্থাপনাকে সর্বজনীন বলার পিছনে যুক্তি (Reasons in favour of universality of management)**

ব্যবস্থাপনাকে সর্বজনীন বলার পক্ষে যেসব যুক্তি তুলে ধরা হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

**(1) রীতিবদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার (Systematic body of knowledge) :** ব্যবস্থাপনার একটি রীতিবদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার রয়েছে। এই জ্ঞানভাণ্ডার বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব, নীতি ও ধারণা দ্বারা পুষ্ট। ব্যবস্থাপনা

প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতি, তত্ত্ব ও মতবাদগুলি মেনে চলা হয়। দেশ, কাল, প্রতিষ্ঠানের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হলেও এই জ্ঞান ভাণ্ডার একই থাকে ও এর নীতি ও তত্ত্বগুলি একই ভাবে ব্যবহৃত হয়।

(2) **ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানভিত্তিক (Management is science-based) :** ব্যবস্থাপনা একটি সমাজ বিজ্ঞান। এর মধ্যে বিজ্ঞান ও কলার সমন্বয় ঘটে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগত দিকটি কলাভিত্তিক। বিজ্ঞানের সর্বজনীনতা সর্বজনবিদিত। ব্যবস্থাপনাও সর্বজনীন কারণ বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে উদ্দেশ্য সাধনের কার্যকরী উপায় হিসাবে ব্যবস্থাপনা ব্যবহৃত হয়।

(3) **হস্তান্তর যোগ্যতা (Transferability) :** ব্যবস্থাপনাকে অর্থনৈতিক সম্পদে হিসাবে গণ্য করা হয়। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন ব্যবস্থাপনা একটি রপ্তানীযোগ্য সম্পদ। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করা যায়। বস্তুতঃ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ভাণ্ডার বিভিন্ন দেশের ব্যবস্থাপনাও সমাজবিজ্ঞানীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অভিজ্ঞতা দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। কিন্তু এগুলি আজ সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে গেছে। এছাড়াও উন্নতদেশ থেকে ব্যবস্থাপনা আজ উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলিতে গিয়ে ঐসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতার পিছনে হস্তান্তরযোগ্যতার বৈশিষ্ট্যও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(4) **সর্বজনীন প্রয়োগ (Universal application) :** ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের সাথে সাথে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সর্বজনীনতা লক্ষ্য করা যায়। যেকোন দেশে ও যেকোন ধরনের প্রতিষ্ঠানেই উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়। কেবলমাত্র কারবারী প্রতিষ্ঠানেই নয় যেকোন সামাজিক, সেবামূলক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও এবং ছোট বা বড়, সরকারী বা বেসরকারী বা যৌথ, যে ধরনের প্রতিষ্ঠানই হোন না কেন, প্রতিষ্ঠানের সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। ব্যবস্থাপনার সর্বজনীন প্রয়োগই ব্যবস্থাপনাকে দেশে দেশে ও প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে এতটা গুরুত্ব দিয়েছে।

- **ব্যবস্থাপনাকে সর্বজনীন না বলার পিছনে যুক্তি (Arguments against the universality of management)**

ব্যবস্থাপনার সর্বজনীন মতবাদ সর্বজন স্বীকৃত হলেও কোন কোন ব্যবস্থাপনা-বিশেষজ্ঞ এর বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ব্যবস্থাপনাকে সর্বজনীন বলে আখ্যা দিতে রাজী নন। বস্তুতঃ তাঁরা মনে করেন ব্যবস্থাপনার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম, আর যেহেতু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ বিরাজ করে সুতরাং ব্যবস্থাপনার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবসময়ই কিছু না কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব ও নীতিগুলি অপরিবর্তনীয় নয়। যেসব বিশেষজ্ঞ এই মত পোষণ করেন তাঁদের মধ্যে গঞ্জালেজ (Gonzalez), ম্যাকমিলন (McMillan), ওবার্গ (Oberg) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যাইহোক, ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতার বিপক্ষে যেসব যুক্তি তুলে ধরা হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(1) **ব্যবস্থাপনা একটি কলা (Management is an art) :** ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কলা হিসাবে গণ্য করা হয়। কলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রভাব বেশী থাকে এবং ব্যক্তিভেদে কলার

প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের কারণেই অনেকে একে সর্বজনীন বলতে অস্বীকার করেন।

(2) **ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি নির্ভর (Management is culture-based) :** ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গবেষণা চালাতে গিয়ে কোন কোন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন যে ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি নির্ভর। ওবার্গ (Oberg) মনে করেন—'ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির প্রযোজ্যতা বিশেষ সংস্কৃতি বা পরিস্থিতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির একটি সাধারণ সন্নিবেশ খুঁজতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। দেশ থেকে দেশে, প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে যেহেতু সংস্কৃতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, সেহেতু ব্যবস্থাপনাও পরিবর্তিত হয়। কাজেই এর সর্বজনীন চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটে।

(3) **ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টিভঙ্গী বা দর্শনের মধ্যে পার্থক্য (Difference in attitude or philosophy of managers) :** স্থানভেদে, কালভেদে ও প্রতিষ্ঠানভেদে ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টিভঙ্গীর ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। আর এই পার্থক্যকেই অনেকে ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতার বিপক্ষে তুলে ধরেন।

## ১.১১ সারাংশ

কারবারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলি যেমন ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, হিসাব-নিকাশকরণ প্রভৃতি, সমবেত প্রচেষ্টায় করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি বা দল এসব কার্য সম্পন্ন করেন। এসব কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজন হয় ব্যবস্থাপনার। অপর ব্যক্তিকে দিয়ে কার্য করার কৌশলকেই ব্যবস্থাপনা বলে মানব সভ্যতার শুরু থেকেই ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

ইহা লক্ষ করার বিষয় যে ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারা বহুলাংশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক চিন্তাধারার বিকাশের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত। শিল্পোন্নয়ন, প্রযুক্তি বিদ্যা ও উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপনার ধারা পরিবর্তিত হয় এবং বিভিন্ন চিন্তাধারার বিকাশ লাভ ঘটে। ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যেমন প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ।

সময়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে যে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উন্নয়নে সংগঠিত গোষ্ঠী হিসাবে গবেষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অতীতের গবেষণালব্ধ মতবাদগুলি অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ অতীতের এবং বর্তমানকালের জ্ঞানের আলোয় ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত হবে।

## ১.১২ অনুশীলনী

(১) ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন।

(৩) ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী আলোচনা করুন।

(৪) ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করুন।

(৫) ব্যবস্থাপনার ভূমিকা আলোচনা করুন।

(৬) প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতি কাকে বলে?

(৭) ব্যবস্থাপনা—কলা না বিজ্ঞান আলোচনা করুন।

(৮) ব্যবস্থাপনা কি পেশা? ব্যাখ্যা করুন।

(৯) ব্যবস্থাপনাকে সর্বজনীন না বলার পিছনে যুক্তি আলোচনা করুন।

(১০) ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতা ব্যাখ্যা করুন।

# একক ২ ❑ ব্যবস্থাপনার তত্ত্বসমূহ ও নীতিসকল (Management Theories & Principles)

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ

২.৪ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা মতবাদ

২.৪.১ ক্লাসিকাল/সনাতন মতবাদ

২.৪.২ নয়া ক্লাসিকাল/নয়া সনাতন মতবাদ

২.৪.৩ আধুনিক মতবাদ

২.৪.৪ মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মতবাদ

২.৪.৫ মানবিক আচরণ ভিত্তিক মতবাদ

২.৪.৬ টেলর এবং ফেয়লের অবদান

২.৫ সারাংশ

২.৬ অনুশীলনী

## ২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আমরা জানতে পারব :

- ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার বিবর্তন
- ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদ
- টেলর এবং ফেয়লের অবদান

## ২.২ প্রস্তাবনা

কারবারের মূলনীতি, উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেওয়া হয়। ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কারবারীর বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন তত্ত্বগুলি জানা এই বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

## ২.৩ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ

আধুনিক ব্যবস্থাপনা বলতে যা বোঝায় বা এর যে রূপ বর্তমানে দেখা যায় তা' কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠে নি। সময় ও সভ্যতার হাত ধরে আধুনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে ধাপে ধাপে। ব্যবস্থাপনার বিকাশ কখনো ঘটছে ধীর তালে আবার কখনো ঘটেছে দ্রুততালে। তবে আধুনিক ব্যবস্থাপনা তথা বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার দ্রুত বিকাশ ঘটেছে বিগত দুই শতকে। এরমধ্যে ব্যবস্থাপনাকে রীতিবদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে গড়ে তোলা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সাফল্য। ব্যবস্থাপনাকে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে গণ্য করা ও ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতা বিংশ শতাব্দীতেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুতরাং বিজ্ঞান হিসাবে ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাম্প্রতিক। কিন্তু কলা হিসাবে ব্যবস্থাপনার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। বস্তুতঃ মানব সভ্যতা যখন তার সভ্যতার আদিমতা থেকে সভ্যতার আলোকের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল, তখন থেকেই ব্যবস্থাপনা তাদের জীবনযাত্রায় পাথেয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে তখন এর রূপ ছিল অন্য বা একে ব্যবস্থাপনা হিসাবে চিহ্নিত করা হত না। তবে ব্যবস্থাপনার কিছু নীতি তারা মেনে চলত। প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপনার পত্তন ঘটে আদিম মানুষেরা যখন দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করল সেই সময় থেকে। দলের মধ্যে যখন তারা সবল ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে তাদের দলপতি হিসাবে বেছে নিতে শুরু করল, তার নির্দেশ অনুযায়ী চলা, কাজের বণ্টন, অর্পিত কাজের দায়িত্ব পালন ও দলের মধ্যে অন্তর্কলহ মেটানোর জন্য কিছু অলিখিত নিয়মকানুন তৈরি করেছিল, তখন থেকেই ব্যবস্থাপনার যাত্রা শুরু হয়েছিল বলা যায়। তবে আধুনিক ব্যবস্থাপনা তখন সুপ্ত অবস্থায় ছিল। তার প্রথম প্রকাশ ঘটে মানুষ যখন আরও উন্নত জীবনযাত্রার জন্য সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শুরু করল ও সমাজ গড়ে তুলল।

ব্যবস্থাপনা বিকাশের ইতিহাসকে আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ে মানব সভ্যতার উন্মেষের সাথে সাথে শুরু হয়ে মোটামুটি পঞ্চদশ শতকে শেষ হয়। একে **প্রাচীন যুগের** ব্যবস্থাপনাও বলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় পঞ্চদশ শতকে এবং উনবিংশ শতকের শুরুতে শেষ হয়। অর্থাৎ 1400 সাল থেকে 1800 সাল পর্যন্ত মোটামুটি এই 400 বছরের সময়কালকে দ্বিতীয় পর্যায় বা **মধ্যযুগ** বলা হয়। আর উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে বর্তমান সময় অর্থাৎ এই একবিংশ শতক পর্যন্ত সময়কালকে ব্যবস্থাপনার আধুনিক যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বস্তুতঃ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের সিংহভাগই আধুনিক যুগের অবদান। সুতরাং ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের যে তিনটি পর্যায় দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল—

**(1) প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনার বিকাশ** : মানব সভ্যতার শুরু থেকে আনুমানিক 1400 সাল পর্যন্ত।

**(2) মধ্যযুগ** : আনুমানিক 1400 সাল থেকে 1800 সাল পর্যন্ত।

**(3) আধুনিক যুগ** : আনুমানিক 1800 সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

নীচে এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

### (1) প্রাচীন যুগের ব্যবস্থাপনা (Management in Ancient age)

প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনার পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাসের উপাদান থেকে অর্থাৎ বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন, ঘটনা ও ইতিহাসের চরিত্র থেকে ব্যবস্থাপনার। মানব সভ্যতার যাত্রার শুরুতে মানুষ যখন তাদের যাযাবর জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে গ্রামীণ সমাজ গড়ে তুলল এবং জীবনযাত্রা সরল করার জন্য কিছু সংগঠিত

কার্যকলাপ শুরু করেছিল, তখনই ব্যবস্থাপনার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। গ্রামীণ সমাজ গড়ে ওঠার সাথে সাথে কর ব্যবস্থা, শ্রম বিভাজন, নেতৃত্বদান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত ঘটেছিল। অবশ্য ঐসময় ব্যবস্থাপনা ও ব্যক্তিগত নেতৃত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। নেতৃত্বের কাজের মধ্য দিয়েই ব্যবস্থাপনার আত্মপ্রকাশ ঘটতে শুরু হয়েছিল। ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার, কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যকলাপ, সেচ ব্যবস্থা, মুদ্রার প্রচলন ইত্যাদি থেকে ব্যবস্থাপনার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে বাণিজ্যিক প্রথার প্রচলন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সুচীত হয়। সমাজ যত উন্নত হতে থাকে তত তার মধ্যে কাজের বিশেষায়ন (Specialisation) গুরুত্ব পেতে থাকে। সঠিক লোকের উপর সঠিক কাজের ভার ও শ্রমবণ্টন তখনই শুরু হয় যা আজও ব্যবস্থাপনার মূল নীতিরূপে অনুসৃত হয়। শ্রমবিভাগ ও শ্রমবণ্টনের জন্য প্রয়োজন হল নেতৃত্বের, আর নেতৃত্ব দেওয়া হত কোন বিশেষ ব্যক্তিকে। প্রাচীনযুগে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) প্রাচীন ভারতের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর নগর সভ্যতা, প্রাচীন মিশরের পিরামিড, রোম সাম্রাজ্য ও গ্রীসের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি থেকে প্রাচীন যুগের উন্নত জীবনযাত্রা তথা উন্নত ব্যবস্থাপনার পরিচয় পাওয়া যায়।

(খ) খ্রীষ্টপূর্ব 2000 অব্দে ব্যবিলনে সম্রাট হামুরাবি একটি **বিধিপুস্তক** (Code) প্রণয়ন করেছিলেন। ঐ বিধি পুস্তকে সরকারী প্রশাসন সংক্রান্ত আইন কানুন ও নিয়মাবলী, ব্যবসার রীতিপদ্ধতি, শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরীর ব্যবস্থা ইত্যাদি স্থান পেয়েছিল। সেকারণে এই বিধি পুস্তিকাকে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য দলিল বলে মনে করা হয়। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় পুরোহিতরাও ব্যবস্থাপনার কাজ করতেন। তাঁরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করতেন এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যেসব অর্থ ও সম্পত্তি জনসাধারণ উৎসর্গ করত তা দিয়ে নানাধরনের ধর্মস্থান ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করতেন। এছাড়া তাঁরা ব্যবসায়ের নিয়মকানুন তৈরি করেছিলেন। হিসাবরক্ষণের জন্য এই সময়ই অক্ষর ও সংখ্যা আবিষ্কৃত হয় এবং হিসাব লেখার জন্য করণিকের সৃষ্টি হয়েছিল।

(গ) চৈনিক পণ্ডিত ও দার্শনিক **লাওৎজু** (Loatzu) ও গ্রীক দার্শনিক **প্লেটো** (Plato) কাজের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। এছাড়াও লাওৎজু কর্মীদের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন এবং পুরস্কার ও তিরস্কার নীতির (Stick and Carrot policy) প্রবর্তন করেছিলেন। দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'The Republic' গ্রন্থে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে বিশেষীকরণের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

(ঘ) খ্রীষ্টপূর্ব 1500 অব্দে মিশর থেকে হিব্রুদের বিতাড়নের সময় **জেথ্রো** (Jethro) এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন যার থেকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্বের ভারার্পণ নীতি, যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচন এবং নিয়মের ব্যতিক্রম নীতি ইত্যাদির উদ্ভব ঘটেছে। জেথ্রো তাঁর জামাইকে হিব্রুদের মধ্য থেকে কিছু উপযুক্ত লোককে বেছে নিয়ে তাদের উপর কিছু কাজের ভার দিতে বলেছিলেন। ছোট ছোট সমস্যাগুলি তারা নিজেরাই সমাধান করত এবং বড় সমস্যাগুলি মোজেসের কাছে নিয়ে আসা হত। ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগুলি ছিল যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

(ঙ) **সক্রেটিসের** ভাবশিষ্য **জেনোফেন**-এর লেখায় বিশেষীকরণ, কর্মী নির্বাচন, ভারার্পণ, গতি নিরীক্ষা ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ব্যবস্থাপনাকে 'কলা' (art) হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পিছনেও ব্যবস্থাপনার অভাব কাজ করেছিল। শেষ জার্মান সম্রাট **'নীরো'** (Niro)-র নিয়ন্ত্রণহীন, বিকেন্দ্রীভূত ও শ্লথ নীতিতে সাম্রাজ্য পরিচালনার ফলেই রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল।

(চ) প্রাচীন ভারতবর্ষে, খ্রীষ্টপূর্ব 321 অব্দে কৌটিল্যের **'অর্থশাস্ত্র'** বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের আলোচনায় সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক নানা ধরনের নীতি-নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। আধুনিক ব্যবস্থাপনার রীতিগুলি-এর সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রাচীন যুগকে যদিও ব্যবস্থাপনার আদর্শ যুগ হিসাবে গণ্য করা হয় না তবুও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ক্ষেত্রে তখনকার চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপ আধুনিক ব্যবস্থাপনার উৎস হিসাবে গণ্য হয়। তবে প্রাচীনযুগে ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। ব্যবস্থাপনা কলা হিসাবেই গণ্য হত এবং কলা হিসাবেই এর বিকাশ ঘটেছিল।

**(2) মধ্যযুগে ব্যবস্থাপনা (Management in Mediavel period)**

প্রাচীন যুগেও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব উপলব্ধ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন তত্ত্ব প্রাচীনযুগে গড়ে ওঠেনি। এরপর শুরু হয় মধ্যযুগ। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী চারশ বছর সময়কালকে ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগ বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ মোটামুটি 1400 সাল থেকে 1800 সাল পর্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত। এই সময়কালে পৃথিবীব্যাপী একধরনের পশ্চাৎগামীতা বিরাজ করেছিল। তাই একে **'অন্ধকার যুগ'** (Dark age) বলা হয়। ফলে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি ঘটতে দেখা যায়নি। তবুও এই যুগে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছিল, তা হল—

(ক) দু'জন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু অবদান রেখেছিলেন। এঁরা হলেন **স্যার থমাস মূর** (Sir Thomas More) ও **নিকোলো ম্যকিয়াভেলী** (Nicolo Machiavelli)। **মূর** (More) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Utopia'-তে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য অভিজাত শ্রেণীর অদক্ষ ব্যবস্থাপনাকেই দায়ী করেছিলেন। অন্যদিকে, ম্যাকিয়াভেলী তাঁর 'The Prince' গ্রন্থে সফল রাষ্ট্র পরিচালনার দিক্ নির্দেশ করেছিলেন।

(খ) উপরোক্ত দুই ব্যক্তিত্ব ছাড়াও মধ্যযুগের অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা হলেন রাজা **প্রথম উইলিয়াম** (William-I), **স্যার আইজক নিউটন** (Sir Isaac Newton) ও **ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল** (Florence Nightingle)। প্রথম উইলিয়াম খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ হলেও তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও প্রতিভা ছিল অতুলনীয়। নিউটন ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। তিনি ইংল্যাণ্ডের একটি টাঁকশালের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সফলভাবে তাঁর কাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ছিলেন মানবতার পূজারী এবং আর্ত ও পীড়িতদের সেবায় তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ ও সারা বিশ্বের কাছে আদর্শস্বরূপ। তিনি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন। এঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্যের চূড়ায় আরোহন করেছিলেন ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ব্যবস্থাপক হিসাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

**(3) আধুনিক যুগের ব্যবস্থাপনা (Management in Modern age)**

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ইওরোপে 'রেনেশাঁ' অর্থাৎ নবজাগরণ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত সময়কালকে অন্ধকারময় যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়কালে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির মধ্যে যে ব্যাপক অবক্ষয় ঘটেছিল, তা দুর হতে থাকে 'রেনেশাঁ' তথা সংস্কারমুখী নবজাগরণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলার উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছিল রেনেশাঁ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

তবে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সূচনা ধরা হয় শিল্প বিপ্লবের পর থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর (1769) শেষ পর্বে ব্রিটেনে যে শিল্প-বিপ্লবের শুরু হয়েছিল তা' ক্রমশঃ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় ব্যাপক *পরিবর্তন ঘটে, গণ-উৎপাদন* ও *গণ-বণ্টন* ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এর সাথে সমতা রাখতে প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তনও বৃহদাকার হতে শুরু হয়। আর এই পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সাযুজ্য রাখতে প্রয়োজন হয়েছিল নতুন ধারার ব্যবস্থাপনা, শুরু হয়েছিল ব্যবস্থাপনার নতুন যুগ তথা আধুনিক যুগ।

1800 সালে **চার্লস ব্যাবেজ** (Charles Babbage) প্রশিক্ষণের সময় সংক্ষেপে ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমবিভাগের সুপারিশ করেছিলেন; শ্রমবিভাগের এই সূত্রটি পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়েছিল। এই সময়েই **রবার্ট ওয়েন** (Robert owen) নামে একজন স্কটিশ ব্যবসায়ী উৎপাদনশীলতার সাথে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশের যে সম্পর্ক রয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি শ্রমিকদের দৈনিক সাড়ে তেরো ঘণ্টা কাজের পরিবর্তে সাড়ে দশ ঘণ্টা কাজের সময় নির্দিষ্ট করেন। তাছাড়া শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বাসস্থান ও কম দামে রেশনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। 1825 সালে **জেমস মিল** (James Mill) উৎপাদন ব্যবস্থায় সময়ের সদ্-ব্যবহার ও শ্রমিকদের সঠিক কাজে ব্যবহার দিকে আলোকপাত করেছিলেন।

**ব্যাবেজ** (Babbage), **মিল** (Mill) ব্যবস্থাপনায় উন্নত চিন্তাধারা নিয়ে এলেও প্রকৃতভাবে উন্নত সুশৃঙ্খল চিন্তাভাবনা শুরু হয় 1910 সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন বিশেষজ্ঞ **ফ্রেডরিক উইনস্লো টেলর** (Frederick Winslow Taylor) **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব** প্রচার করেন। বস্তুতঃ আধুনিক ব্যবস্থাপনার জয়যাত্রা শুরু হয় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব প্রকাশের মধ্য দিয়ে। **টেলরের** এই অবদানের জন্য তাঁকে **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক** বলা হয় (father of scientific management)। টেলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বকে পরবর্তীকালে অনেকেই সম্প্রসারিত করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন **হেনরী গান্ট** (Henrie Gantt), **ফ্র্যাঙ্ক গিলব্রেথ** (Frank Gilbreth), **হ্যারিংটন এমারসন** (Harrington Emerson), **হলসে** (F.A. Halsey) ইত্যাদি।

টেলরের সমসাময়িক অপর প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ হলেন **হেনরী ফেয়ল** (Henry Fayol)। তিনি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 14টি নীতির অবতারনা করেছিলেন। এগুলিকে ব্যবস্থাপনার মূলসূত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। 1915 সালে তিনি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে 'General and Industrial Administration' গ্রন্থটি ফরাসি ভাষায় প্রকাশ করেন। পরে এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই সমসাময়িক কালে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন তথা বিবর্তনের ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে **ম্যাক্স ওয়েবার** (Max Weber), **এলটন মায়ো** (Elton Mayo), **চেষ্টার বানার্ড** (Chester I. Bernard), **হাবার্ট সাইমন** (Herbert Symon), **পিটার ড্রকার** (P.F. Drucker) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিগত শতকের দ্বিতীয় ভাগকে ব্যবস্থাপনার নব আধুনিক যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বস্তুতঃ এই যুগ শুরু হয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্ক মতবাদ ও আচরণবাদী মতবাদের (Behavioural school) প্রতিষ্ঠা থেকে। মানবিক সম্পর্ক মতবাদের (Human Relations approach) জনক বলা হয় **এলটন মায়োকে** (Elton Mayo)। তাঁর নেতৃত্বে শিকাগো শহরে ওয়েষ্টার্ণ ইলেকট্রিকের হথর্ণ কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর গবেষণা চালানো হয়। এই গবেষণার ফলেই হল মানবিক সম্পর্ক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে

শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রমিকদের সম্পর্ক ও শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রমিকরা যদি বুঝতে পারে যে মালিক তাদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট এবং ব্যবস্থাপকরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল তাহলে তারা কাজের ক্ষেত্রে বেশী উৎসাহ পায়। এছাড়াও তাঁরা মনে করেন কর্মীদের সামাজিক পরিবেশও উৎপাদনশীলতার উপর প্রভাব ফেলে। **মেয়ো** (Mayo) ছাড়াও মানবিক সম্পর্কে মতবাদের অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা হলেন **হুগো মুনস্টারবার্গ** (Hugo Munsterberg)।

মানবিক সম্পর্ক মতবাদের প্রবক্তারা কাজের পরিবেশ বিশ্লেষণে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন তার আরও উন্নতিবিধান করেছিলেন আচরণবাদীরা। 1954 সালে **আব্রাহাম ম্যাসলো** (Abraham Maslow) তাঁর "Motivation and personality" বইটি প্রকাশ করেন। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন কিভাবে তাদের আচরণকে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধে **ম্যাসলো** আলোকপাত করেছেন। আচরণবাদীদের মধ্যে অপর প্রবক্তা **ডগলাস ম্যাকগ্রেগর** (Douglus Mcgregor) তাঁর "The Human side of Enterprise" বইটি প্রকাশ করেন 1960 সালে। কর্মীদের অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে তাঁর তত্ত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে 1961 সালে **রেনসিস লাইকার্ট** (Rensis Likert)-এর "New Pattern of Management" এবং 1964 সালে **ক্রিস আরগাইরিস্** (Chris Argyris)-এর "Integrating the Individual and the organisation" বইগুলি প্রকাশিত হয়। এর ফলে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আচরণবাদী মতবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং কর্মীদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের কাছে একটি নিত্য সূত্র হিসাবে গণ্য হতে শুরু করে। আচরণবাদীরা ব্যবস্থাপনার মুল সূত্রের মধ্যে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের সূত্রগুলির প্রয়োগ ঘটাতে থাকেন।

আধুনিক কালের অপর একটি মতবাদ হল **সংখ্যাতাত্ত্বিক মতবাদ** (Quantitative approach)। এর অপর নাম হল **অপারেশন রিসার্চ**। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এই তত্ত্বের উদ্ভব ঘটান। এছাড়াও **ফেয়লের** (Fayol) মতবাদকে অনুসরণ করে **হ্যারল্ড কুন্‌জ** (Harold Koontz) ও **সিরিল ও'ডেনেল** (Cyril O'Donnell) **ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া মতবাদ** (Management process approach) প্রবর্তন করেন। তবে সর্বাধুনিক তত্ত্বগুলির মধ্যে **চেস্টার বার্নাড**-এর (Chester Barnard) **ব্যবস্থাপনা তন্ত্রের ধারণা** (Systems approach) ও **পরিস্থিতি সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা** (Contingency approach) বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। **কুন্‌জ** এবং **ও'ডোনেলের** মতে তত্ত্ব হল কতকগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত প্রক্রিয়ার সমষ্টি, যেগুলি একত্রি হয়ে জটিল কিন্তু সম্পুর্ণ বিষয়টি গড়ে তোলে। আবার সাম্প্রতিক কালের কিছু ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে ব্যবস্থাপনার কোন বাঁধাধরা নিয়ম-নীতি নেই, অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থা নিতে হয়। একেই পরিস্থিতি সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা বলে। এরূপ তত্ত্ব উদ্ভবের পিছনে কারণ হল যে একটি বিশেষ অবস্থায় কোন পদ্ধতি খুবই কার্যকরী হলেও অন্য অবস্থায় ঐ পদ্ধতি তেমন কার্যকরী নাও হতে পারে। সেজন্য এসব তত্ত্বের প্রবক্তরা পরিস্থিতি বিচার করে ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের কথা বলেছেন।

1980-এর পরবর্তী সময়ে, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা লক্ষ্য করা গিয়েছে। ব্যবস্থাপনা তাদের সহযোগী হিসাবে কর্মীদের গণ্য করতে শুরু করেছে। ব্যবস্থাপনার এই নতুন ধারাকে **গণমুখী ব্যবস্থাপনা** বা **কর্মীকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা** বলা হয় (People-oriented management)। আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত গাড়ি উৎপাদক সংস্থা ফোর্ড মোটর কোম্পানীর মুখ্য ব্যবস্থাপক **ডোনাল্ড পিটারসন** (Donald Peterson) কোম্পানির

কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের অংশীদার এবং কোম্পানীর পরিবারের একজন বলে গণ্য করতেন। পিটারসন ব্যবস্থাপনাকে গণমুখী করার মাধ্যমে কাজের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ সে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। কর্মী ও শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠানের কাছে আর কেবলমাত্র কর্মী বা শ্রমিক হিসাবে গণ্য না হয়ে মানবিক সম্পদ (Human resource) হিসাবে গণ্য হতে থাকে।

## ২.৪ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা মতবাদ

ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব বিকাশের গতি প্রকৃতি থেকে তিনটি গোষ্ঠী বা তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী বা মতবাদ সনাক্ত করা যায়। এগুলি হল (1) **ক্লাসিকাল বা সনাতন মতবাদ** (1900-1930 খ্রীঃ), (2) **নিও ক্লাসিকাল বা নব সনাতন মতবাদ** (1930-1960 খ্রীঃ) ও (3) **আধুনিক মতবাদ** (1960 থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)। একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে এগুলি তুলে ধরা হল :

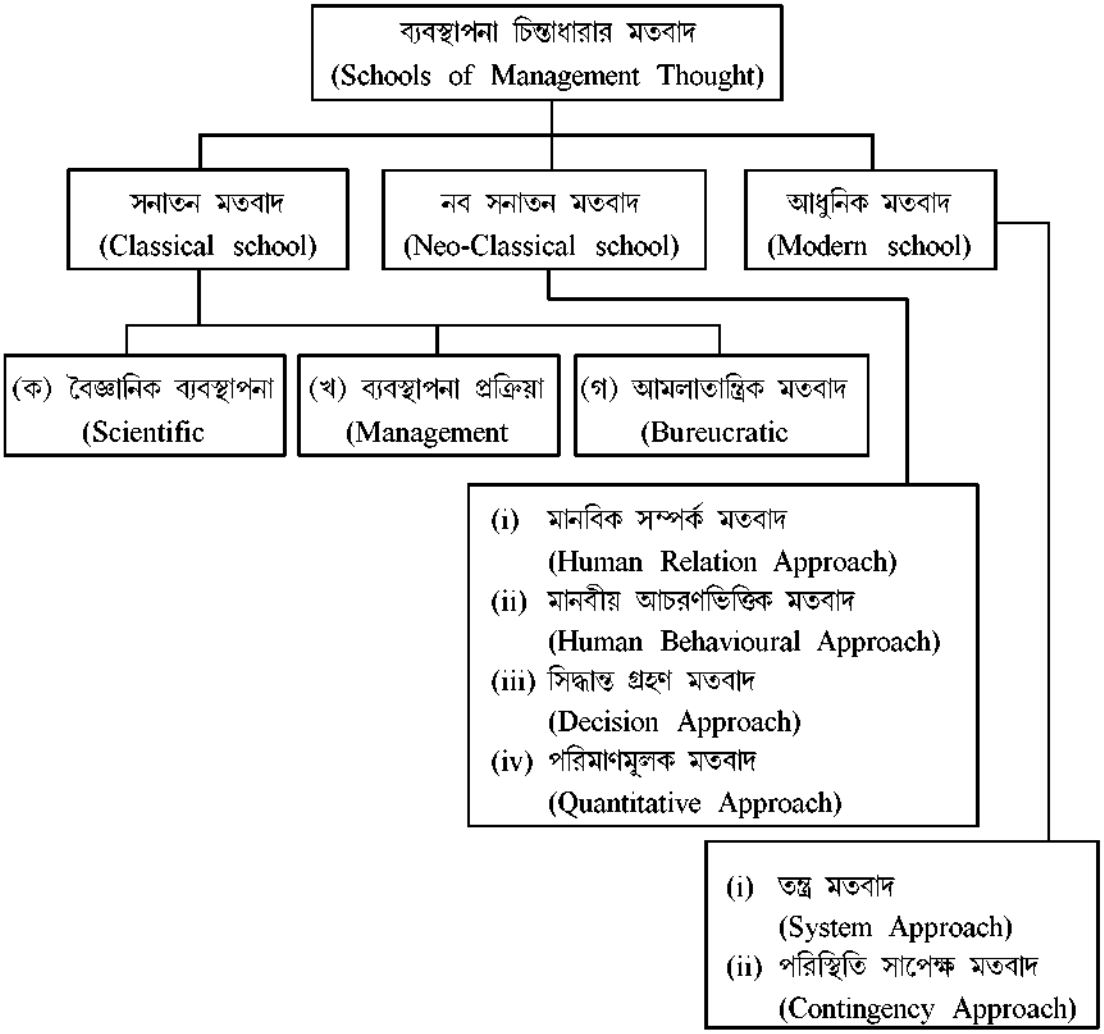

## ২.৪.১ ক্লাসিকাল/সনাতন মতবাদ (Classical Approach)

এই মতবাদ অনুযায়ী সংগঠনকে একটি যন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয়, যদি প্রতিটি কর্মীকে কাজে দক্ষ করা যায় তাহলে সংগঠনের ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। এই মতবাদে কর্মীকে কাজে উৎসাহিত করার জন্য অনুপ্রেরণার প্রভাব খুব বেশী আলোচিত হয়নি। এই মতবাদ যে তিনটি ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি হল : বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ, আমলাতান্ত্রিক মতবাদ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মতবাদ। নীচে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল :

**(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ (Scientific Management School) :** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হল একটি মতবাদ বা দর্শন। এই মতবাদের মূল বিষয় হল তথ্য অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সূত্র বা কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সেগুলি প্রয়োগ করা। এই মতবাদের জনক হলেন **ফ্রেডেরিক উইনস্লো টেলর (F.W. Taylor)**। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

**(খ) আমলাতান্ত্রিক মতবাদ (Scientific Management School) :** এই মতবাদের জনক হলেন জার্মান দার্শনিক **Max Weber**। চার্চ, সরকার, মিলিটারি এবং ব্যবসার উপর পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাস জন্মায় যে, কর্তৃত্বের স্তর এবং আমলাতন্ত্র (যার মধ্যে রয়েছে নিয়ম, কাজের সংজ্ঞা ও নিয়মানুবর্তিতা) যে কোন সামাজিক সংগঠনের ভিত্তিভূমি। তাঁর মতে আমলাতন্ত্র হ'ল জটিল সংগঠনের ক্ষেত্রে একটি সার্থক প্রয়োগ বিধি। যেক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা করা মুশকিল বা পরিবর্তনের হার অনুমান করা যায় না, আমলাতন্ত্র সেসব ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এবং সেদিক দিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এই মতবাদ খুবই উপযোগী।

**(গ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মতবাদ (Management Process School) :** ক্ল্যাসিকাল মতবাদের তৃতীয় ধারাটি হল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মতবাদ বা প্রশাসনিক তত্ত্ব (Administrative Theory)। **Henry Fayol** এই মতবাদের জনক। ব্যবস্থাপনার সাধারণ নিয়মনীতির উল্লেখ এই মতবাদে পাওয়া যায়। এই মতবাদে কিছু কিছু নীতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়, যেমন—পিরামিড আকৃতি, কর্তৃত্ব-শৃঙ্খল (Scalar Chain), আদেশের একতা (Unity of Command) ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞানীরা এই মতবাদকে আদর্শ আমলাতন্ত্র (Ideal Bureaucracy) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই মতবাদে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। H. Fayol-এর অবদান সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

## ২.৪.২ নয়া ক্লাসিকাল/নয়া সনাতন মতবাদ (Neo-Classical Approach)

নয়া ক্লাসিকাল মতবাদকে মানবিক সম্পর্কের মতবাদ হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়। এই মতবাদ ক্ল্যাসিকাল মতবাদের পরিমার্জিত ও উন্নত সংস্করণ। ক্লাসিকাল তত্ত্ব কাজ ও বাস্তব সম্পদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করে। অন্যদিকে নয়া ক্লাসিকাল মতবাদ যন্ত্রের পিছনে যে সব মানুষ রয়েছে তাদের গুরত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং ব্যবস্থাপনায় আচরণ ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রয়োগ হল এর মূল বিষয়। এই মতবাদের অন্তর্নিহীত উপাদানগুলি (Elements) হল :

**(ক) ব্যক্তি (Individual) :** নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব ব্যক্তির আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়। প্রত্যেক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকা ও অভাব পূরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি, এই মতবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ব্যক্তি হল এই মতবাদের প্রথম উপাদান।

**(খ) দলগত বৈশিষ্ট্য (Group) :** সংগঠনে কর্মীদের আলাদা অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। তারা সংগঠনকে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করে। ব্যবস্থাপনার সাথে যারা যুক্ত তারা যদি সংগঠনের কর্মীদের পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসাবে মনে করে, সেক্ষেত্রে সংগঠন দলগত ঐতিহ্য বজায় রেখে চলতে পারে না। বিভিন্ন কর্মী নিয়ে পৃথক পৃথক দল তৈরি করা হয় এবং প্রত্যেক দলের এক-একটি নেতা নির্বাচন করে নেতার নির্দেশ অনুযায়ী দল পরিচালিত হয়। দল পরিচালনার সময় কর্মীদের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য নেতা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। এর ফলে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। ক্লাসিকাল তত্ত্ব কর্মীদের মানবিক আচরণের উপর গুরুত্ব কম দিত, কিন্তু নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব মানবিক আচরণের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়।

**(গ) শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ :** নয়া সনাতন মতবাদের তৃতীয় উপাদান হল শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ। শ্রমিকরা সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ শ্রমিকদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি করে এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

নয়া সনাতন মতবাদ কতকগুলি তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। এই তত্ত্বগুলি হল :

**(i) মানবিক সম্পর্ক মতবাদ (Human Relations Approach) :** ব্যবস্থাপক তার অধঃস্তন কর্মীদের সাথে কিভাবে আচরণ করবেন এবং তাদেরকে কাজে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন ইত্যাদি বিষয় মানবিক সম্পর্ক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে **Hames A.F. Stoner** ও **Charles Wankel**-এর মন্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলেছেন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা অনুসারে কারবার পরিচালনা করতে হলে যে দুটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় তা হল কারিগরী দিক ও মানবিক দিক। যদিও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় মানবিক দিক কিছুটা উপেক্ষিত, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবিক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এই মতবাদের মূল কথা হল ব্যবস্থাপক কর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, মান-মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করবে ও কর্মীকে কাজে উৎসাহ দিয়ে কাজ করাবে। **অনুশাসনের মাধ্যমে নয়, অনুপ্রেরণার মাধ্যমে কর্মীদের কাজ করানোই হল এই মতবাদের মূল ভিত্তি।**

এই মতবাদ যাঁরা প্রবর্তন করেন তাঁদের মধ্যে **Elton Mayo, Fritz J. Roethlisberger, William J. Dickson, Mary Parker Follett**-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Elton Mayo-র নেতৃত্বে আমেরিকার চিকাগো শহরের কাছে হথর্ণ শহরে Western Electric কোম্পানীতে 1924 সাল থেকে 1933 সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের আচরণের উপর পরীক্ষা চালানো হয় এবং পরীক্ষার ফলাফল হিসাবে বলা হয় যে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা শুধুমাত্র ভৌত পরিবেশের উপর নির্ভর করে না, শ্রমিকদের সাথে মানবিক সম্পর্কের উপরও নির্ভরশীল। কাজের পরিবেশ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তা Mayo-র বক্তব্য থেকে জানা যায়—"Every-one, worker or executive, probably carries with him a private grief or discontent. Whenever the conditions of work are unsuitable, physically or mentally, the immediate effect seems to be an increase of pessimistic or bitter reflexion."। কাজের

পরিবেশ ছাড়াও ব্যবস্থাপকের সহযোগিতা, শ্রমিকদের মধ্যে ছোট ছোট ঘরোয়া গোষ্ঠীর (Informal groups) সৃষ্টি, উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি বিষয় মানবিক সম্পর্ককে উন্নত করে, যার ফলে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

**(ii) মানবীয় আচরণভিত্তিক মতবাদ (Human Behavioural School) :** মানবিক সম্পর্ক মতবাদের কার্যকারিতায় উৎসাহিত হয়ে অনেক মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানী গবেষণার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত আরও কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বগুলির মূল কথা হল, মানুষের আচরণের পরিবর্তন হয় তার আবেগ, অনুভূতি, অনুপ্রেরণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং এই বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করা ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হল ব্যবস্থাপনার কাজ। এই মতবাদ যে মূল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা হল দু'জন ব্যক্তি ঠিক একইরকম আচরণ করে না কারণ তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা আলাদা। সুতরাং সফল ব্যবস্থাপক এমনভাবে শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করবে যাতে শ্রমিক উদ্যমের সাথে কাজ করতে পারে। এর মতবাদ প্রবর্তনে যার অবদান প্রধান তিনি হলেন **মেরী পার্কার ফলেট (Miss Mary Parker Pollett)**। যাঁদের অবদানে এই মতবাদ আরও সমৃদ্ধ লাভ করেছে তাঁরা হলেন, **ম্যাসলো (Abraham F. Maslow) হার্জবার্গ (Frederick Herzberz), আর গাইরিস (Chryis Argyris), ব্লেক (R. R. Blake), মাউটন (J. S. Mouton)** ইত্যাদি।

**(iii) সিদ্ধান্তগ্রহণ মতবাদ (Decision Approach) :** ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হল সিদ্ধান্তগ্রহণ। বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে সঠিকভাবে বিষয় নির্বাচন করাকে সিদ্ধান্তগ্রহণ বলে। ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন সময়ে একাধিক বিষয়ের মধ্যে সঠিক বিষয়টি নির্বাচন করতে হয়, যেমন—দ্রব্য উৎপাদন করা ঠিক হবে, না দ্রব্য বাজার থেকে ক্রয় করা হবে, স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করতে হবে, না সম্পত্তি লীজ নেওয়া হবে ইত্যাদি। যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্তগ্রহণ উত্তম ব্যবস্থাপনার নিদর্শন। এই সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনার যে কোন স্তরে গ্রহণ করা যায় এবং সিদ্ধান্তের চরিত্র অনুযায়ী ব্যবস্থাপকের মানসিকতা সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

এই মতবাদের যাঁরা প্রবক্তা, তাঁরা হলেন **Chester Bernerd, James March, Herbert Simon, Richard Cyert** ইত্যাদি ব্যক্তিরা।

**(iv) পরিমাণমূলক মতবাদ (Quantative Approach) :** বিশ্বে প্রায় প্রতিটি বিষয়ে গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ লক্ষণীয় কারণ এই শাস্ত্র বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উন্নয়ন এবং কম্পিউটারের প্রবেশ ব্যবস্থাপনা এবং গণিতশাস্ত্রকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এই মতবাদের প্রবক্তরা বলেন, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা গণিতশাস্ত্রের নিয়ম ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন সমীকরণের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হয়। এই মতবাদে সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে **Operations Research** বলে।

এই মতবাদের যাঁরা প্রবক্তা, তাঁরা হলেন **F. W. Taylor, Gilbreth, Joel Dean, L. Ackoff, W. Leonteff** ইত্যাদি।

## ২.৪.৩ আধুনিক মতবাদ (Modern School)

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্ক মতবাদের প্রবক্তাগণ সংগঠনে মানুষ এবং সমাজের গুরুত্ব কতখানি তা ব্যক্তি করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র মানবিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যান্য এমন কিছু বিষয় আছে যার মাধ্যমেও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। 1960 সাল পর্যন্ত মানবিক সম্পর্ক মতবাদ যতটা গুরুত্ব পেয়েছিল, পরবর্তীকালে অর্থাৎ 1960 সালের পরে তা কমতে থাকে। কারণ শুরু হয় আধুনিক মতবাদ। এই মতবাদে যন্ত্রপাতি ও মানুষ উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই ধারণা পোষণ করা হয় যে এর ফলে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই মতবাদে দুটি তত্ত্ব আছে—**(i) তন্ত্র মতবাদ** (System Theory) ও **(ii) পরিস্থিতি সাপেক্ষ মতবাদ** (Contingency Approach)।

**(i) তন্ত্র মতবাদ (System Theory) :** 'System' শব্দটি গ্রীক শব্দ "সিনিস্ট্যানাই" (Synistanai) থেকে এসেছে যার অর্থ হল একত্রিত করা (To bring together or combine)। কোন কাজ সম্পাদন করতে হলে শুধুমাত্র একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিলেই চলে না। অন্যান্য বিষয় যা এই কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলির উপরও সমান গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। কারণ, কারবার পরিচালনায় যে সব উপকরণের প্রয়োজন হয় সেগুলি পরস্পরের সাথে কোন-না-কোনভাবে যুক্ত। সেজন্য কারবার ব্যবস্থাপনায় এমন একটি তন্ত্র বা পদ্ধতি রচনা করতে হবে যার ফলে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বস্তুগুলিকে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ বস্তু গড়ে ওঠে। কারণ 'সিস্টেম' শব্দের অর্থ হল কতগুলি কার্যক্রম যারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। **Koontz** ও **O' Donnell**-এর ভাষায়, "A system is essentially a set or assemblage of things that are interconnected or interdependent so as to form a complex whole."

সংগঠনের সর্বস্তরে যেসব ঘটনা ঘটে তাদের মধ্যে যোগসূত্র ঘটানোর কথা এই মতবাদে উচ্চারিত হয়। সংগঠনের প্রত্যেকটি কাজ অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত। যেমন উৎপাদন ব্যবস্থাপকের কাজের সাথে বিক্রয় ব্যবস্থাপকের কাজের যোগাযোগ রয়েছে। আবার সবার সাথে আর্থিক ব্যবস্থাপকের যোগাযোগ থাকে। বিভিন্ন কাজের মধ্যে পারস্পরিক এই যোগাযোগকেই বলে তন্ত্র বা সিস্টেম এবং এই যোগাযোগ না থাকলে ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার একের ওপর অন্যের এই যে নির্ভরশীলতা যার ফলে সামগ্রিকভাবে কাজ সম্পাদন সম্ভব হয়, তা মাঝে মধ্যে এমনভাবে জটিল হয়ে পড়ে যে সামান্য কোন ত্রুটি সামগ্রিকভাবে মোট কাজের ওপর তার প্রভাব পড়ে।

প্রতিটি সংগঠিত প্রতিষ্ঠান শূন্যের ওপর গড়ে ওঠে না। উপরন্তু সংগঠনের ভেতর ছাড়াও বাইরের পরিবেশ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন দেশের অর্থনীতিতে অবস্থা, সমাজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বাইরের পরিবেশ যার ওপর প্রতিষ্ঠানের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সংগঠনের প্রয়োজনমত কাজে লাগিয়ে পদ্ধতিটিকে চালু রাখা—যা আমরা নিবেশ-উৎপাদন মডেল (Input Output Model) হিসাবে নিচে রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখবো—

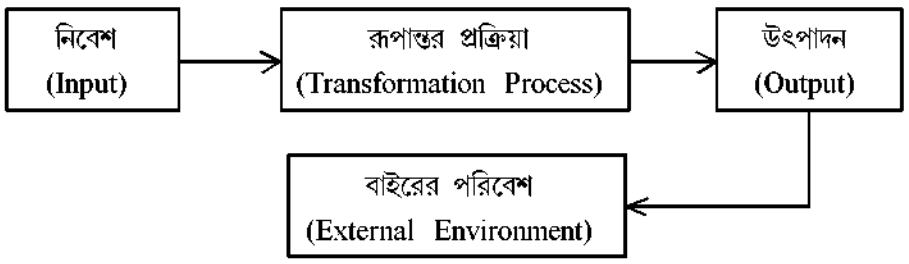

সুতরাং ব্যবস্থাপনায় মানুষ, যন্ত্র, দ্রব্য, বিভিন্ন বিভাগ ইত্যাদি বিষয়ের সংযোজন ও যোগসূত্র ঘটানোই হল তন্ত্র মতবাদের (system theory appraoch) মূল কথা। এই মতবাদ যারা প্রচার করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন **Chester Barnard, D. Katz, H. Simon, R. Kahn, Kenaeth Boulding, L. V. Bertallanffy** প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

**(ii) পরিস্থিতি-সাপেক্ষ মতবাদ (Contingency Theory Approach) :** ব্যবস্থাপনার আধুনিক মতবাদে পরিস্থিতি-সাপেক্ষ মতবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন এবং এক দিক দিয়ে তন্ত্রগত মতবাদের বর্ধিত সংস্করণ। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল, ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা কোন বিশেষ একটি মতবাদের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব নয়। যখন যেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন সেরূপ ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব প্রয়োগ করে তার সমাধান করতে হবে। এই মতবাদে পরিস্থিতি বা পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। System approach বা তন্ত্রগত মতবাদে সংগঠন ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা নেই। পরিস্থিতি-সাপেক্ষ মতবাদ এই দুই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

একথা বলা বাহুল্য যে সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থাপনার কোন নির্দিষ্ট বা বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। এই সমস্যা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই আসতে পারে। সমস্যার গভীরতা এবং চরিত্র বুঝে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ ঘটালে সুফল পাওয়া সম্ভব। ব্যবস্থাপনার কোন তত্ত্ব একটি সমস্যা মোকাবিলার কাজে উপযোগী হলেও, তা অন্য সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা নাও নিতে পারে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে সমাধানের সূত্র পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। **Charles Kindleberger** এই বিষয়টিকে একটি ছোট্ট শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন, তা হল "It depends" অর্থাৎ সমস্যার সমাধান নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর।

পরিস্থিতি-সাপেক্ষ মতবাদ সম্বন্ধে **Stoner** ও **Wankel** প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে এটাই প্রতিভাত হয় যে ব্যবস্থাপক সমায়োপযোগী কৌশল অবলম্বন করে ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য সফল করবেন। এ প্রসঙ্গে **Larry M. Austin** ও **James R. Burns**-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

তাঁরা বলেছেন—"The contingency approach means that we must be aware of the complexity in every situation and that we must take an active role in trying to determine what would work best in each case."

## ২.৪.৪ মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মতবাদ—(Human Relations approach)

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্মীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। মানবিক সম্পর্ক ভাল হলে তা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ও মান উন্নয়নে সাহায্য করে। অপরপক্ষে মানবিক সম্পর্ক খারাপ হলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মনোবল ও দক্ষতা হ্রাস পায় যার ফলে পণ্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে। মানবিক সম্পর্ক মতবাদের মূল ভিত্তি হল কারবারি সংস্থায় কর্মীদের সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে ব্যবস্থাপনার কার্য আরও ফলপ্রসূ হয়। যেখানে অনেক মানুষ একসঙ্গে কার্য করেন, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে ছোটো ছোটো ঘরোয়া গোষ্ঠী (informal groups)। প্রত্যেক কারবারে নিয়মভিত্তিক সংগঠনের (formal organisation) মধ্যে

লুকানো থাকে—অনেকগুলি ছোটো ছোটো ঘরোয়া গোষ্ঠী। ব্যবস্থাপনাকে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে এই সব ছোটো ঘরোয়া গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে কর্মীদের মনে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারলে নিময়ভিত্তিক সংগঠনকে আরও বেশি শক্তিশালী করা যাবে।

এই মতবাদের সমর্থক হলেন এলটন মেয়ো, রোয়েথলিস বার্জার, মেরি পার্কার ফলেট, চেস্টার. আই. বানার্ড (Chester I. Barnard), আব্রাহাম মাসলো, ফ্রেডরিক হার্জবার্গ প্রমুখ চিন্তাবিদগণ।

**এলটন মেয়ো (Elton Mayo)** [১৮৮০-১৯৪৯] :

মানবিক সম্পর্ক মতবাদের জনক হলেন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক এলটন মেয়ো। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরের অয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হথর্ণ প্লান্টে (Hawthorne Plant) এলটন মেয়ো এবং তার সঙ্গী সমাজবিজ্ঞানী রোয়েথলিস বার্জার (Roethlis Berger), টি. এন. হোয়াইট হেড এবং কোম্পানি প্রতিনিধি উইলিয়াম. জে. ডিকসন গবেষণা শুরু করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গবেষণা চালানো হয়। তাঁরা গবেষণাকে চারটি অংশে ভাগ করেছিলেন। (১) আলোকিতকরণের পরীক্ষা (illumination experiments) (২) দলগত সম্মিলন পরীক্ষা (relay assembly test) (৩) পর্যবেক্ষণ কক্ষ সমীক্ষা (observation room study) (৪) গণ-সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (massive interviewing programme)।

**হথর্ন গবেষণা : অবদানসমূহ**

**(১) অ-বিধিবদ্ধ সম্পর্ক ও সংগঠন (Informal relations and organisation) :**

মানুষ সামাজিক জীব। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিয়মভিত্তিক (formal) সংগঠনের মধ্যে কর্মীদের রুচি-পছন্দ, অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক এবং তার ফল হল ছোটো ছোটো ঘরোয়া গোষ্ঠী বা অবিধিবদ্ধ সংগঠন (informal organisation)। এই অবিধিবদ্ধ সংগঠন বা গোষ্ঠীগুলি বিধিবদ্ধ সংগঠনের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরী করার জন্য ঘরোয়া গোষ্ঠীগুলিকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং বিধিবদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে ভারসাম্য গড়ে তুলতে হবে।

**(২) উৎপাদনে সামাজিক উপাদান (Informal relations and organisation) :**

একটি সংগঠন মূলত সামাজিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। উৎপাদনের মাত্রা সামাজিক মানদণ্ডে নির্ধারিত হয়, শারীরিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়। সামাজিক ও মানসিক উপাদানে গড়া জীব হল মানুষ। মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের উপরই সংগঠনের উৎপাদন ও দক্ষতা নির্ভর করে। অর্থনৈতিক সন্তুষ্টিবিধান ও উৎপাদনবৃদ্ধি একই সাথে নাও হতে পারে। অর্থনৈতিক পুরস্কার ও দাবি মিটিয়েও কর্মীদের আচরণকে প্রভাবিত করা যায়।

**(৩) কর্মীর আচরণ (Informal relations and organisation) :**

কর্মীদের ব্যক্তিগত আচরণের কারণ এবং তার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। যখন কোনও কর্মীর মনে ক্ষোভ বা অসন্তোষ দানা বাধে, তখন তার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে কতকগুলি চিহ্ন ধরা পড়ে। যেমন অনিয়মিত হাজিরা, স্বল্প উৎপাদন প্রভৃতি। ব্যবস্থাপনাকে গভীরভাবে এর কারণ অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) **তদারকি (Informal relations and organisation) :**

উৎপাদনের হার ও পরিমাণের উপর তদারকির প্রভাব অনস্বীকার্য। তদারকিকে ফলপ্রসূ করতে হলে ব্যবস্থাপককে কর্মীদের প্রতি আন্তরিক ও সহৃদয় আচরণ করতে হবে।

(৫) **প্রণোদনা (Informal relations and organisation) :**

আগে মনে করা হত অর্থনৈতিক প্রণোদনার দ্বারাই কর্মীদের কার্যে উৎসাহিত করা যায়। হথর্ন গবেষণার ফলাফল থেকে জানা গেল কর্মীদের প্রভাবিত করার জন্য অর্থনৈতিক প্রণোদনার থেকেও অর্থনৈতিক প্রণোদনার গুরুত্ব ও প্রভাব অনেক বেশি। তাই ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রণোদনার কথা বিচার করা প্রয়োজন।

(৬) **যোগাযোগ (Communication) :**

এই গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় যে, সংগঠনে যোগাযোগের গুরুত্ব অসীম। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের মনোভাব কর্মীরা জানতে পারেন অপর দিকে কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব ব্যবস্থাপকগণ জানতে পারেন। ফলে সংগঠনে বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সহজসাধ্য হয়।

## ২.৪.৫ মানবিক আচরণ ভিত্তিক মতবাদ—(Human Behavioural School)

আচরণ ভিত্তিক মতবাদের মূল কথা হল মানুষের আচরণের পেছনে যে সব কারণ আছে যেমন আবেগ, অনুভূতি, প্রেরণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সঠিকভাবে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে সেই অনুসারে কার্য করাই হল ব্যবস্থাপনা। এই মতবাদে মানুষের আচরণকে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মনে করা হয় মানুষের আচরণ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে ব্যবস্থাপক অন্যকে দিয়ে কর্মসম্পাদনে অসফল হবে।

মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মতবাদ এবং মানবিক আচরণ ভিত্তিক মতবাদের মূল পার্থক্য হল, প্রথমটি অর্থনৈতিক উপাদানকে উপেক্ষা করে। কিন্তু মানবিক আচরণ মতবাদ অর্থনৈতিক উপাদানের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে।

এই মতবাদের সমর্থক হলেন ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (Douglas McGregor), হারবার্ট এ. সাইমন (Herbert A. Simon), রেনসিস লিকার্ট (Rensis Likert), কার্ট লিউইন (Kurt Lewin), ক্রিস. আরগাইরিস (Chris Arguris) প্রমুখ পণ্ডিতগণ।

**ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (১৯০১-১৯৬৪)**

সাংগঠনিক মানবিকতাবাদের (organisational humanism) অন্যতম প্রবক্তা ডগলাস ম্যাকগ্রেগর মানবিক আচরণ সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক অনুমান বিশ্লেষণ করে X তত্ত্ব ও Y তত্ত্ব নামে দুটি তত্ত্ব উপস্থাপনা করেছেন। কর্মীকে প্রণোদিত করে তাকে দিয়ে সুচারুভাবে কার্য করানোর জন্য যে সমস্ত প্রণোদনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেই সম্পর্কে এই তত্ত্ব দুটি আলোকপাত করেছে।

X তত্ত্বে ম্যাকগ্রেগর বলেছেন, আগে ব্যবস্থাপকগণ মনে করতেন যে কর্মীগণ স্বভাবতই অলস, উদ্ধত,

কর্মবিমুখ, দায়িত্বগ্রহণ অপছন্দ করে, যে কোনও পরিবর্তনে প্রতিবাদ করে প্রভৃতি। সেই কারণে কর্মীদের আর্থিক পুরস্কার বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রণোদিত করতে হয়।

X তত্ত্বের অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য ম্যাকগ্রেগর একটি বিকল্প তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। নাম দেন Y তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বলা হল যে দৈহিক ও নিরাপত্তার অভাব মেটাতে আর্থিক প্রণোদনার প্রয়োজন। অন্যান্য অভাব মেটাতে আর্থিক প্রণোদনা কর্মীকে কার্যে প্রলুব্ধ করতে সমর্থ হয় না। ম্যাকগ্রেগর বললেন, কর্মীগণ কর্মবিমুখ নয়, তারা দায়িত্ব পালনে আগ্রহী। তারা কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চায় না। সবাই নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। তাই সব ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব হল প্রতিষ্ঠানে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে সব কর্মী নিজ প্রচেষ্টায় সব কার্য সম্পন্ন করতে পারে।

Y তত্ত্ব প্রয়োগের ফলে অংশগ্রহণকারী ও পরামর্শকারী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হয়। ইহা কর্মীদের দৈহিক এবং সামাজিক চাহিদা পূরণ যথেষ্ট সাহায্য করে। ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের অংশগ্রহণের ফলে সংগঠনের উদ্দেশ্য সাধন সহজসাধ্য হয়। অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে Y তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

**হারবার্ট এ. সাইমন (Herbert A. Simon)**

সাংগঠনিক মানবিকতাবাদের আরেক প্রবক্তা সমাজবিজ্ঞানী হারবার্ট এ. সাইমনের বিখ্যাত বই 'Administrative Behaviour' ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। বইটিতে উল্লেখিত সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানবিক আচরণের গুরুত্ব ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে নতুন পথ নির্দেশ করে। তাঁর মতে ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীর (groups) আচরণ উৎসাহিত করেছে মানবিক আচরণ সম্বন্ধীয় সহযোগিতামূলক সামাজিক পদ্ধতি (Co-operative social system) সম্পর্কে গবেষণার জন্য। সহযোগিতামূলক সামাজিক পদ্ধতির ধারণা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। এই পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার পারস্পরিক আদান-প্রদান থেকে।

সাইমন ও অন্য কয়েকজন চিন্তাবিদগণ এই ধারণাকে প্রসারিত করে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত গোষ্ঠী বা মানবিক আচরণ সম্বন্ধীয় অন্য পদ্ধতিতে এর প্রয়োগের কথা বলেছেন। একে তারা সংগঠন তত্ত্ব হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সাইমনের মতে সংগঠন হল পরস্পর নির্ভরশীল কার্যাবলির এমন একটি পদ্ধতি, যা বিভিন্ন প্রাথমিক গোষ্ঠী (primary groups) নিয়ে গঠিত, গোষ্ঠীগুলির আচরণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীদের সচেতনা বৃদ্ধি করে এবং যুক্তি সম্মত নির্দেশদানকে প্রভাবিত করে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাস্তবে আমরা সব সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরোপুরি যুক্তিবাদী হতে পারি না। অন্য কোনও বিকল্প না থাকায় অনেক সময় ব্যবস্থাপকগণ বাধ্য হয়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা সংগঠনের পক্ষে আবশ্যিক হলেও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সাইমন বলেছেন ঐ পরিস্থিতিতে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। সবক্ষেত্রেই ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমাণ যুক্তিসঙ্গতভাবে বিবেচনা করে সর্বাধিক উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে ব্যবস্থাপনাকে। সাইমনের মতে ব্যবস্থাপনার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতিনীতি ও কার্যকরণ সম্পর্ক জানা থাকা দরকার এবং সেক্ষেত্রে মানবিক আচরণ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ হবে না।

কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন সিদ্ধান্ত গ্রহণই ব্যবস্থাপনার একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়। আর সাইমনের সহযোগিতামূলক সামাজিক পদ্ধতির ধারণা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হলেও, এই ধারণা ব্যবস্থাপনার বেশ কিছু জরুরি ধারণা, নীতি ও পদ্ধতিকে উপেক্ষা করেছে।

## ২.৪.৬ টেলর এবং ফেয়লের অবদান

ক্লাসিকাল মতবাদের জনক দুই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব F.W. Taylor এবং Henry Fayol-র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নীচে করা হল :

**(1) ফ্রেডেরিক উইনস্লো টেলর (F.W. Taylor : 1856-1915)**

**(i) জীবনীকাল (Life span) :** 1856 থেকে 1915 সাল পর্যন্ত টেলরের জীবনকালের ব্যাপ্তি। তিনি আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে 1856 সালে জন্মগ্রহণ করেন ও 1915 সালে 59 বছর বয়সে মারা যান।

**(ii) শিক্ষা (Education) :** টেলরের জীবনের লক্ষ্য ছিল আইনজীবী হওয়া। কিন্তু চোখের সমস্যার জন্য কলেজে পড়ার সময়ই তাঁকে পড়া ছেড়ে দিতে হয়। 1875 সালে পড়াশুনা ছেড়ে তিনি শিক্ষানবীশ যন্ত্রবিদ হিসাবে ফিলাডেলফিয়ার 'Cramp Shipyard'-এ যোগদান করেন। এর তিন বছর পর তিনি 'Midvale Steel Works' প্রতিষ্ঠানে একজন সাধারণ শ্রমিক হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু ছ'বছরের মধ্যে তিনি প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের পদে উন্নীত হন। এখানে কাজ করার সময়ই তিনি সান্ধ্য কলেজে পড়াশুনা করতেন এবং 'স্টিভেনস্ ইনস্টিটিউট' থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। সুতরাং তিনি শেষ পর্যন্ত প্রথাগত প্রযুক্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

● **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management)**

➢ **অর্থ (Meaning) : টেলর** (Taylor) প্রবর্তিত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার যে নতুন পদ্ধতি উন্নত বাস্তবসম্মত উপকরণ ও সুস্পষ্ট নীতির উপর গড়ে উঠেছে তাকেই বলা হয় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। একে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনাও বলা হয় কারণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক সনাতন পদ্ধতিতে কাজ না করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কাজ করলে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের প্রয়োগই ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলেছে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগই এই ব্যবস্থার ভিত্তি। সেজন্য একে মানবসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিচালন দক্ষতার শীর্ষে পৌঁছানোর পথ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হল **পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা।**

● **মৌলিক নীতিসমূহ (Fundamental Principles)**

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ফলে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে **টেলর** (Taylor) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক নীতি প্রণয়ন করেছিলেন। এই নীতিগুলি নিয়েই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। এই নীতিগুলি হল মূলতঃ উৎপাদন-সংক্রান্ত এবং এগুলি হল—

(1) প্রত্যেক শ্রমিককে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করার জন্য দিতে হবে।

(2) নির্দিষ্ট কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

(3) কাজ সম্পাদনের জন্য **উপযুক্ত মানের যন্ত্রপাতি** ও **কাঁচামালের** সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে।

(4) নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পাদন করলেই কর্মীদের **উৎসাহমূলক মজুরীর** ব্যবস্থা করতে হবে।

(5) নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে কর্মীর **শাস্তির ব্যবস্থা** করতে হবে।

(6) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে **কাজের পদ্ধতি** ঠিক করতে হবে।

(7) **কর্মী নির্বাচন** ও তাদের **প্রশিক্ষণের** ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(8) কাজের বণ্টনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সমতার **নীতি** অনুসরণ করতে হবে।

(9) সর্বোপরি ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে **উন্নত কর্মপরিবেশ** সৃষ্টি করতে হবে।

**টেলর** (Taylor) মনে করতেন যে এই নীতিগুলির সাফল্যের শর্ত হল **সার্বিক মানসিক বিপ্লব** (total mental revolution)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উৎপাদন বৃদ্ধি শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই স্বার্থ রক্ষা করে। কারণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মুনাফাও বৃদ্ধি পায়। এরফলে শ্রমিককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হয় এবং তার পরও মালিকের জন্য যথেষ্ট প্রতিদান অবশিষ্ট থাকে।

● **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য (Features of Scientific Management)**

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল **বৈজ্ঞানিক ভিত্তি**। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে প্রচলিত সনাতন রীতিনীতির পরিবর্তে যুক্তিগ্রাহ্য, বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক রীতিনীতির অনুসরণ। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে **টেলরের** মন্তব্য থেকেও এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন—

> হাতুড়ে পদ্ধতি নয়, বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি
> বিভাজন নয়, সংহতিসাধন,
> ব্যক্তি প্রাধান্য নয়, সহযোগিতা,
> নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের পরিবর্তে সর্বাধিক উৎপাদন, এবং
> ব্যক্তিগত দক্ষতা ও সমৃদ্ধির সর্বাধিক উন্নয়ন।

**যাইহোক্, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার** মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(1) সনাতন হাতুড়ে পদ্ধতির পরিবর্তে যুক্তিগ্রাহ্য, বাস্তবোচিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার।

(2) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রমিক নির্বাচন অর্থাৎ সঠিক কাজের জন্য সঠিক কর্মীকে বেছে নেওয়া ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন ঘটানো।

(3) সময় নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা এবং কাজের গতি নিরীক্ষণ করা।

(4) কর্মীদের কাজের ক্লান্তি দূর করার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করা এবং এজন্য ক্লান্তি-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

(5) প্রেরণামূলক মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করে কর্মীদের কাজে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা।

(6) শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলে কর্ম পরিবেশকে উন্নত করা।

(7) উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কাজের উপকরণ ও কাঁচামাল ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটানো।

(8) পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা রূপায়নের মধ্যে পৃথকীকরণ।

● **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অবদান (Contribution of Scientific Management)**

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন ঘটিয়েছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাজ করার পরিবর্তে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার শ্রেষ্ঠ অবদান। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারা ও নতুন দর্শনের প্রবর্তন ঘটিয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যয় হ্রাস করার ক্ষেত্রে এর সাফল্য প্রশ্নাতীত। এছাড়াও কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। নীচে এর অবদানের ক্ষেত্রগুলি তুলে ধরা হল :

(1) নির্দিষ্ট কর্মীর জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের দায়িত্ব অর্পণ ও কর্মী কাজ সম্পাদনে সফল হলে পুরস্কারের ও ব্যর্থ হলে তিরস্কারের ব্যবস্থা করা।

(2) ব্যবস্থাপনার কাজ হিসাবে পরিকল্পনার স্বীকৃতি।

(3) নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সময় নিরীক্ষা, গতি নিরীক্ষা ও ক্লান্তি নিরীক্ষা।

(4) কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, অন্যান্য উপকরণ ও কাঁচামালের নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা।

(5) উৎপাদন ভিত্তিক কাজের জন্য বিভিন্ন মজুরী হার।

(6) কর্মীদের কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে নির্দেশদান।

(7) কর্মসূচী (Programme) ও তালিকা প্রণয়ন (Scheduling)।

(8) সময় সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি।

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে **টেলরের** অবদান সম্পর্কে তাঁরই উত্তরসূরী **গ্যান্ট** (H.L. Gantt)-এর একটি মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে গণ্য হয়। তিনি বলেছিলেন—"বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা শব্দটি দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এটি পাইকারী ভাবে কিনে খুচরো বিক্রয়ের বিষয় নয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় সম্ভাবনার কথা বাদ দিয়ে সমস্যাটি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করা। প্রত্যেক শ্রমিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ দাও এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পাদন করলে পুরস্কৃত কর। এটা করা হলে কর্মনৈপুণ্য বাড়তে বাধ্য"।

● **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা বা সুফল (Advantages or Benefits of Scientific Management)**

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা বা সুফল তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে মুল্যায়ন করা যায়। এগুলি নীচে তুলে ধরা হল :

**(1) ব্যবস্থাপনার দিক থেকে সুবিধা (Benefits from the viewpoint of management) :** ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রমবিভাগ, শ্রমিক নিয়োগ, পদাধিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি করা হয় বলে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(ii) উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। এর দ্বারা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা স্বীকৃতিলাভ করে।

(iii) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের ফলে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় ও সুস্থ সম্পর্কে গড়ে ওঠে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানে শান্তি বজায় থাকে।

(iv) উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকদের মজুরীও বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকরা সন্তুষ্ট হয় ও শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়।

(v) উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

**(2) শ্রমিকদের দিক থেকে সুবিধা (Benefits from the viewpoint of workers) :** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকরা যেসব সুবিধা ভোগ করে সেগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) শ্রমিকের মজুরী বাড়ে, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। এর ফলে তাদের সন্তুষ্টি বাড়ে এবং কাজের ক্ষেত্রে তারা অধিক যত্নবান হয়।

(ii) শ্রমিকরা মানসিক গঠন অনুযায়ী কাজ পায় এবং তাদের মানসিক তৃপ্তি ঘটে।

(iii) প্রশিক্ষণ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় বলে তাদের ক্লান্তি কম হয়। ফলে তাদের দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়।

(iv) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কর্মীরা প্রনোদনমূলক মজুরী লাভ করে।

(v) কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্মীদের সন্তুষ্টি বিরাজ করে।

**(3) সমাজের দিক থেকে সুবিধা (Benefits from the viewpoint of society) :**

(i) বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রম বিভাজন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহারের ফলে জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

(ii) কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সমাজেরও মানোন্নয়ন ঘটে।

(iii) শিল্পে শান্তি বজায় থাকে বলে সমাজকল্যানের পথও প্রশস্থ হয়।

(iv) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের ফলে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে সমাজে বসবাসকারী ভোক্তারা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্য পাওয়ার সুযোগ পায়।

**(2) হেনরী ফেয়ল (Henry Fayol : 1841-1925)**

➢ **জীবনীকাল (Life span) :** তুর্কীর কন্‌স্টান্টিনোপল শহরে 1841 সালে **হেনরী ফেয়ল** (H. Fayol) জন্মগ্রহণ করেন। 1925 সালের ডিসেম্বর মাসে 85 বছর বয়সে তিনি মারা যান। 1860 সালে তিনি চাকুরীতে যোগদান করেন এবং 1918 সালে চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তবে অবসরগ্রহণের পর থেকে আমৃত্যু তিনি কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। সেকারণে এত দীর্ঘ কর্মজীবন সচরাচর দেখা যায় না।

➢ **শিক্ষা (Education) :** তিনি প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল খনি প্রযুক্তিবিদ্যায় (Mining engineer) স্নাতক।

● **ফেয়ল প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতিসমূহ (General Principles of Fayol) :**

**হেনরি ফেয়ল** (H. Fayol) বিশ্বাস করতেন যে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি 'প্রশাসনিক বিজ্ঞান' (administrative science) আছে যার নীতিগুলি সব প্রতিষ্ঠানেই অনুসরণ করা যায়। এই নীতিগুলি, তিনি জোরের সাথে বলেছিলেন অপরিবর্তনীয় নয়, পরিস্থিতি সাপেক্ষে এগুলি ব্যবহার করতে হয়। নীচে **ফেয়ল** প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনার মৌলিক নীতিগুলির ব্যাখ্যা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

**(1) কর্মবিভাজন বা শ্রম বিভাজন (Division of work or labour) :** ব্যবস্থাপনার এই নীতিটি 'বিশেষায়নের নীতি' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই নীতি ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সকল ধরনের কাজের ক্ষেত্রেই উপযোগী। কাজের বিভাজন তথা বণ্টনের মাধ্যমে সময়ের ও শ্রমের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। ব্যবস্থাপনার এই নীতিটি দাবী করে যে প্রত্যেক কর্মীর উপর কেবলমাত্র একধরনের কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। এর ফলে কর্মী ঐ বিশেষ ধরনের কাজে পারদর্শী হয়ে উঠবে এবং তার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে কাজের মান ও উৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।

**(2) কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (Authority and responsibility) : ফেয়ল** মনে করতেন যে দায়িত্ব থেকেই কর্তৃত্ব প্রবাহিত হয়। যেসব ব্যবস্থাপক অন্যদের উপর কর্তৃত্ব করেন তারা অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজের ফলের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও তারা পাশাপাশি অবস্থান করে। কর্তৃত্ব প্রশাসনগত ও ব্যক্তিগত উভয়ই হতে পারে। **দায়িত্ব ছাড়া কর্তৃত্ব দায়িত্বহীন**

**আচরণের জন্ম দেয়, অপরদিকে কর্তৃত্বহীন দায়িত্ব একজনকে অকার্যকর করে তোলে।** সেজন্য কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে অবশ্যই ভারসাম্য থাকবে।

**(3) নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) :** নিয়মানুবর্তিতার নীতি যে কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয় তা কিন্তু নয়। প্রতিটি মানুষের জীবনের ও কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন। নিয়মানুবর্তিতা বলতে আনুগত্য, কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে চলা প্রভৃতি বোঝায়। **ফেয়ল** মনে করেন প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে ভাল পরিদর্শন, স্বচ্ছ ও ন্যায্য চুক্তি, বিচক্ষণতার সাথে প্রযুক্ত শাস্তি প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

**(4) আদেশের একতা (Unity of command) :** যে কোন কাজের ক্ষেত্রে কর্মীর একজন উর্দ্ধতন আধিকারিকের কাজ থেকেই আদেশ পাওয়া উচিৎ। এই নীতি অনুসারে কোন এক সময়ে একজন কর্মী একাধিক উর্দ্ধতন আধিকারিকের কাছ থেকে আদেশ পাবে না, একজন মাত্র আধিকারিকের কাছ থেকেই আদেশ পাবে। যদি কর্মী একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে একাধিক আদেশ পায় তাহলে তা কর্তৃত্বকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে, নিয়মানুবর্তিতাকে দুর্বল করে, আনুগত্যকে ভাগ করে কর্মীকে হতভম্ব বা বিব্রত করে। এর ফলে কাজ সম্পাদনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও দেরী হয়। সুতরাং দ্বৈত অধীনতা (dual subordination) অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

**(5) নির্দেশের একতা (Unity of direction) :** আদেশের একতা এবং নির্দেশের একতার মধ্যে পার্থক্য হল যে প্রথমটি কর্মীর কাজের সাথে যুক্ত, আর দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। সুতরাং নির্দেশের একতা বলতে বোঝায় 'প্রতিষ্ঠানের যেসব কাজের উদ্দেশ্য একই তাদের জন্য একটিই পরিকল্পনা থাকবে এবং একজনই সমস্ত কাজের দায়িত্বে থাকবেন।' অন্যভাবে বলা যায় যে পরস্পর জড়িত কাজগুলি একই শ্রেণীভুক্ত হবে, কাজগুলি সম্পাদনের জন্য একটিই পরিকল্পনা থাকবে এবং কাজগুলি সম্পাদনের দায়িত্বে থাকবেন মাত্র ব্যবস্থাপক। কোন দলে যদি একাধিক কর্ম পরিকল্পনা ও একাধিক নেতা থাকে তাহলে ঐ দল সাফল্যের সাথে কাজ সম্পাদন করতে পারে না। নির্দেশের একতা ছাড়া আদেশের একতা সম্ভব নয় এটা যেমন ঠিক, তেমনি দ্বিতীয়টি কিন্তু প্রথমটি থেকে উৎপন্ন হয় না।

**(6) সাধারণ স্বার্থের অধীনে ব্যক্তিগত স্বার্থ (Subordination of individual interest to general interest) :** প্রতিষ্ঠান সবসময়ই ব্যক্তি থেকে বড়। সুতরাং প্রতিষ্ঠানে কর্মীর ব্যক্তিগত স্বার্থ সবসময় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের অধীনে থাকবে। যেখানে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ তথা সাধারণ স্বার্থের সাথে ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, সেখানে সাধারণ স্বার্থই রক্ষিত হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। সাধারণ স্বার্থরক্ষায় যেসব উপায় গ্রহণ করা হয় সেগুলি হল—(ক) উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃঢ়তা ও ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন, (খ) অধস্তনদের সাথে যুক্তিসঙ্গত আচরণ, (গ) যতটা সম্ভব ন্যায্য চুক্তি সম্পাদন ও (ঘ) ধারাবাহিক পরিদর্শন।

**(7) পারিশ্রমিক (Remuneration) :** পারিশ্রমিক হল প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সেবা প্রদানের পুরস্কার। পারিশ্রমিকের পরিমাণ এবং প্রদান পদ্ধতি অবশ্য ন্যায্য, যুক্তিসঙ্গত এবং কর্মীদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী হওয়া উচিৎ। পারিশ্রমিকের হার প্রাথমিকভাবে জীবনযাত্রার মান, কর্মীদের যোগান, ব্যবসার সাধারণ অবস্থা, প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

**(8) কেন্দ্রীকরণ (Centralisation) :** জীবদেহে যে কোন অনুভূতি মস্তিষ্কমুখী হয় এবং সেখান থেকে নির্দেশ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যায়। কেন্দ্রীকরণের অর্থ হল উচ্চ ব্যবস্থাপনার স্তরে কর্তৃত্বের উপস্থিতি। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই অল্পবিস্তর ক্ষমতার কেন্দ্রিকতার ঝোঁক থাকে। কেন্দ্রীকরণের বিপরীত হল বিকেন্দ্রীকরণ, যার অর্থ—যা কিছু অধস্তর কর্মীদের ভূমিকার গুরুত্ব বাড়ায়। অন্যদিকে যে ব্যবস্থায় অধস্তন কর্মীদের ভূমিকার গুরুত্ব কমায় ও উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনায় যুক্ত ব্যক্তিদের গুরুত্ব বাড়ায় তাই হল কেন্দ্রীকরণ। বস্তুতঃ কতটা কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা উচ্চস্তরে রাখা হবে এবং কতটা কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা অধঃস্তনদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, এব্যাপারে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। পরিস্থিতি অনুসারে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে ভারসাম্য স্থির করা হয়। তবে বর্তমানে কোথাও বিশুদ্ধ কেন্দ্রীকরণ বা বিশুদ্ধ বিকেন্দ্রীকরণ দেখা যায় না। বড় বড় প্রতিষ্ঠানে তাই **'বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীকরণ'** (decentralised centralisation) বা **'কেন্দ্রীভূত বিকেন্দ্রীকরণ'** (Centralised decentralisation) দেখা যায়। অর্থাৎ রুটিন সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার অধিকার নিম্নস্তরের কর্মীদের দেওয়া হয় কিন্তু মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার দায়িত্ব থাকে উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের।

**(9) মাপনি শৃঙ্খল বা কর্তৃত্ব রেখা (Scalar chain) :** ব্যবস্থাপনার এই নীতিটি কিভাবে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কর্তৃত্ব প্রবাহিত হয় তা ব্যাখ্যা করে। Fayol বলেছেন প্রতিষ্ঠানে চূড়ান্ত ক্ষমতাধিকারী এবং সর্বনিম্ন স্তরে যেসব কর্মী কাজ করে তারা একধরনের শিকলদ্বারা যুক্ত। শিকলের প্রতিটি আংটা এক একটি পদ বা ব্যক্তিকে সূচীত করে যাদের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার প্রবাহ উপর থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ সমস্ত যোগাযোগ এই নির্ধারিত আদেশের শিকলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তবে দ্রুত সংযোগ গড়ে তুলতে হলে কর্তৃত্ব রেখাকে এড়িয়ে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। Fayol এর নাম দিয়েছেন 'Gang Plank'। নীচে মাপনী শৃঙ্খল অর্থাৎ কর্তৃত্ব রেখা বা 'Gang Plank' একটি রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

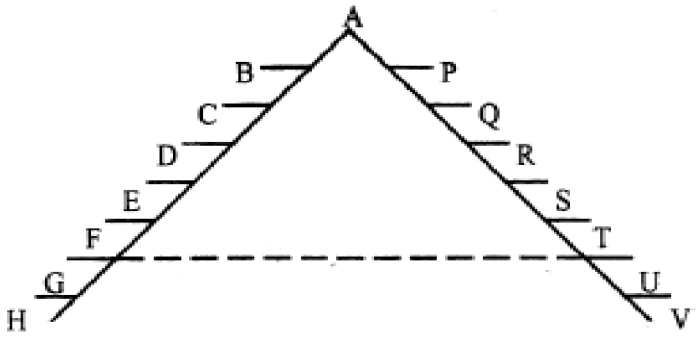


উপরের চিত্র থেকে দেখা যায় যে G এবং U এর মধ্যে কোন যোগাযোগ গড়ে তুলতে হলে তা G থেকে F, F থেকে E ও এভাবে A পর্যন্ত গিয়ে আবার A থেকে P, P থেকে Q এবং এভাবে V পর্যন্ত যাবে। যদিও এর ফলে সময় ও শ্রমের অপচয় হয় তবুও প্রতিষ্ঠানগুলি এভাবেই তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তবে খুব প্রয়োজন হলে H ও V এর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ

গড়ে তোলা যায় (যেমন উপরের G এবং U এর মধ্যে দেখানো হয়েছে)। একে Gang Plank বলে। তবে সাধারণক্ষেত্রে Gang Plank ব্যবহার করা হয় না কারণ এর ফলে কর্তৃত্ব রেখা (Line of authority) দুর্বল হয়ে পড়ে।

**(10) শৃঙ্খলা বা বিন্যাস (Order) :** প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই **বস্তুগত** শৃঙ্খলা বা **বিন্যাস** ও **সামাজিক** শৃঙ্খলা বা বিন্যাস থাকবে। **বস্তুগত বিন্যাস** বলতে বোঝায় "প্রত্যেক বস্তুর জন্য একটি সঠিক জায়গা ও প্রত্যেক বস্তুই সঠিক জায়গায়" রয়েছে। অনুরূপভাবে **সামাজিক বিন্যাস** বলতে বোঝায় "প্রত্যেকের জন্য একটি জায়গা ও প্রত্যেকে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায়" রয়েছে। সঠিক লোককে সঠিক কাজে নিযুক্ত করলে প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সাথে তার কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

**(11) সমদর্শিতা (Equity) :** প্রতিষ্ঠান সকল কর্মীর প্রতি অবশ্যই সমভাব পোষণ করবে। ন্যায় এবং দয়াশীলতা থেকে সমদর্শিতার উদ্ভব হয়। অধস্তন কর্মীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা চলবে না। এর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। সেজন্য সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং স্বজনপোষণ, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি থেকে প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত রাখতে হবে।

**(12) কার্যকালের মেয়াদের স্থায়িত্ব (Stability of tenure of service) :** প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা প্রাথমিকভাবে যোগদান করে জীবন ও জীবিকার স্বার্থে। কোন কাজে কর্মীর সাফল্যের জন্য তাকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে। কারণ নতুন ধরনের কাজ হলে কর্মীকে প্রথমে কাজ শিখতে সময় দিতে হবে এবং পরে কাজ করতে সময় দিতে হবে। সেজন্য তাদেরকে যুক্তিসঙ্গত চাকুরীর নিরাপত্তা দিতে হবে। চাকুরীর মেয়াদের স্থায়িত্ব কর্মীর আনুগত্য বৃদ্ধিতে ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অহেতুক কর্মী বদল কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়ের যেমন বৃদ্ধি ঘটায় তেমনি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হয়।

**(13) উদ্যম (Initiative) :** স্বাধীন চিন্তা অনুসারে পরিকল্পনার রূপায়নকেই বলে উদ্যম। সাংগঠনিক সিঁড়ির প্রতিটি স্তরেই কর্মীদের ইচ্ছা ও শক্তি উদ্যমকে সমৃদ্ধ করে। প্রতিষ্ঠানের কাছে উদ্যমই হল শক্তির উৎস। সেজন্য অধস্তন কর্মীদের পরিকল্পনার উন্নয়ন ও রূপায়নের ক্ষেত্রে মতামত দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

**(14) একতাই বল বা দলীয় একতার নীতি (Esprit de corps) :** 'একতাই শক্তি' এই আপ্তবাক্যটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় থাকবে এবং দলীয় উদ্যম থাকবে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে সহযোগিতা ও সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে 'ঐক্যের শক্তি' প্রতিষ্ঠা করা যায়। দলীয় ফল সব সময় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার যোগফলের বেশী হয় এবং এর পিছনে কাজ করে দলীয় একতার নীতি।

**ফেয়লের** (H. Fayol) মতানুসারে এই নীতিগুলি কোন চরম নীতি নয় এবং এগুলি মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উপরন্তু তারা নমনীয়। তবে এই নীতিগুলি সর্বজনীন ও সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই এগুলি প্রয়োগ করা যায়।

## ২.৫ সারাংশ

বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন থেকেই ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগুলির সৃষ্টি। এই তত্ত্বগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকলে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় অন্তর্নিহিত যুক্তিগুলি জানা যায়। ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে বোঝাতে এবং সেই অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হয়। ব্যবস্থাপনার চলতি পদ্ধতির পরিবর্তন অপরিহার্য বলে মনে হলে এই সব তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতির মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিটি নির্বাচনে ব্যবস্থাপনাকে সাহায্য করে। তত্ত্বগুলির সাহায্যে নিত্য-নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার (New challenges) মোকাবিলা করতে সম্ভব হয়। তাই ওই তত্ত্বগুলি বর্তমান দিনেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

## ২.৬ অনুশীলনী

(১) ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(২) ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন।

(৩) হেনরী ফেয়ল প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতিগুলি আলোচনা করুন।

(৪) ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারার ইতিহাসে এফ. ডব্লু. টেলরের অবদান আলোচনা করুন।

(৫) গতি সমীক্ষা কী?

(৬) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক কাকে বলা হয়?

(৭) ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(৮) মানবিক সম্পর্ক মতবাদে এলটন মেয়োর অবদান বর্ণনা করুন।

(৯) পরিমাণ সূচক ব্যবস্থাপনা মতবাদ বলিতে কী বোঝায়?

(১০) ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

# একক ৩ ❑ পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Planning and Decision Making)

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ পরিকল্পনার সংজ্ঞা

৩.৪ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

৩.৫ পরিকল্পনার ধরন বা প্রকারভেদ

৩.৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণ—ধারনা

৩.৭ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপসমূহ বা পদক্ষেপ

৩.৮ SWOT বিশ্লেষণ

৩.৯ কৌশলগত পরিকল্পনা

৩.১০ সারাংশ

৩.১১ অনুশীলনী

## ৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- পরিকল্পনা প্রণয়ন
- পরিকল্পনার সংজ্ঞা
- পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ, প্রকারভেদ
- সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা, প্রক্রিয়া
- SWOT বিশ্লেষণ

## ৩.২ প্রস্তাবনা

● **অর্থ (Meaning) :** ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলির মধ্যে প্রাথমিক কাজ হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা প্রণয়ন বলতে বোঝায় ভবিষ্যতে যে কাজ করা হবে বলে মনস্থ করা হয় তার একটি পরিকল্পনা রচনা করা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন কাজ সংক্রান্ত আগাম কার্যসূচী রচনা করাই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন।

সুতরাং পরিকল্পনা প্রণয়ন হল আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক ভাবে কোন কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে কোন কাজের পূর্বনির্ধারিত রূপরেখা ঠিক করাই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। আর পরিকল্পনা হল ভবিষ্যতে কোন্ কাজ কিভাবে করা হবে তার রূপরেখা। কোন কাজ সঠিক সময়ে, সঠিক ভাবে সম্পন্ন করার আগাম চিন্তাভাবনার প্রকাশ হল পরিকল্পনা।

বস্তুতঃ পরিকল্পনা প্রণয়ন হল একটি **মানসিক** বা **চিন্তামূলক** কাজ যার অন্তর্নিহিত উপাদানগুলি হল **কল্পনা** (imagination), **দূরদৃষ্টি** (foresight), **পূর্বানুমান** (forecast) ও **সঠিক বিচারক্ষমতা** (sound judgement)। এটি হল কাজ করার আগের চিন্তাভাবনা আর পরিকল্পনা হল এই চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন। পরিকল্পনা প্রণয়নে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করা হয় এবং কিভাবে কাজ করা হবে তা ঠিক করা হয়। তাই পরিকল্পনা প্রণয়ন হল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রাথমিক খাজ আর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ একে অনুসরণ করে।

## ৩.৩ পরিকল্পনার সংজ্ঞা

পরিকল্পনা প্রণয়ন বা রচনা ব্যবস্থাপনার কাজের মধ্যে অগ্রগণ্য। ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা বিভিন্নভাবে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নীচে তুলে ধরা হল :

**থিও হাইম্যান (Theo Haimann) :** 'পরিকল্পনা প্রণয়ন হল কি করা হবে তা আগাম স্থির করা। যখন একজন ব্যবস্থাপক পরিকল্পনা করেন, তিনি ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সূচী বা নক্শা এমনভাবে তৈরি করেন যাতে কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় থাকে ও প্রত্যাশিতফল লাভ করা যায়।'

**এল. আরউইক (L. Urwick) :** 'সুশৃঙ্খল ও পদ্ধতি মাফিক কোন কাজ করার মানসিক প্রবৃত্তিকেই প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা বলা হয়। এটি হল কাজ করার আগের ভাবনা এবং যে ভাবনা ঘটনা নির্ভর, অনুমান-নির্ভর নয়।'

**এম. ই. হার্লে (M.E. Hurley) :** 'পরিকল্পনা প্রণয়ন হল কি করা হবে সে ব্যাপারে আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এর অন্তর্ভুক্ত হল বিভিন্ন বিকল্পের মধ্য থেকে সঠিক উদ্দেশ্য, নীতি, পদ্ধতি ও কর্মসূচী নির্বাচন করা।'

**কুন্জ এবং ও'ডোনেল (Koontz and O'Donnell) :** 'পরিকল্পনা প্রণয়ন হল কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, কখন করতে হবে এবং কে করবে এসংক্রান্ত আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আমরা কোথায় আছি এবং আমরা কোথায় যেতে চাই—এই দুইয়ের মধ্যে পরিকল্পনা সেতুবন্ধনের কাজ করে।'

**ড্রাকার (P.F. Drucker) :** 'সুশৃঙ্খলভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হল পরিকল্পনা'।

**অ্যালেন (Allen) :** 'ভবিষ্যৎকে শৃঙ্খলিত করার ফাঁদ হল পরিকল্পনা'।

উপরের সংজ্ঞাগুলি থেকে পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলা যায় যে ভাগ্যের হাতে ভবিষ্যৎকে ছেড়ে না দিয়ে যাতে নির্দিষ্ট পথে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা করাই হল পরিকল্পনা। এটি একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়। বস্তুতঃ যেভাবে কাজ করলে উদ্দেশ্যসাধন সহজ হবে তা' নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। আর পরিকল্পনা হল ভবিষ্যৎ কাজের বিশদ নক্শা বা রূপরেখা।

নিচে বিষয়টি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল ঃ

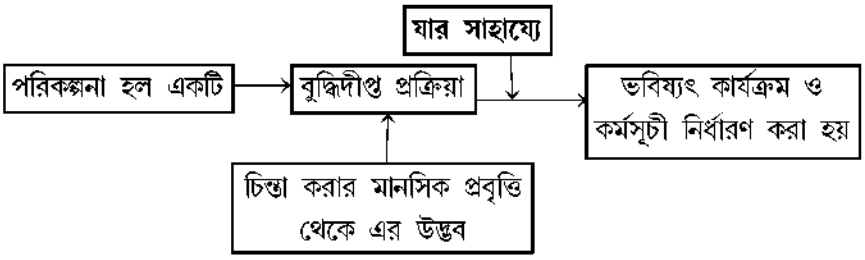


## ৩.৪ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি ধারাবাহিক ও সার্বিক প্রক্রিয়া। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পরিকল্পনা তৈরী করা। পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি বুঝতে হলে এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়গুলি জানা দরকার। কারণ এই ধাপগুলি অতিক্রম করেই পরিকল্পনা পূর্ণতা পায়। যদিও পরিকল্পনার প্রকৃতি অনুসারে এই ধাপগুলি কম-বেশী হতে পারে, তবুও একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে সাধারণতঃ নীচের ধাপগুলি অতিক্রম করতে হয়।

**প্রথম ধাপ ঃ পরিকল্পনার প্রয়োজন উপলব্ধি (Awareness of need for plan) :** পরিকল্পনার প্রয়োজন উপলব্ধি হওয়ার সাথে সাথে পরিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। বস্তুতঃ উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সামনে কি সুযোগ, সম্ভাবনা, আশঙ্কা রয়েছে তা উপলব্ধি করেই পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। বাস্তবে এই ধাপে প্রতিষ্ঠান 'SWOT বিশ্লেষণের' মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বাস্তব অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলে। SWOT Analysis-এর প্রতিটি অক্ষর এক একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এগুলি হল 'S' (Strength) অর্থাৎ শক্তি, 'W' (Weakness) অর্থাৎ দুর্বলতা, 'O' (Opportunity) অর্থাৎ সুযোগ বা সম্ভাবনা এবং 'T' (Threat) অর্থাৎ আশঙ্কা। এই পর্যায়কে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি পর্ব বলা হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপগুলি একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরলে নীচের রেখাচিত্রটি পাওয়া যায় :

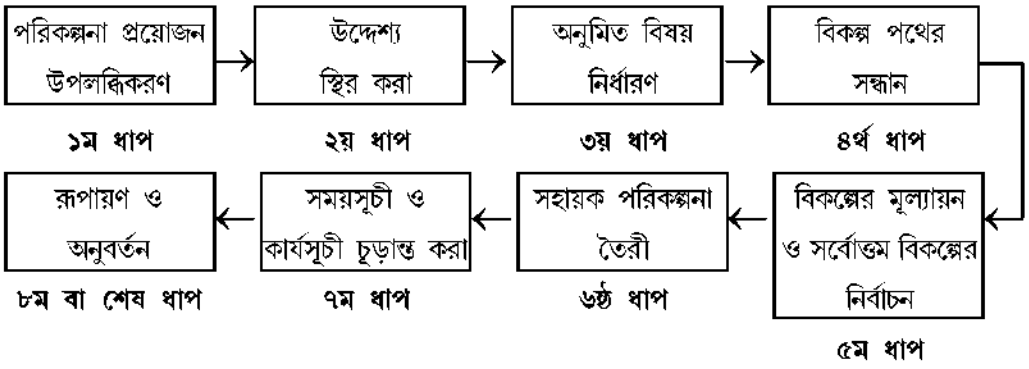


**পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ**

**দ্বিতীয় ধাপ ঃ পরিকল্পনা উদ্দেশ্য স্থির করা (Determination of objective) :** পরিকল্পনা সবসময় উদ্দেশ্যমুখী। অর্থাৎ এক বা একাধিক উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার প্রথম ধাপ শুরু হয় উদ্দেশ্য স্থিরিকরণের মধ্য দিয়ে। যাই হোক্, এই ধাপে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্থির করার কাজ সম্পন্ন হয়। যেমন কোন সমস্যার সমাধান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হতে পারে বা কোন সুযোগের সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যেও পরিকল্পনা তৈরি হতে পারে। সুতরাং পরিকল্পনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি তা প্রথমেই স্থির করতে হয়। কারণ লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন সহায়ক পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। যেমন কোন কোম্পানীর কোন বছরে ২০ শতাংশ মুনাফাবৃদ্ধি যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনাও সেভাবে তৈরি করতে হবে।

**তৃতীয় ধাপ ঃ পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি স্থির করা (Determining the Planning premises) :** পরিকল্পনার উদ্দেশ্য একবার স্থির হয়ে গেলে পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি স্থির করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কারণ এই বিষয়গুলিই পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি হল ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত ধারণাসমূহ। এগুলি পরিকল্পনার পরিবেশ বা চর্তুঃসীমা ঠিক করে দেয় যার মধ্যে পরিকল্পনার প্রয়োগ ঘটে। পূর্বানুমানের সাহায্যে পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক উদারীকরণের পর অনেক বহুজাতিক সংস্থা ভারতে তাদের ব্যবসা শুরু করেছে। এর ফলে ভারতীয় কোম্পানীগুলিও আন্তর্জাতিক মানের শংসাপত্র (ISO-9000) পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ বর্তমানে কোম্পানীগুলি মনে করে যে এর ফলে বহুজাতিক সংস্থাগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে সাহায্য করবে।

**চতুর্থ ধাপ ঃ বিকল্প পথের সন্ধান (Searching for alternatives) :** পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও অনুমিত বিষয়গুলি চূড়ান্ত হয়ে গেলে পরিকল্পনাকারীরা উদ্দেশ্যসাধনের বিভিন্ন পথগুলির অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়। সমস্ত সম্ভাব্য বিকল্প পথগুলি চিহ্নিত করার জন্য এসংক্রান্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হয়। এভাবে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তগুলি থেকে বিভিন্ন বিকল্প পথের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

**পঞ্চম ধাপ ঃ বিকল্প পথগুলির মূল্যায়ন ও সর্বোত্তম পথটির নির্বাচন (Evaluation of alternatives and selection of the best one) :** উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সামনে একাধিক পথ থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র সেই পথটিই গ্রহণ করে যেটি উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক বলে গণ্য হয়। এজন্য প্রতিটি বিকল্প পথ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তগুলি বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক বিকল্প পথের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার করা হয়। তবে বিভিন্ন বিকল্পের মূল্যায়নে পরিকল্পনাকারীরা দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিকল্পগুলির মধ্যে তুলনা করেন ও সর্বোত্তম বিকল্পটি বেছে নেন। এই দুটি বিষয় হল **প্রত্যাশিত ব্যয়** (Expected cost) ও **প্রত্যাশিত সুবিধা** (Expected benefits)। এছাড়াও অনেকক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয় যেমন **ঝুঁকি** (Risk), **প্রত্যাশিত আয়** (Expected return), **অনুমতি বিষয়সমূহ** (Planning premises) ইত্যাদির ভিত্তিতেও বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে তুলনা করা হয়। যাইহোক, এই পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিভিন্ন বিকল্পের মূল্যায়ন করা হয় এবং সর্বোত্তম বিকল্পটি নির্বাচন করা হয় এবং মূল পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়।

**ষষ্ঠ ধাপ ঃ সহায়ক পরিকল্পনা তৈরি করা (Formulation of derivative plans) :** মূল পরিকল্পনা তৈরি হলে পরিকল্পনাকারীরা পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেন। অর্থাৎ মূল পরিকল্পনা

রূপায়ণের জন্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলির পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এগুলিকে মূল পরিকল্পনার সহযোগী বা সহায়ক পরিকল্পনা বলে। এরূপ পরিকল্পনা নীতি বা কৌশল বা পদ্ধতি বা কার্যসূচী বা সময়সূচী বা বাজেট সংক্রান্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোন কোম্পানী একটি নতুন পণ্য বাজারে চালু করতে চায় তখন তাকে পণ্যের নক্শা, আকার বা আকৃতি, ওজন, রং ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। এছাড়াও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা, কাঁচামাল ক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, পণ্যের জন্য বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। আর এই পরিকল্পনাগুলি হল মূল পরিকল্পনার সহযোগী পরিকল্পনা।

**সপ্তম ধাপ ঃ পরিকল্পনার সময়সূচী ও কার্যসূচী চূড়ান্ত করা (Finalisation of schedule and programme of plan) :** পরিকল্পনা প্রণয়নের এই ধাপে প্রতিটি পরিকল্পনাকে সময়সূচী ও কার্যসূচী দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। এর ফলে পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যপূরণ করতে সমর্থ হয়। আর কার্যসূচী বিভিন্ন কাজের ক্রমপর্যায় স্থির করে দেয়। এর ফলে পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে অর্থ ও শ্রমের সাশ্রয় ঘটে। এই পর্যায়ে পরিকল্পনার সমস্ত দিক চূড়ান্ত করা হলে কর্মীদের জানানোর ব্যবস্থা করা হয় যাতে পরিকল্পনা রূপায়ণে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

**শেষ ধাপ ঃ পরিকল্পনার রূপায়ণ ও অনুবর্তন (Implementation and follow up) :** পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অন্তিম ধাপ বা পর্যায়টি হল পরিকল্পনার রূপায়ণ ও অনুবর্তন। অর্থাৎ পরিকল্পনার রূপায়ণ না ঘটলে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিই বিফল হয়ে পড়ে। অনুবর্তনের ফলে পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি সহজেই চিহ্নিত করা যায় ও ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অনুবর্তনের ফলেই কাজের রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটলে তা ঠিক করা যায় অর্থাৎ কাজগুলি যাতে পরিকল্পিত পথেই সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়াও বাহ্যিক পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনার মধ্যে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে তাও করা সম্ভব হয়। এজন্য এই পর্যায়ে পরিকল্পনার রূপায়ণের সাথে সাথে অনুবর্তনও চালানো হয়। এর ফলে পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়।

## ৩.৫ পরিকল্পনার ধরন বা প্রকারভেদ

পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যবস্থাপনার অগ্রগণ্য কাজ বলে গণ্য হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী চূড়ান্ত করা হয়। বস্তুতঃ পরিকল্পনা পথ দেখায় ও প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সেই পথ ধরে উদ্দেশ্য অভিমুখে যাত্রা করে। কারবারী জগতে যেমন বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান দেখা যায় তেমনি পরিকল্পনাও বিভিন্ন ধরনের হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে পরিকল্পনার ধরন বা প্রকার প্রতিষ্ঠানের আকৃতি, প্রকৃতি, কাজের জটিলতা, আয়তন, উদ্দেশ্যের পরিধি প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তাই প্রতিষ্ঠানভেদে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা যেমন গড়ে ওঠে তেমনি একই প্রতিষ্ঠানে একসাথে একাধিক পরিকল্পনার ব্যবহার হতেও দেখা যায়। যেমন কোন প্রতিষ্ঠানে বিভাগীয় পরিকল্পনা যেমন থাকে তেমনি তাদের সন্নিবেশিত করে অধি-পরিকল্পনাও গড়ে তোলা হয়। আবার স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সীমার মধ্যে কাজ করে। যাইহোক্, পরিকল্পনার যে বিভিন্ন ধরন দেখা যায় সেগুলি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বা প্রকৃতি বা ব্যবহার বা গুরুত্ব বা কার্যকাল বা প্রয়োগ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। নীচে একটি রেখচিত্রের মাধ্যমে পরিকল্পনার বিভিন্ন ধরনগুলি তুলে ধরা হল :

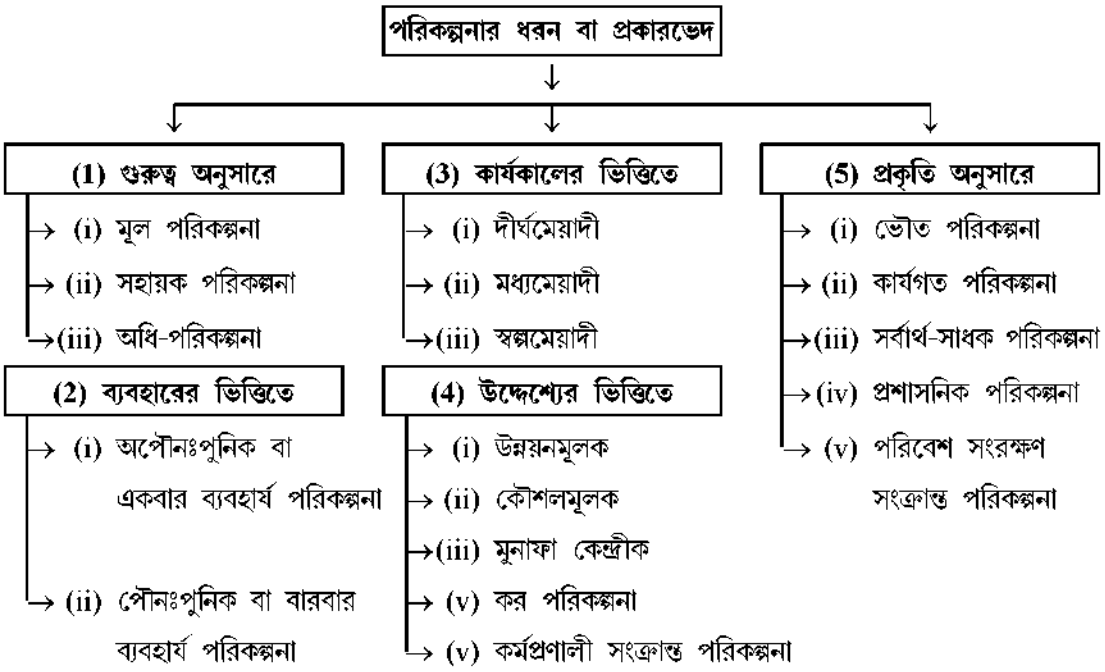


**(1) পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুসারে (On the basis of importance of planning) :** পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুসারে পরিকল্পনাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। এগুলি হল নিম্নরূপ :

**(i) মূল পরিকল্পনা (Basic Plan) :** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিয়ে গড়ে ওঠে। আর এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। একেই মূল পরিকল্পনা বলে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানে যে পরিকল্পনা তৈরি করা হয় তাকেই মূল পরিকল্পনা বলে। প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি মূল পরিকল্পনায় চতুঃসীমার মধ্যে কাজ করে।

**(ii) সহায়ক পরিকল্পনা (Derivative Plan) :** মূল পরিকল্পনায় বিভিন্ন অংশগুলিকে সার্থক করার জন্য যে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাদের সহায়ক পরিকল্পনা বলে। বস্তুতঃ সহায়ক পরিকল্পনা মূল পরিকল্পনাকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়। প্রতিষ্ঠানে যেসব বিভাগীয় ও উপবিভাগীয় পরিকল্পনা তৈরি করা হয় সেগুলি সহায়ক পরিকল্পনার উদাহরণ। অন্যভাবে বলা যায় বিভিন্ন বিভাগীয় ও উপবিভাগীয় পরিকল্পনাগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমেই মূল পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। বস্তুতঃ সহায়ক পরিকল্পনা মূল পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য তৈরি হয়।

**(iii) সার্বিক বা অধি-পরিকল্পনা (Master Plan) :** কারবারের সামগ্রিক কর্মসূচী সম্বলিত পরিকল্পনাকে বলে সার্বিক বা অধি-পরিকল্পনা। এধরনের পরিকল্পনা কর্মসূচী, সময়, বাজেট, কর্মপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে গড়ে ওঠে। এরূপ পরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয়সাধন ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কাজের পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয় বলেই একে সার্বিক পরিকল্পনা বলে। যেমন, বিভিন্ন বিভাগীয় বাজেটগুলি একত্রিত করে প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির হিসাব তৈরি করা হয়। এই সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির হিসাব অধি-পরিকল্পনার একটি উদাহরণ।

**(2) ব্যবহারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা (Planning on the basis of use) :** ব্যবহারের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে বিভক্ত করা হয়। কতকগুলি পরিকল্পনা বারে বারে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পরিকল্পনা হিসাবে গণ্য হয়। যেমন প্রতিষ্ঠানের কর্মী নিয়োগ বা কর্মীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা। আবার কতকগুলি পরিকল্পনা কেবলমাত্র একবার ব্যবহারেরই প্রয়োজন পড়ে। যেমন উৎপাদন বিভাগের জন্য একটি মেশিন কেনার পরিকল্পনা। নীচে এগুলি ব্যাখ্যা করা হল :

**(i) অপৌনঃপুনিক বা একবার ব্যবহার্য পরিকল্পনা (Single-use Plans) :** যেসব পরিকল্পনা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য করা হয় তাদের একবার ব্যবহার্য পরিকল্পনা বলে। অর্থাৎ এগুলি অপৌনঃপুনিক প্রকৃতির এবং একবার ব্যবহারের পর আর এদের কোন প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ভবন তৈরী বা কোন বিশেষ প্রকল্প সংক্রান্ত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পর আর পরিকল্পনার কোন প্রয়োজন পড়ে না বলেই এদের একবার ব্যবহার্য পরিকল্পনা বলে।

**(ii) পৌনঃপুনিক বা বারবার ব্যবহার্য পরিকল্পনা (Recurring or Standing Plans) :** যেসব পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে বারে বারে ব্যবহৃত হয় তাদের বারবার ব্যবহার্য পরিকল্পনা বলা হয়। এদের প্রকৃতি পৌনঃপুনিক ধরনের। এজন্য এগুলি বারে বারে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য এগুলিকে স্থায়ী পরিকল্পনাও বলা হয়। যেসব কাজ প্রতিষ্ঠানকে বারে বারে করতে হয় তাদের জন্য এধরনের পরিকল্পনা রচনা করা হয় যাতে বারে বারে পরিকল্পনা তৈরি করতে না হয়। এরূপ পরিকল্পনা কর্মনীতি, কর্মপ্রণালী ও কর্মপন্থা নিয়ে গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠানে যে ক্রয় পরিকল্পনা বা বিক্রয় পরিকল্পনা থাকে সেগুলি এধরনের পরিকল্পনার উদাহরণ, কারণ প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-সংক্রান্ত ও বিক্রয়-সংক্রান্ত কাজ বার বার করতে হয়।

**(3) কার্যকালের ভিত্তিতে পরিকল্পনা (Planning on the basis of tenure) :** কার্যকালের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল দীর্ঘ-মেয়াদী ও স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা :

**(i) দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা (Long-term plans) :** যে পরিকল্পনার রূপায়ণ দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে তাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বলে। পরিকল্পনার এই সময়কাল সাধারণতঃ পাঁচ বছর বা তার বেশী হয়। বস্তুতঃ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা উন্নয়নমূলক কাজের সাথে যুক্ত থাকে এবং উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকরা এধরনের পরিকল্পনা গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানে সংগঠন গড়ে তোলা, উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন বা নূতন প্রযুক্তির প্রয়োগ, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সরকারের একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যার কার্যকাল পাঁচ বছর।

**(ii) মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা (Medium-term plans) :** যেসব পরিকল্পনার মেয়াদ সাধারণতঃ এক বছরের বেশী কিন্তু পাঁচ বছরের কম হয়, অর্থাৎ এধরনের পরিকল্পনার মেয়াদ গড়ে দুই থেকে তিন বছর। এরূপ পরিকল্পনা সাধারণতঃ কোন বিশেষ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সহায়ক পরিকল্পনারূপে গড়ে ওঠে। সাধারণতঃ মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপকরা এধরনের পরিকল্পনা রচনা করেন। বিপনন, উৎপাদন, বণ্টন, কর্মী উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দেখা যায়।

**(iii) স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা (Short-term plans) :** যেসব পরিকল্পনার মেয়াদ স্বল্পকালীন অর্থাৎ নিকট ভবিষ্যতে প্রকাশিত ফল পাবার জন্য তৈরি হয় তাদের স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা বলে। এগুলির

প্রকৃতি অনেকাংশে রুটিনমাফিক। সাধারণতঃ মধ্য-স্তরের বা নিম্ন-স্তরের ব্যবস্থাপকরা কোন আশু সমস্যা সমাধানের জন্য বা তাদের দৈনন্দিন কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য এধরনের পরিকল্পনা গড়ে তোলেন। এরূপ পরিকল্পনার মেয়াদ এক সপ্তাহ বা এক মাস বা এক বছর হতে পারে। অনেক সময় একে কৌশলী পরিকল্পনাও বলা হয়। প্রতিষ্ঠান যখন ছ'মাস বা একবছরের জন্য অর্থ-বাজেট বা বিক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করে তখন এগুলিকে স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা বলে। সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির হিসাব (Budgeted profit and loss account) এরূপ পরিকল্পনার উদাহরণ।

**(4) উদ্দেশ্যভিত্তিক পরিকল্পনা (On the basis of goal) :** যদিও সব ধরনের পরিকল্পনার-ই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে তবুও বিশেষ কতকগুলি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যখন পরিকল্পনা রচনা করা হয় তখন তাদের উদ্দেশ্যভিত্তিক পরিকল্পনারূপে গণ্য করা হয়। এরূপ পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনগুলি নীচে তুলে ধরা হল :

**(i) উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা (Development plans) :** একটি প্রতিষ্ঠানে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেগুলি মূলতঃ দু'ধরনের। এক ধরনের পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজগুলি সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য তৈরি করা হয় এবং এগুলি পৌনঃপুনিক প্রকৃতির ও স্বল্পমেয়াদী হয়। অন্য ধরনের পরিকল্পনাগুলি অপৌনঃপুনিক প্রকৃতির এবং এরা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য রচিত হয়। এদেরকেই উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বলে। উৎপাদনের আধুনিকীকরণ বা গবেষণা ও উন্নয়ন বা বহুমুখীকরণ ইত্যাদি ফলপ্রসূ করার জন্য যে পরিকল্পনা তৈরি করা হয় সেগুলি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা হিসাবে গণ্য হয়। উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকরা এধরনের পরিকল্পনা রচনা করেন কারণ এরূপ পরিকল্পনায় অনেক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

**(ii) কৌশলমূলক পরিকল্পনা (Tactical plans) :** তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে কারবারী প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে হয়। বিভিন্ন কাজে সাফল্যের উপরই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও অগ্রগতি নির্ভর করে। আর এই সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কৌশল সংক্রান্ত পরিকল্পনার উপর। বস্তুতঃ এধরনের পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সাহায্য করে। এরূপ পরিকল্পনা সাময়িক হতে পারে বা দীর্ঘমেয়াদীও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কোন প্রতিষ্ঠান যখন তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার পাওয়ার জন্য পণ্যের অন্তর্ভেদী দাম (penetrating price) স্থির করে তখন একে কৌশলমূলক পরিকল্পনা বলে।

**(iii) মুনাফা কেন্দ্রীক পরিকল্পনা (Profit-oriented plans) :** কারবারী প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন কারণ মুনাফা অর্জন করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। তাই মুনাফা অর্জনকে কেন্দ্র করে যে পরিকল্পনা রচনা করা হয় তাকে মুনাফা সংক্রান্ত পরিকল্পনা বলে। প্রত্যাশিত লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিভাগের ক্ষেত্রে যে কাজের লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া হয় তা এধরনের পরিকল্পনারই অঙ্গ। প্রতিষ্ঠান আগামী বছরের জন্য যে সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির হিসাব তৈরি করে তা এধরনের পরিকল্পনার উদাহরণ।

**(iv) কর পরিকল্পনা (Tax planning) :** প্রতিষ্ঠানের কাছে কর বোঝাস্বরূপ। এর আইনগত জটিলতা অত্যন্ত বেশী বলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই কর-সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। কারণ সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে কর প্রদান করা না হলে প্রতিষ্ঠানে নানাধরনের আইনী সমস্যা দেখা দেয় যেমন জরিমানা, দণ্ড ইত্যাদি। এর ফলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই তার কর

সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। এধরনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল যাতে কর সংক্রান্ত কোন ঝামেলার মধ্যে প্রতিষ্ঠানকে পড়তে না হয়।

(v) **কর্ম প্রণালী সংক্রান্ত পরিকল্পনা (Operational plan) :** প্রণালী বলতে বোঝায় পরস্পর যুক্ত পদ্ধতি যা কোন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য একটি উপযুক্ত প্রণালী রচনা করার কাজকেই কর্মপ্রণালী সংক্রান্ত পরিকল্পনা বলা হয়। যেমন ক্রয়ের ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি কর্মপ্রণালী সংক্রান্ত পরিকল্পনার অন্তর্গত। এর ফলে কর্মসম্পাদন অনেক সহজ ও সাবলীল হয়।

**(5) প্রকৃতি অনুসারে পরিকল্পনার প্রকারভেদ (Plan on the basis of nature) :** পরিকল্পনার প্রকৃতি অনুসারেও বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি নীচে আলোচনা করা হল :

(i) **ভৌত পরিকল্পনা (Physical plans) :** প্রতিষ্ঠানের ভৌত উপাদানগুলির কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিৎ করার জন্য যে পরিকল্পনা তৈরি করা হয় তাকেই ভৌত পরিকল্পনা বলে। প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ, বাড়ি-ঘর, কর্মী ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিকল্পনা ভৌত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

(ii) **কার্যগত পরিকল্পনা (Functional plans) :** কার্যগত পরিকল্পনা হল কোন বিশেষ কাজ সংক্রান্ত পরিকল্পনা। প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজে যুক্ত থাকে। এই প্রতিটি কাজের সাফল্যের উপরই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে। তাই প্রতিটি কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। আর এই প্রতিটি কাজের পরিকল্পনাকে কার্যগত পরিকল্পনা বলে। যেমন একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কয়েকটি কাজ হল কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন, বিপণন, কর্মী সংক্রান্ত ও আর্থিক কাজ। এই প্রতিটি কাজের জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হয় তাদের প্রতিটিকে কার্যগত পরিকল্পনা বলে।

(iii) **সুসংহত পরিকল্পনা (Comprehensive plans) :** ভৌত ও কার্যগত পরিকল্পনাকে নিয়ে সুসংহত পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। এই পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের ভৌত উপাদানগুলির উপর যেমন গুরুত্ব দেয় তেমনি প্রতিষ্ঠানের কার্যগত দিকের উপরও সমান গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ এরূপ পরিকল্পনার উপাদানগুলি হল বাড়ি, জমি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কর্মী, বিপণন, উৎপাদন, অর্থসংক্রান্ত, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি।

(iv) **প্রশাসনিক পরিকল্পনা (Administrative plans) :** প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে কাজ করে। বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য নীতি, পদ্ধতি, প্রণালী ইত্যাদি স্থির করার কাজ প্রশাসনই করে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কিভাবে সাধন করা হবে তা প্রশাসনিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করা হয়। এই পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করে।

(v) **পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা (Environment protection plans) :** আধুনিক কালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। পরিবেশ আজ বিপন্ন। কারবারী ক্ষেত্রে অনৈতিক কার্যকলাপ সামাজিক পরিবেশকে প্রতিনিয়তই দূষিত করে চলেছে। আর এজন্যই আজ পরিবেশ দূষণের দায়ে অনেক প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত পরিবেশ দূষণকারীদের সমাজের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ যাতে পরিবেশ দূষণ না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়।

## ৩.৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণ—ধারনা

ব্যবস্থাপনার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কারবার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বিলোপসাধন পর্যন্ত সব বিষয়ে, সব ক্ষেত্রে এবং সব সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি কার্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি অন্তর্নিহিত বিষয়। ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত সব ব্যবস্থাপকগণই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতীত কার্য সম্পাদন করতে পারে না। পরিকল্পনা প্রণয়নে কতকগুলি বিকল্প কার্যক্রম থেকে একটিকে বেছে নিতে গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দরকার। সংগঠনে উপযুক্ত কার্যের জন্য উপযুক্ত কর্মীকে বেছে নিতেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন। কীভাবে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা হবে সে বিষয়ে স্থির করাও হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, কখন, কীভাবে, কার ওপর ও কোথায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে তা ঠিক করতে গেলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ কারবারি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ, উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি কার্যসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন, কারবারে কর্মসূচী, নিয়মকানুন, বাজেট তৈরি প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে। তাই ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ব্যবস্থাপনার প্রাণস্বরূপ বলা হয়।

### সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংজ্ঞা

সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থা থেকে সর্বোত্তম কর্মপন্থাটি নির্বাচন করা যায়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাবিদ্‌দের দেওয়া সংজ্ঞা নীচে উল্লেখ করা হল—

পিটার. এফ. ড্রাকার (P.F. Drucker)-মতে "একজন ব্যবস্থাপক তার সকল কার্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সম্পাদনা করেন।"

জর্জ টেরী (George Terry) বলেছেন "দুই বা তার বেশি সম্ভাব্য পন্থা থেকে একটি মাত্র বিকল্প পন্থা, নির্বাচনই হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ডি. ই. ম্যাকফারল্যান্ড (D.E. McFarland)-এর ভাষায় "কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপকগণ যে কার্য করতে মনস্থ করেন তাই হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ।"

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত মূল্যায়নের ভিত্তি বিভিন্ন সম্ভাব্য কর্মপন্থা থেকে সর্বোত্তম কর্মপন্থা নির্বাচন করার মানসিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

### সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব

কারবারি প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবস্থাপনায়, সব সময়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ-ই হল একমাত্র পন্থা যার সাহায্যে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সমস্ত কার্যাবলি পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কার্যাবলি যেমন পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মী-নিয়োগ, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্যাবলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন বিকল্পের মধ্য থেকে কার্যকরী ও শ্রেষ্ঠ বিকল্প বেছে নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সংগঠন কাঠামো কী ধরনের হবে, কোন ব্যক্তিকে কোন কার্যভার

দেওয়া হবে প্রভৃতি বিষয়ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই স্থির করা হয়। শুধুমাত্র দায়িত্ব নির্ধারণ বা কর্তৃত্ব প্রদান নয় কর্মীদের নিয়োগ ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রভূত গুরুত্ব আছে। কোন উৎসাহমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অনুপ্রাণিতকরণ সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হবে সেই বিষয়েও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রয়োজন। কী ধরনের মান স্থির করা হবে, কার্যাবলির পরিমাপ কী হবে, কিংবা নির্দিষ্ট মান থেকে বিচ্যুতি ঘটলে তার সংশোধন কীভাবে করা হবে প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্থির করা হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে।

কারবারি জগৎ অনিশ্চয়তায় ভরা। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ঐ অনিশ্চয়তা বহুলাংশে দূর করা সম্ভব হয়। ব্যবস্থাপনার বহুবিধ সমস্যা থাকে। সমস্যা সমাধানের একাধিক পথও আছে। বিকল্পগুলির মধ্য থেকে কোনটি গ্রহণীয় সে সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারাই প্রতিষ্ঠান তার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারে। তাই ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব অসীম।

## ৩.৭ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপসমূহ বা পদক্ষেপ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় আছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপক কার্যাবলি নীচের পদক্ষেপ বা ধাপগুলির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

### (১) সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Identification of Problem) :

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান ধাপ হল সমস্যা চিহ্নিত করা। কারবারি প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য সমস্যা থাকে। এই সমস্যাগুলির প্রকৃত স্বরূপ জানা দরকার। সমস্যার প্রকৃতি জানতে পারলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয়। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনেক ধরনের সমস্যা থাকে। যেমন, যন্ত্রপাতি খারাপ বা অপ্রচলিত হওয়া, ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন, শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মবিরতি প্রভৃতি। সেই রকম একটি ক্রয়-বিক্রয়কারী (Trading) প্রতিষ্ঠানেরও অসংখ্য সমস্যা থাকে। যেমন, বিক্রয় হ্রাস পাওয়া, বিক্রয়কর্মীদের দুর্ব্যবহার, দেনাদারদের দেনা সময়ে না পাওয়া ইত্যাদি। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে প্রকৃত সমস্যা প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে। তার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কৌতূহলী মনোভাব ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

### (২) সমস্যার বিশ্লেষণ (Analysing the Problem) :

সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণের পর সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করা দরকার। এর ফলে সমস্যার এক একটি অংশের সমাধানের পন্থা নির্ণয়ের উপর বেশি প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হয়। যেমন, ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে দেখতে হবে সারাদিনে কতগুলি দ্রব্য খারাপ উৎপাদিত হয়, উৎপাদিত দ্রব্য কী ধরনের ত্রুটিপূর্ণ—ইহা কি পরিমাণে কম বা সঠিক গঠনের নয় কিংবা সঠিক মাপের নয় প্রভৃতি, বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যাগুলি খুঁজে বার করা প্রয়োজন। যে কোনও সমস্যার, অনেকগুলি সীমা-নির্ধারণকারী শক্তি ও উপাদান থাকে। সেগুলির মধ্যে কিছু আছে প্রাসঙ্গিক আবার কিছু আছে অপ্রাসঙ্গিক। সমস্যার প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে। আর অপ্রাসঙ্গিক উপাদানগুলি বর্জন করতে হবে।

### (৩) সমাধানের বিকল্প পন্থা অনুসন্ধান (Searching Alternative Solution) :

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল পর্যায় বা ধাপ হল সমাধানের বিকল্প পন্থা অনুসন্ধান। কোনও সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পন্থা থাকতে পারে। এই সমস্ত বিকল্প পন্থা অনুসন্ধানই সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে যতগুলি সম্ভব বিকল্প সমাধান অনুসন্ধান করতে হবে। বিকল্পগুলি অনুসন্ধান করার সময় সেগুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। বিকল্প পন্থা অনুসন্ধানের বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও দূরদর্শিতার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়বৃদ্ধির প্রয়াসে বিভিন্ন বিকল্প উপায় আছে। যেমন, পণ্যের গুণমান বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করা, কার্যকর বিক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিশেষ বিজ্ঞাপন অভিযান ইত্যাদি। বিক্রয় বৃদ্ধি জনিত সমস্যা সমাধানের জন্য উপরোক্ত কোন বিকল্পটি সর্বাধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর তা ঠিক করতে পারলে সিদ্ধান্তগ্রহণ নির্ভুল ও সহজসাধ্য।

### (৪) সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্প নির্বাচন (Selecting the Best Alternative) :

সমস্যা সমাধানের বিকল্পগুলির মধ্য থেকে সর্বোত্তম বিকল্পটি নির্বাচন করা দরকার। বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও কার্যকরী বিকল্পটি নির্বাচন করা হয়। অবস্থা অনুযায়ী যে বিকল্পটির খরচ ও সময় কম লাগে এবং প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াও অপেক্ষাকৃত কম, সেই বিকল্পটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান বাছাইয়ের জন্য পিটার. এফ. ড্রাকার নিম্নলিখিত চারটি প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন।

(ক) প্রত্যাশিত ফললাভের সঙ্গে ঝুঁকির অনুপাত বিশ্লেষণ;

(খ) ফললাভের সম্ভাবনা ও প্রচেষ্টার মধ্যে সংহতি-বিধান;

(গ) সুবিধাযুক্ত সময় এবং

(ঘ) প্রাপ্ত সহায়-সম্বলের সীমাবদ্ধতা।

### (৫) সিদ্ধান্ত রূপায়ণ (Putting the Decisions into Action) :

সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্পটি নির্বাচনের পর বাস্তবে সেটিকে রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য দরকার যে সকল ব্যবস্থাপক বা কর্মী গৃহীত সিদ্ধান্তটি কাজে রূপদান করবেন তাদেরকে সিদ্ধান্তটির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বোঝানো, সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের স্বীকৃতি পাওয়া এবং তাদের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ। গৃহীত সিদ্ধান্তে যদি কোনও পরিবর্তন করা হয় তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে জানাতে হবে। সিদ্ধান্ত সঠিক হলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাস্তবায়নের কাজ অনেক সহজসাধ্য হয়। সিদ্ধান্তের রূপায়ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর দ্বারা সাংগঠনিক উদ্দেশ্যপূরণ সম্ভবপর হয়।

### (৬) সিদ্ধান্তের অনুসরণ (Following up the Decision) :

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত সব ক্ষেত্রেই সঠিক ও অভ্রান্ত হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কিছু পূর্বানুমানের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পূর্বানুমানগুলির সবকটি সঠিক নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তটি ফলপ্রসূ হয় না। এছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সীমিত ক্ষমতার দরুন সিদ্ধান্তে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সেই কারণে গৃহীত সিদ্ধান্তটির ভুল-ত্রুটি যাচাই করার জন্য সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার পরেও তাহা অনুসরণ করা প্রয়োজন। কোনও দোষ-ত্রুটি পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করা দরকার।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ নীচে রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপিত করা হল :

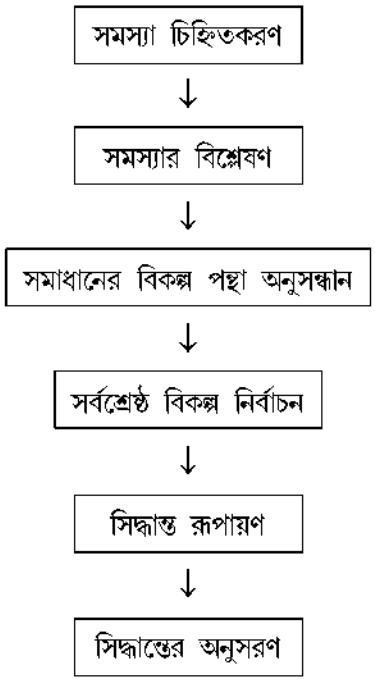


## ৩.৮ SWOT বিশ্লেষণ

প্রতিষ্ঠানের কৌশল প্রণয়নে SWOT বিশ্লেষণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সামনে কি সুযোগ, সম্ভাবনা, এবং আশঙ্কা রয়েছে তা উপলব্ধি করেই পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। বাস্তবে এই ধাপে প্রতিষ্ঠান 'SWOT' বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বাস্তব অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলে। SWOT বিশ্লেষণের প্রতিটি অক্ষর এক একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এগুলি হল 'S', (Strength) অর্থাৎ শক্তি, 'W' (Weakness) অর্থাৎ দুর্বলতা, 'O' (Opportunity) অর্থাৎ সুযোগ বা সম্ভাবনা এবং 'T' (Threat) অর্থাৎ আশঙ্কা। SWOT বিশ্লেষণ একটি পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ যা কিনা প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক আশঙ্কা এবং সুযোগকে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং শক্তিকে মিলকরণ করতে সহায়তা করে। বাহ্যিক বিশ্লেষণ বলতে বাজারকে ব্যাখ্যা করা, প্রতিযোগিতাকে বিশ্লেষণ করা, বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা, কারিগরিবিদ্যার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা, মুলধনের পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং পরিবেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ করাকে বোঝায়। বাহ্যিক

বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ককে চিত্রায়িত করে। এই ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান বর্তমান পরিবেশে যে সমস্ত সম্ভাবনা এবং আশঙ্কা থাকতে পারে তার এক সুস্পষ্ট তালিকা নির্ধারণ করতে পারে।

অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান তার শক্তি এবং দুর্বলতাগুলিকে বিশ্লেষণ করে থাকে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান তার বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পর্কে বাস্তবমুখি হবে এবং কখনই তার শক্তিকে অধিক গুরুত্ব এবং দুর্বলতাগুলিকে অনধিক গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করবে না। যেকোন প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বাস্তবমুখী এবং ভবিষ্যমুখী হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি বিশ্লেষণের জন্য যে সমস্ত বিষয়গুলি প্রয়োগ করা হয় তা হল :

- আর্থিক কার্য সম্পাদন—বিনিয়োগের উপর আয় প্রাপ্তি (ROI), প্রতি শেয়ারে প্রাপ্ত আয় (EPS)। সম্পত্তির উপর আয় প্রাপ্তি (ROA), ইকুইটির উপর আয়প্রাপ্তি (ROE) ইত্যাদি।
- বাজার অবস্থা—বাজারের অংশ (market share), পণ্য জীবন চক্রের ধাপ, পণ্যের গুণমান, বিক্রয়ের পরিমাণ ইত্যাদি।
- দৈহিক সম্পত্তি—প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতির জীবন এবং কার্যকরী মেয়াদ।
- মানব সম্পদ—ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের বয়স এবং অভিজ্ঞতা, টেকনিক্যাল এবং পেশাদারী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের পরিমাণ এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ইত্যাদি।
- শক্তি এবং কাঁচামাল অধিগ্রহণ—শক্তি উৎসের ধারাবাহিকতা, পরিব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি।
- গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাবলী—ব্যয়ের স্তর এবং ধরন, বাজারজাতকরণ পণ্যের সংখ্যা, পেটেন্টের সংখ্যা, বর্তমান পণ্যের উন্নয়ন ইত্যাদি।
- বিপণন এবং বণ্টন ব্যবস্থা—দক্ষতা, সম্ভাবনা এবং বৃদ্ধি।
- উৎপাদন ব্যবস্থা—দক্ষতা, পণ্যের গুণমান, খারাপের সংখ্যা, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং গণ্ডগোল, সম্প্রসারণের সম্ভাবনা, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি।
- প্রযুক্তির ব্যবহার—আধুনিকিকরণ, বৃদ্ধির ধরন এবং মেয়াদ।
- ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা—পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের কার্যক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন পরিকল্পনা, অতীত কৌশলের সফলতা ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানের শক্তি, দুর্বলতা, সম্ভাবনা এবং আশঙ্কা আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা গেলেও এই চারটি বিষয়কে একত্রিত করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই কৌশলগতভাবে SWOT বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ওয়েরিচ (Weihrich) এবং কুন্‌জ (Koontz) 2005 সালে একটি SWOT ম্যাট্রিক্স-এর প্রস্তাব করেন। এই SWOT matrix হল নিম্নরূপ :

SWOT Matrix

| বাহ্যিক প্রভাব (External effects) | অভ্যন্তরীণ উপাদান (Internal Factors) S | অভ্যন্তরীণ উপাদান (Internal Factors) W |
|---|---|---|
| O | SO কৌশল : সর্বাধিক — সর্বনিম্ন (Maximum) (Minimum) সকল কৌশল প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠানের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সম্ভাবনার সুবিধা পাওয়া। (Successful strategy of utilizing the organisation's strength to take advantage of opportunities) | WO কৌশল : সর্বনিম্নকরণ — সর্বনিম্নকরণ (Minimize) (Minimize) উন্নয়নমূলক কৌশল প্রয়োগের দ্বারা দুর্বলতাকে দূর করা যাতে সম্ভাবনার সুবিধা পাওয়া যায়। (Developmental strategy to overcome weaknesses in order to take advantage of opportunities) |
| T | ST কৌশল : সর্বাধিক — সর্বনিম্ন (Maximum) (Minimum) আশঙ্কা মোকাবিলার জন্য কৌশল প্রয়োগ (Use strategies to cope with threats) | WI কৌশল : সর্বনিম্নকরণ — সর্বাধিককরণ (Minimize) (Maximize) যেমন, অপসারণ, অবসায়ন (e.g. Retrenchment, Liquidation) |

O : Opportunities (সুযোগ সমূহ)
T : Threats (আশঙ্কা সমূহ)
S : Strengths (শক্তি সমূহ)
W : Weaknesses (দুর্বলতা সমূহ)

যেহেতু বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ গতিশীল তাই যারা প্রতিষ্ঠানে কৌশল ঠিক করেন তাদের অবশ্যই অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন SWOT Matrix তৈরী করা উচিত।

## ৩.৯ কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Planning)

ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে প্রত্যাশিত অবস্থাতে কারবারকে আনার জন্য জটিল পরিকল্পনাই হচ্ছে কৌশল। সামরিক ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করা গেলেও কারবারী জগতে সাধারণতঃ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়াকে বোঝায়। তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে কারবারী প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে হয়। বিভিন্ন কাজে সাফল্যের উপরই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও অগ্রগতি নির্ভর করে। আর এই সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনার উপর। বস্তুতঃ এ ধরনের পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সাহায্য করে। এরূপ পরিকল্পনা সাময়িক হতে পারে বা দীর্ঘমেয়াদীও হতে পারে। হেইনস (Haynes) এবং ম্যাসি (Massie) বলেছেন—"কৌশল হল পরিকল্পনার সেই অংশ যা এখন কতকগুলি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মোকাবিলা করার চেষ্টা করে, যেগুলি সম্পর্কে আগের থেকে বিশেষ কোনো তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, অথচ যেগুলি নির্ভর করে অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের উপর।"

ক্লীল্যান্ড (Cleland) এবং কিংগ (King)-এর মতে—"ভবিষ্যতে এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে এক প্রত্যাশিত অবস্থায় সংগঠনকে আনার জন্য যে জটিল পরিকল্পনা তাই হল কৌশল।"

কৌশলগত পরিকল্পনার প্রধান উপাদান হল চারটি যথা—মূল লক্ষ, কৌশলগত উদ্দেশ্য, কৌশল স্থিরিকরণ এবং সমন্বিত পরিকল্পনা। মূল লক্ষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজ কি হবে তা বিবেচনা করে থাকে। প্রতিষ্ঠান কি করবে এবং সম্পদের বণ্টন কিভাবে হবে তা ঠিক করা হয়ে থাকে। কৌশলগত উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করা যা কিনা হবে দীর্ঘকালীন। বিনিয়োগের উপর আয় প্রাপ্তি (return on investment), বৃদ্ধি (growth), বাজার-অংশ (market-share) ইত্যাদি কৌশলগত উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। আর এগুলি সবই দীর্ঘকালীন। কৌশল স্থিরিকরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান এক বা একাধিক কৌশল গ্রহণ করতে পারে। কিছু প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ পরিকল্পনা কৌশল হিসাবে নির্ধারণ করতে পারে আবার কেউ কেউ বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। তবে বর্তমানে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। কৌশলগত ভাবে এই পরিকল্পনা বাজারে প্রতিষ্ঠানের অংশ (market share) বৃদ্ধি করা, বর্তমান বাজার-অংশ ধরে রাখা এবং বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য করা হয়ে থাকে। ১৯৯০-এর দশক থেকে বিশ্বায়ন, উদারিকরণ এবং বেসরকারীকরণের জন্য ভারতবর্ষে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠানকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে অবশ্যই তার পণ্যের মুল্য কম রাখতে হবে এবং অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে হবে। কৌশলগত পরিকল্পনার চতুর্থ উপাদান হল সমন্বিত পরিকল্পনা (Portfolio Planning)। বাজারের অবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে উচ্চতর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজগুলিকে মূল্যায়ন করে থাকে। যখন প্রতিষ্ঠানের সকল কার্য পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করা হয়ে যায়, তখনই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষে কৌশলগত ভূমিকা গ্রহণ করা হয়। সকল কাজের মধ্যে মূলধনের এবং সম্পদের যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমে সার্বিক সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে যাতে করে প্রতিষ্ঠান তার বিক্রয়, আয়, সম্পদ মিশ্রণ ইত্যাদির মধ্যে একটা পরিকল্পিত বৃদ্ধির ধারা রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

## ৩.১০ সারাংশ

ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলির মধ্যে প্রাথমিক কাজ হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা প্রণয়ন হল আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে কোন কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে কোন কাজের পূর্ব নির্ধারিত রূপরেখা ঠিক করাই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। আবার ব্যবস্থাপনার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কারবার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বিলোপসাধন পর্যন্ত সব বিষয়ে সব ক্ষেত্রে এবং সব সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি কার্যে সিদ্ধান্তগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা প্রণয়নে কতকগুলি বিকল্প কার্যক্রম থেকে একটিকে বেছে নিতে গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দরকার। তাই ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ব্যবস্থাপনার প্রাণস্বরূপ বলা হয়। এই এককটি পড়ে আমরা পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্পর্কে এক সম্যক ধারণা লাভ করতে পারলাম।

## ৩.১১ অনুশীলনী

(১) পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়? পরিকল্পনার ধরণগুলি আলোচনা করুন।

(২) পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা করুন।

(৩) সার্বিক বা অধি-পরিকল্পনা এবং সহায়ক পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

(৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণ কী? ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

(৫) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

(৬) SWOT বিশ্লেষণ বলতে কি বোঝায়?

(৭) কৌশলগত পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও, ইহার উপাদানগুলি কী কী?

(৮) একবার ব্যবহার্য পরিকল্পনা এবং কারবার ব্যবহার্য পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

# একক ৪ ❑ সংগঠন গড়ে তোলা (Organisation)

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ সংগঠন গড়ে তোলা—ধারণা

৪.৩.১ সংগঠন—সংজ্ঞা

৪.৪ সংগঠনের নীতিসমূহ

৪.৫ সংগঠনের ধরন

৪.৬ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের কার্যাবলী

৪.৭ ভার অর্পণ

৪.৭.১ ভারার্পণ কী

৪.৭.২ কর্তৃত্বের ভারার্পণ

৪.৭.৩ কর্তৃত্বের ভারার্পণ—বৈশিষ্ট্য

৪.৭.৪ ভারার্পণের নীতিসমূহ

৪.৮ ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তি বা পরিধি

৪.৮.১ অর্থ ও সংজ্ঞা

৪.৮.২ ব্যবস্থাপনার পরিধির ধরন

৪.৮.৩ ব্যবস্থাপনার পরিধি নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ বা উপাদানসমূহ

৪.৯ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ

৪.৯.১ বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা নিরূপনকারী উপাদানগুলি

৪.৯.২ বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা

৪.১০ সারাংশ

৪.১১ অনুশীলনী

## ৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- সংগঠনের সংজ্ঞা, নীতিসমূহ এবং ধরন
- ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের কার্যাবলী
- ভার অর্পণ
- ব্যবস্থাপনার পরিধি
- কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ

## ৪.২ প্রস্তাবনা

অর্থনীতিতে সংগঠনকে উৎপাদনের একটি উপাদান হিসাবে গণ্য করা হলেও কারবারের ক্ষেত্রে সংগঠন বলতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয়সাধনকে বোঝায়, একটি কারবার বা উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখতে অর্থ, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও লোকবল আবশ্যিক। এগুলি যত ভালোভাবে সংগঠিত করা যাবে ততই কারবার সাফল্য লাভ করবে।

## ৪.৩ সংগঠন গড়ে তোলা—ধারণা

ব্যুৎপত্তিগতভাবে সংগঠন কথার অর্থ হল 'প্রকৃষ্টভাবে গঠন'। ব্যবস্থাপনামূলক কাজের মধ্যে **দ্বিতীয় অগ্রগণ্য কাজটি** হল প্রতিষ্ঠানে একটি সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা বা বলা যায় প্রতিষ্ঠানের কাজের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সংগঠিত করা। আমরা জানি যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কতকগুলি উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে ওঠে। আর এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তারা বিভিন্ন কার্যকলাপ গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানের কাজগুলি যাতে সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে ও সঠিক ব্যয়ে সম্পন্ন হয় তার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। বস্তুতঃ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলেই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব শেষ হয় না। ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ হল পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়ণ করা। আর এর জন্য প্রতিষ্ঠানে একটি কার্যকরী সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। কারণ পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন হয় তাদেরকে এক সূত্রে বাঁধার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠান দু'ধরনের উপাদানের সাহায্যে পরিকল্পনার রূপায়ণ ঘটায়। এগুলি হল **মানবিক উপাদান** ও **অমানবিক উপাদান**। এদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে সংগঠন গড়ে তোলা হয়। আর এই সংগঠনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন হয় ও পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ ঘটে। অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানের কাজের সাফল্য নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানে সংগঠনের কার্যকারিতার ওপর।

ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন আর মানবদেহ হল সংগঠনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধারণভাবে শরীর অত্যন্ত জটিল কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী ও অভিযোজনশীল (adaptive)। মানবশরীরে যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটিই একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন করে। যেমন—হাত দিয়ে কাজ করা হয়, খাবার তৈরি করা হয়, পাকস্থলী খাবার হজম করে, পা দিয়ে চলাফেরা করা হয়, চোখ দেখে, কান শোনে, নাক শ্বাস-প্রশ্বাস চালায় ইত্যাদি। আর এদের উপরে থাকে মানুষের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র। এরাই বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা রচনা করে, বিভিন্ন অঙ্গকে নির্দেশ পাঠায় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। এদের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক সমন্বয়ও দেখা

যায়। যেমন—হাত ও পা যখন কাজ করে তখন ফুসফুস আরো দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চালায় এবং হৃৎপিণ্ড বেশী পরিমাণ রক্ত বের করে দেয়। অনুরূপভাবে যখন খাবার খাওয়া হয়, তখন দাঁত খাবারকে চিবিয়ে সহজপাচ্য করে তোলে, বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড থেকে পাচক রস বের হতে শুরু হয়। আর মানব শরীরে এই কাজগুলি সংগঠিতভাবে বা ঠিক ঠিক ভাবে সম্পন্ন হয় বলেই একজন মানুষ সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে। এদের মধ্যে সমন্বয় বা সংগঠনের অভাব ঘটলেই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ মানুষ আর কর্মক্ষম থাকে না। প্রতিষ্ঠানের সাথে মানবশরীরের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য দেখা যায় তা হল প্রতিষ্ঠান একটি কৃত্রিম ব্যক্তি আর মানুষ হল স্বাভাবিক ব্যক্তি। সেজন্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সংগঠন গড়ে তোলা অপরিহার্য।

## ৪.৩.১ সংগঠন—সংজ্ঞা

ব্যবস্থাপনার প্রামাণ্য পুস্তকে 'সংগঠন' শব্দটির বহু সংজ্ঞা পাওয়া যায়। এমনকি সনাতন অর্থনীতিবিদরা 'সংগঠন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তাকে **উৎপাদনের উপাদান** হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীরাও দলীয় কাজের ক্ষেত্রে সংগঠন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 'সংগঠন' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবস্থাপনার বিশেষজ্ঞরা সংগঠনের যেসব সংজ্ঞা দিয়েছেন তাদের মূলতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি সংজ্ঞায় **কাঠামোগত** (Structural) অর্থাৎ সংগঠনের কাঠামোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যগুলি সংগঠনের **আচরণগত** (Behavioural) দিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

কাঠামোগত সংজ্ঞার প্রবক্তা হলেন **ম্যাসি** (Massie)। তাঁর মতে 'সংগঠন হল একটি কাঠামো বা পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে কর্মীরা কাজের দায়িত্ব পায়, নিজেদের মধ্যে একটি সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পারস্পরিক কাজগুলিকে একসূত্রে আবদ্ধ করে'।

অন্যদিকে **এলটন মায়োর** (Elton Mayo) মত আচরণবাদীরা বলেছেন—সংগঠন হল আচরণমূলক ব্যবস্থা যার মধ্যে স্বতন্ত্র কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত চারটি উপব্যবস্থা বর্তমান থাকে। এগুলি হল—

(i) বিধিসম্মত সংগঠনের দাবী-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত আচরণ;

(ii) নিয়মবহির্ভূত বা ঘরোয়া আচরণ;

(iii) খামখেয়ালী আচরণ; ও

(iv) সামগ্রিক আচরণ।

অর্থাৎ সংগঠন হল সুসংবদ্ধ, ফলপ্রসূ ও কার্যকর সামাজিক ব্যবস্থা। তবে ব্যবস্থাপকদের মতে 'সংগঠন হল ভূমিকা ও পদমর্যাদার নিয়মানুগ কাঠামো।'

নীচে কয়েকজন ব্যবস্থাপনাবিদ প্রদত্ত সংগঠনের সংজ্ঞা তুলে ধরা হল :

**চেষ্টার বার্নার্ড (Chester I. Barnard) :** 'সংগঠন হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সহযোগিতামূলক কাজের পদ্ধতি' (a system of co-operative activities of two or more persons)।

**নর্থকট্ (C.H. North Cott) :** 'প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যাতে তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনে কার্যকরভাবে নিয়োগ করতে পারে তার জন্য কাজের দায়িত্ব বণ্টনের ব্যবস্থাই হল সংগঠন।'

**হ্যানি (Haney) :** 'কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অংশগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় গড়ে তোলাকে সংগঠন বলে' (Organisation is a harmonious adjustment of specialised parts for the accomplishment of some common purpose or purposes)।

**ডেভিস (R.C. Davis) :** 'ছোট বা বড় যে কোন ধরনের কর্মী গোষ্ঠী যারা কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কার্যনির্বাহী নেতৃত্বের নির্দেশে সহযোগিতা করে তাকেই বলে সংগঠন'।

উপরের সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত যেসব উপাদান পাওয়া যায় সেগুলি হল—

(1) দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিয়ে সংগঠন গড়ে ওঠে;

(2) সংগঠন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব ভাগ করে দেয়;

(3) কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করে যাতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যায়; এবং

(4) পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণের ব্যবস্থা।

কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় গড়ে তুলতে সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## 8.8 সংগঠনের নীতিসমূহ

প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করতে ও ভাল কাজ পেতে ব্যবস্থাপনাবিদ্‌রা বারে বারে কতকগুলি নীতি ও নিয়ম প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে **আরউইক** (Urwick)-এর নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। তিনি 1938 সালে সংগঠনের **আটটি** সুসংহত নীতির সুপারিশ করেছিলেন এবং 1952 সালে এর সাথে আরো দুটি নীতি অনুসরণ করার সুপারিশ করেছিলেন। **আরউইক** নির্দেশিত এই নীতিগুলিই সংগঠন গড়ে তোলার সময় অনুসরণ করা হয় এবং সংগঠনের নীতি বলে গণ্য হয়। এই দশটি নীতি নীচে তুলে ধরা হল :

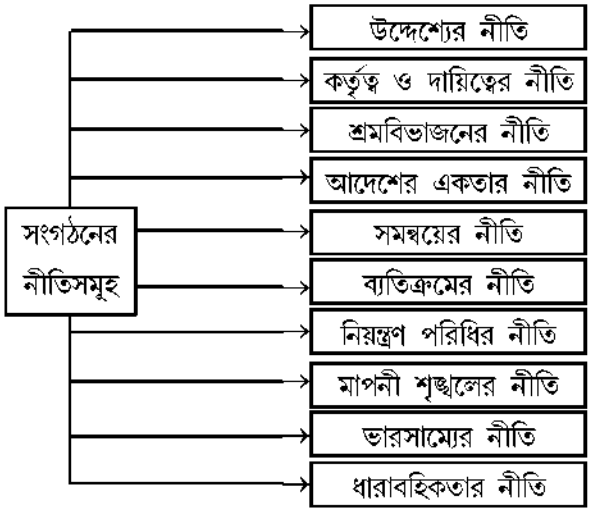


**(1) উদ্দেশ্যের নীতি (Principle of objective) :** প্রত্যেক সংগঠন এবং তার অংশবিশেষ অবশ্যই ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করবে। এই নীতি অনুসারে সংগঠনের উদ্দেশ্য অবশ্যই সকল কর্মীর কাছে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হবে। উদ্দেশ্য থেকেই সংগঠন তার লক্ষ্য ও অভিমুখ ঠিক করে।

**(2) কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের নীতি (Principle of authority and responsibility) :** সংগঠনে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের অবস্থান অনেকটা একই মুদ্রার এ-পিঠ ও-পিঠ। অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পাশাপাশি অবস্থান করে এবং একে অপরের পরিপূরক। একজন কর্মীকে কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলে সাথে সাথে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব বা ক্ষমতাও দিতে হয়। আবার উল্টোদিক থেকে বলা হলে, যখন কোন কর্মী অন্যের উপর কর্তৃত্ব করার

অধিকার পায় তখন ঐ কর্মীকে দায়িত্বও পালন করতে হয়। তবে দায়িত্ব হল চরম (absolute) কারণ দায়িত্ব অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হওয়া যায় না। সংগঠনকে কার্যকরী ও দক্ষ করে তুলতে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে অবশ্যই ভারসাম্য আনতে হবে।

**(3) শ্রমবিভাজনের নীতি (Principle of division of labour) :** শ্রম বিভাজনের নীতি বলতে বোঝায় প্রতিষ্ঠানের কাজগুলিকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে একজন কর্মী কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট কাজের সাথেই যুক্ত থাকে। এর ফলে কর্মীর মধ্যে বিশেষায়ণ (specialisation) গড়ে ওঠে এবং কম সময়ে, কম প্রচেষ্টায় ও সঠিক ব্যয়ে কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ শ্রমবিভাজন নীতির ফলে কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কারণ তারা যতটা সম্ভব একটিমাত্র কাজেই যুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ একটি জুতা তৈরির কারখানায় কিছু কর্মী চামড়া কাটে, কিছু কর্মী সেলাই করে, কিছু কর্মী আঠা লাগায়, আবার কিছু কর্মী শেষ পর্যায়ের কাজ করে। সাধারণতঃ যারা চামড়া সেলাই করে তারা আঠা লাগায় না বা চামড়া কাটে না। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কর্মীকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। অবশ্য অত্যধিক শ্রমবিভাজন কাজকে সংকীর্ণ করে তোলে ও কর্মীদের মধ্যে একঘেঁয়েমি সৃষ্টি করে।

**(4) আদেশের একতার নীতি (Principle of Unity of command) :** এই নীতি অনুসারে একজন কর্মীর কেবলমাত্র একটিই কর্তৃত্বের উৎস থাকবে। কারণ কোন কর্মীই একসাথে একাধিক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ ভালভাবে পালন করতে পারে না। কারণ এরূপক্ষেত্রে তার আনুগত্য ভাগ হয়ে যায় এবং ভুল বোঝাবুঝি ও বিরোধের সৃষ্টি হয়। সেজন্য একজন কর্মচারী কেবলমাত্র একজন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশ পাবে এবং তার কাছেই জবাবদিহি করবে।

**(5) সমন্বয়ের নীতি (Principle of co-ordination) :** এই নীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মী যে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। বিভিন্ন কাজের মধ্যে এমন সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য সহজেই সফল হয়। সেজন্য একই ধরনের কাজগুলিকে নিয়ে এক একটি বিভাগ বা উপবিভাগ গড়ে তোলা হয়। বস্তুতঃ এই নীতির মূল কথা হল কর্মী ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার উপরই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে।

**(6) ব্যতিক্রমের নীতি (Principle of exception) :** এই নীতি অনুসারে ব্যতিক্রমী কাজগুলিই কেবলমাত্র উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের গোচরে আনতে হবে। সাধারণ দৈনন্দিন কাজগুলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাধারণ কর্মীরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অর্থাৎ সাধারণ কর্মীরা যেসব কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় কেবলমাত্র সেগুলিই উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের গোচরে আনতে হবে। তাই একে **ব্যতিক্রমী ব্যবস্থাপনাও** (management by exceptions) বলা হয়। এর ফলে উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকরা কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে পারেন এবং তাদের কাজের বোঝা অনেকটাই হালকা হয়। ব্যতিক্রমের নীতির মাধ্যমে কর্তৃত্বের ভারার্পণ বাস্তবে অধিক কার্যকরী হয়।

**(7) নিয়ন্ত্রণ পরিধির নীতি (Principle of span of control) :** নিয়ন্ত্রণের পরিধি বা ব্যবস্থাপনার পরিধির অর্থ হল একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে কতজন কর্মী কাজ করবে। অর্থাৎ একজন ব্যবস্থাপক তার অধীনে কতজন কর্মীকে নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব পালন করবে। একজন ব্যবস্থাপক কতজন কর্মীকে

নির্দেশ দেবে ও নিয়ন্ত্রণ করবে তার সীমা এই নীতি নির্দেশ করে। অবশ্য একথাও বলা হয় যে এ সম্পর্কিত কোন আদর্শ সীমা নেই এবং পরিস্থিতি অনুসারে এই সীমা প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয়। এই নীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তি নির্ভর করে ব্যবস্থাপকের যোগ্যতা ও ক্ষমতা, কর্মীদের কর্মদক্ষতা ও কাজের প্রকৃতির ওপর।

**(8) মাপনী শৃঙ্খলের নীতি (Principle of scalar chain) :** মাপনী শৃঙ্খল বা আদেশের শিকল বলতে সেই পদ্ধতিকে বোঝায় যে পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত যে অবিচ্ছেদ্য কর্তৃত্বরেখা (line of authority) বজায় থাকে। সংগঠনের এই শিকল থেকেই একজন কর্মী বুঝতে পারে কার কাছ থেকে সে নির্দেশ, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পাবে এবং কার কাছে সে তার কাজের জবাবদিহি করবে। এই শিকলই হল প্রতিষ্ঠানের সমস্ত রকম জ্ঞাতকরণের পথ। অর্থাৎ এই পথ ধরেই ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত সমস্ত রকমের যোগাযোগ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

**(9) ভারসাম্যের নীতি (Principle of balance) :** প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন বিভাগের ও বিভিন্ন কাজের অবদান সমান নয়, বিভিন্ন। সুতরাং প্রতিটি বিভাগের কাজের অবদান অনুসারে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এছাড়াও এই নীতি প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে কেন্দ্রীকরণ (Centralisation) ও বিকেন্দ্রীকরণের (Decentralisation) মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার সুপারিশ করে।

**(10) ধারাবাহিকতার নীতি (Principle of continuity) :** সংগঠন গড়ে তোলা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সেজন্য প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও কার্যকরী করার জন্য নিয়মিতভাবে পরীক্ষা ও পরিমার্জনের প্রয়োজন হয়। সাংগঠনিক কাঠামো এমন হবে যাতে প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটে।

(i) যে সব বিভাগ কার্যভিত্তিক বিভাগকে (Functional department) সাহায্য ও সহযোগিতা করে।

(ii) উচ্চস্তরে ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদনের যথেষ্ট ব্যবস্থা।

(iii) যে কাঠামোগত বিন্যাসের ফলে সাংগঠনিক কাঠামো সরল, সহজবোধ্য, নমনীয় ও দক্ষ হয়ে ওঠে।

এগুলি ছাড়াও একটি সংগঠন কাঠামো গড়ে তোলার সময় যে বিষয়গুলির উপরও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয় সেগুলি হল :

(i) **মনুষ্যশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার :** অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীদের সদ্ব্যবহারের বিষয়টির উপর অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। ভাল সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের যেমন অসলভাবে সময় কাটানোর সুযোগ দেয় না, তেমনি তাদের উপর অত্যধিক কাজের চাপও দেয় না।

(ii) সাংগঠনিক কাঠামো এমন হবে যাতে কাঠামোর অন্তর্গত বিভিন্ন স্তরের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়।

(iii) সংগঠন কাঠামোর মাধ্যমে জ্ঞাতকরণ, নির্দেশনা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ যেন ফলপ্রসূ হয়, সুতরাং সংগঠন কাঠামো এমন হবে যাতে এই চারটি বিষয় সহজেই প্রয়োগ করা যায়।

(iv) সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে যেন অবশ্যই বিভাগীয়, উপবিভাগীয় ও দলীয় সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।

(v) ভবিষ্যতে সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে ন্যূনতম পরিবর্তন করেই যাতে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

## ৪.৫ সংগঠনের ধরন

যে কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে সংগঠন গড়ে তোলা হয় তাকেই সংগঠন কাঠামো বলা হয়। মানব সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। কোন প্রতিষ্ঠান ছোট, কোন প্রতিষ্ঠান মাঝারি, আবার কোন প্রতিষ্ঠান বড়। কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা উৎপাদনের সাথে যুক্ত, আবার কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কাজে যুক্ত, কোন প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন, কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সেবা প্রদান। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের আকার বা আয়তন, কাজের ধারা, কাজের পরিধি ও চরিত্র অনুযায়ী সংগঠনের ধরনও বিভিন্ন হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সংগঠন দু'ধরনের হতে পারে—**আবদ্ধ** (closed) ও **মুক্ত** (open)। যে সংগঠন কাঠামোয় বিভাগীয় ও কার্যনির্বাহী বিভাগীয় ও কার্যনির্বাহী ব্যবস্থাপকগণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন অর্থাৎ তাঁরা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি ও প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে যেতে পারেন না, তাকে **আবদ্ধ সংগঠন** বলে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক কর্মচারী সম্পর্ক নিয়মতান্ত্রিক পথ ধরে চালিত হয়। এরূপ সংগঠনে পরিবর্তন আনা খুব সহজ নয়। অন্যদিকে যে ধরনের সংগঠনে পরিবর্তনের পদ্ধতি অঙ্গীভূত থাকে অর্থাৎ বাহ্যিক পরিবেশে পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটে তাকে **মুক্ত সংগঠন** বলে। এই ধরনের সংগঠন কার্যভিত্তিক, গতিশীল ও দক্ষ হয়। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যবস্থাপকরা যতটুকু আলোচনা করা প্রয়োজন, ততটুকুই আলোচনা করে, তার বেশী নয়। প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মানার ক্ষেত্রে তারা অনেকটাই স্বাধীনতা ভোগ করে।

আবার সম্পর্কের ভিত্তিতে সংগঠনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলি হল—**(1) নিয়মানুগ সংগঠন** বা **রীতিবদ্ধ সংগঠন** (Formal Organisation) ও **(2) ঘরোয়া সংগঠন** (Informal Organisation)।

**(1) নিয়মানুগ সংগঠন** বা **রীতিবদ্ধ সংগঠন (Formal Organisation) :** যে সাংগঠনিক কাঠামোয় প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট থাকে তাকে নিয়মানুগ সংগঠন বলে। এরূপ সংগঠন নিয়মানুগ সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্বের সম্পর্ক ব্যবস্থাপকরা ঠিক করে দেন। **স্কট** (Scott) বলেছেন—"কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অধীনে একদল লোক যখন সাধারণ উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে কাজ করে তখন তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় আনার পদ্ধতিকে বলে **নিয়মানুগ সংগঠন**"।

● **নিয়মানুগ সংগঠনে বৈশিষ্ট্য (Features of formal organisation) :**

এরূপ সংগঠনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এরূপ সংগঠন গড়ে তোলে।

(ii) এরূপ সংগঠন **বিশেষায়ন** বা শ্রমবিভাজনের ওপর গড়ে উঠে।

(iii) এরূপ সংগঠনে প্রত্যেক কর্মীর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব **সুনির্দিষ্ট** থাকে।

(iv) **কর্তৃত্বের ভারাপর্ণের** মাধ্যমে এরূপ সংগঠন প্রসার লাভ করে।

(v) এরূপ সংগঠনের **লিখিত নিয়ম** ও **পদ্ধতি** থাকে।

(vi) **সংগঠন চিত্রের** মাধ্যমে এরূপ সংগঠনকে প্রকাশ করা যায়।

**(2) ঘরোয়া সংগঠন (Informal Organisation) :** প্রতিষ্ঠানে বিধিসম্মত বা নিয়মানুগ সংগঠন যেমন দেখা যায় তেমনি ঘরোয়া সংগঠনও দেখা যায়। ব্যবস্থাপকরা কর্তৃত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে বিধিসম্মত সংগঠন গড়ে তোলেন। অন্যদিকে কর্মীরা পারস্পরিক ও বন্ধুত্বের সম্পর্কের দ্বারা যখন সংগঠিত হয় তখন তাকে **ঘরোয়া সংগঠন** বা **বিধিবহির্ভূত সংগঠন** বলে। সাধারণভাবে প্রত্যেক কর্মীরই কিছু সামাজিক উদ্দেশ্য থাকে কারণ তারা সমাজবদ্ধ জীব। এই কর্মীরা যখন তাদের সামাজিক উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় তখন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে **ঘরোয়া সংগঠন** গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বিক্রয় বিভাগের যেসব কর্মী ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে উৎসাহী বা গান করতে ভালবাসে তারা তাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরস্পরের কাছাকাছি আসে ও তাদের মধ্যে একধরনের আত্মিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। আর এভাবেই ঘরোয়া সংগঠন গড়ে ওঠে। বস্তুতঃ ঘরোয়া সংগঠন হল নিয়মানুগ সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি। সেকারণে **ডেভিস** (Keith Davis) বলেছেন—"ঘরোয়া সংগঠন হল ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের বেড়াজাল, যা বিধিসম্মত সংগঠন দ্বারা গড়ে ওঠে না।"

● **ঘরোয়া সংগঠনের বৈশিষ্ট্য (Features of Informal Organisation) :**

একটি ঘরোয়া সংগঠনের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল :

(i) ঘরোয়া সংগঠন **অপরিকল্পিত** এবং এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে।

(ii) এর দ্বারা কর্মীদের **মানসিক** ও **সামাজিক সম্পর্কের** প্রতিফলন ঘটে।

(iii) এর **ভিত্তি** হল পছন্দ, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

(iv) ঘরোয়া সংগঠনে কর্মীদের যোগদান তাদের **ইচ্ছাধীন।**

(v) এর কোন **লিখিত নিয়ম-কানুন** থাকে না।

(vi) সংগঠন চিত্রের মাধ্যমে এরূপ সংগঠনকে প্রকাশ করা যায় না।

## ৪.৬ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের কার্যাবলী (Functions of different levels of Management)

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্য বিভিন্ন স্তরে সম্পাদিত হয়। ই. এফ. এল. ব্রিচ (E. F. L. Brech) ব্যবস্থাপনাকে নিম্নলিখিত স্তরে বিভক্ত করেছেন।

(ক) উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা

(খ) মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনা

(গ) নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ বা স্তরানুক্রম

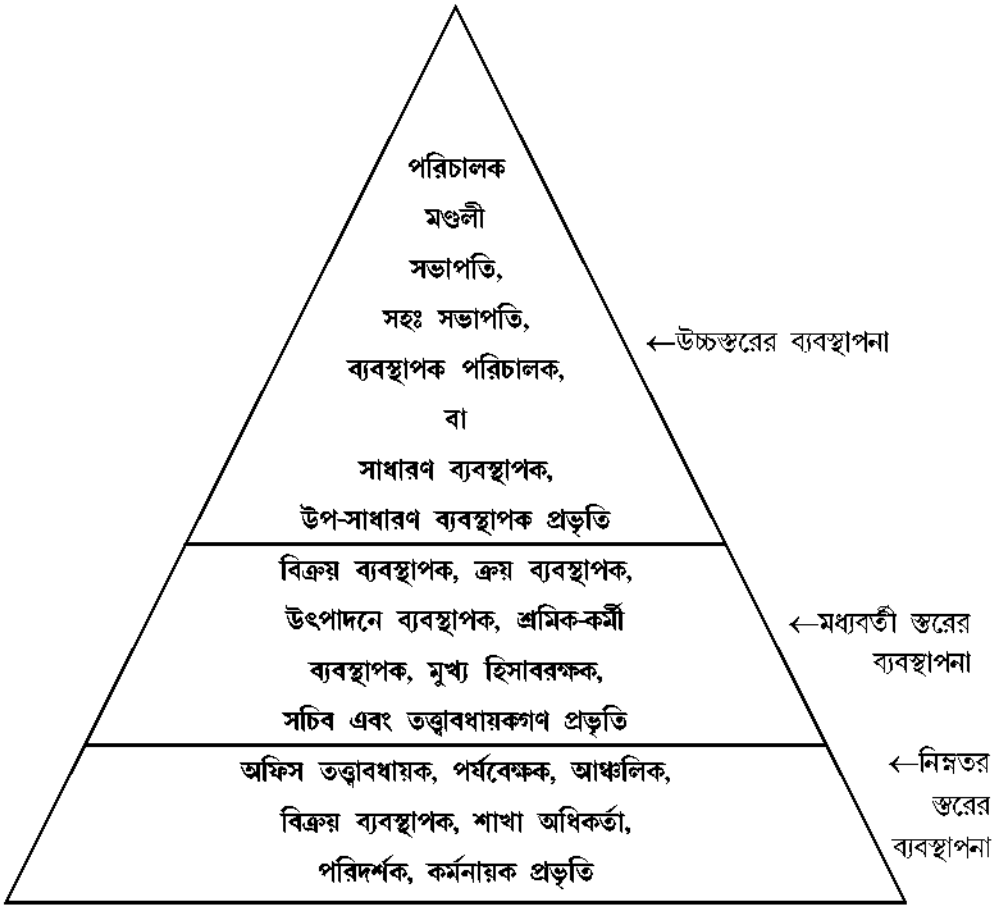


**উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা :**

ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরে পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors), সভাপতি (President), ব্যবস্থাপক পরিচালক (Managing Director) অথবা সাধারণ ব্যবস্থাপক (General Manager), উপ-সাধারণ ব্যবস্থাপক (Deputy General Manager) প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় ব্যবস্থাপকগণ থাকেন। পরিচালকমণ্ডলী মুখ্যত নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা। পরিচালকমণ্ডলীর গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দায়িত্ব মুখ্য কার্যনির্বাহীর (Chief Executive) উপর ন্যস্ত করা হয়। এই মুখ্য কার্যনির্বাহী 'ব্যবস্থাপক পরিচালিক' বা 'সাধারণ ব্যবস্থাপক' যে কেউ হতে পারেন। মুখ্য কার্যনির্বাহীকে পরিচালকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হয়। তিনি পরিচালকমণ্ডলী ও মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। পরিচালকমণ্ডলীর গৃহীত সিদ্ধান্তকে তিনি ব্যবস্থাপক কর্মীগণকে জ্ঞাত করান। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতি পরিচালকমণ্ডলীর নিকট পেশ করার দায়িত্ব পালন করেন। পরিচালকমণ্ডলীর গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা

হয় এবং প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। তবে সাহায্য করার জন্য কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানে উপ-সাধারণ ব্যবস্থাপক বা সহ সভাপতি (Vice-President) নিয়োগ করা হয়।

**কার্যাবলি :**

উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ :

(১) কারবারি প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৌলিক নীতি ও ব্যবসায়িক কৌশল (Business Strategy) স্থিরীকরণ এবং কর্মসূচী প্রণয়ন।

(২) কারবারের সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুতকরণ।

(৩) স্বল্পকালীন কর্মসূচী ও প্রতিষ্ঠানের বাজেট অনুমোদন।

(৪) প্রতিষ্ঠানের গৃহীত নীতি অনুসারে কর্মচারী নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন এবং অনুপ্রাণিত করণ।

(৫) বিভাগীয় পরিকল্পনা গঠনে নেতৃত্ব প্রদান ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে কার্যভার বণ্টন।

(৬) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দান এবং যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় বণ্টন।

(৭) বিভাগীয় ও উপবিভাগীয় ব্যবস্থাপকদের নিয়োগ এবং তাদের ও বিভাগের কার্যের মূল্যায়ন।

(৮) প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(৯) প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বণ্টন বিষয়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন।

(১০) বিভিন্ন আইনানুগ কার্যকলাপ, যেমন বিররণ পত্র (propectus) প্রকাশ, শেয়ার বণ্টন, শেয়ারে তলবী অর্থ আদায়, শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ ও বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনঃবণ্টন, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার সভা আহ্বান, তৃতীয় পক্ষের সহিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি করা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন।

**মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনা :**

বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান যেমন বিক্রয়-ব্যবস্থাপক (Sales Manager), ক্রয়-ব্যবস্থাপক (Purchase Manager), উৎপাদন-ব্যবস্থাপক (Production Manager), শ্রমিক-কর্মী-ব্যবস্থাপক (Personnel Manager), মুখ্য হিসাবরক্ষক (Chief Accountant), সচিব (Secretary) এবং তত্ত্বাবধায়কদের (Superintendents) নিয়ে ব্যবস্থাপনার মধ্যবর্ত্তী স্তরটি গঠিত।

কার্যক্ষেত্রে মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপকদের গুরুত্ব অসীম। এরা প্রধানত উচ্চস্তরের এবং নিম্নস্তর স্তরের ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে সংযোগ সাধনের সেতু। এদের উপর উচ্চ এবং নিম্ন উভয় স্তর থেকেই চাপ আসে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য প্রধানত নির্ভর করে মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, কার্যকারিতা ও সংহতি সাধনের উপর।

**কার্যাবলি :**

মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ :

(১) প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, নীতি, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজ নিজ বিভাগের কর্মীগণকে অবহিতকরণ।

(২) উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের নীতি প্রণয়নে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে সাহায্যপ্রদান।

(৩) মুখ্য কার্যনির্বাহীর নিকট থেকে আদেশ গ্রহণ এবং তদানুসারে বিভাগীয় কর্মচারীগণকে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সম্পাদনে আদেশদান।

(৪) নিজস্ব বিভাগের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যসূচী গ্রহণ।

(৫) বিভাগীয় কার্যের তদারকিকরণ এবং বিভাগীয় কার্যের সহিত ব্যক্তি-কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন।

(৬) উচ্চ এবং নিম্ন উভয়স্তরের ব্যবস্থাপকদের কার্যের সমন্বয়সাধন।

(৭) বিভাগীয় কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণের নিকট প্রতিবেদন (Report) পেশ।

(৮) বিভাগীয় কর্মীদের অভাব-অভিযোগ উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের অবহিতকরণ এবং তাহা দূরীকরণের ব্যবস্থাগ্রহণ।

(৯) বিভাগীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচী রূপায়ণে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

(১০) বিভাগীয় কর্মীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ, অনুপ্রাণিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ।

**নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপনা :**

নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাপকগণ হলেন অফিস তত্ত্বাবধায়ক (Office Superintendent), পর্যবেক্ষক (Supervisor), আঞ্চলিক বিক্রয় ব্যবস্থাপক (Area Sales Manager), শাখা অধিকর্তা (Section-in-charge), পরিদর্শক (Inspector), কর্মনায়ক (Foreman) প্রভৃতি।

এরা কার্যকরী ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন। ব্যবস্থাপনার স্তরানুক্রমে সর্বাপেক্ষা নিম্নে অবস্থান করেন বলে এরা সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপকগণ মধ্যবর্তী স্তরের আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী সাধারণ কর্মীদের আদেশ প্রদান করেন। এই স্তরের ব্যবস্থাপনার কার্যকে অধিকতর ফলপ্রসূ করা বিশেষ প্রয়োজন কারণ এই স্তর সঠিকভাবে কর্মসম্পাদন না করলে সংগঠনের উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব নয়। নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপকগণকে যথেষ্ট কর্তৃত্ব, মর্যাদা, ক্রিয়াগত বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশন এবং উদ্দেশ্য স্থিরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দিয়ে এদের কাছ থেকে সর্বোত্তম কার্যকরী ব্যবস্থাপনা (Effective Management) লাভ সম্ভব হয়।

**কার্যাবলি :**

নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ :

(১) সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে মধ্যবর্তী-স্তরের যোগসূত্র স্থাপন।

(২) শ্রমিক-কর্মী, বিক্রয়-কর্মী ও অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীগণ দ্বারা কার্য সম্পাদন।

(৩) নিজ নিজ শাখার (section) পরিকল্পনা, কার্যসূচী ও কর্মপন্থা নির্ধারণ।

(৪) নিজ নিজ শাখার কর্মীদের কার্যের তদারকি এবং প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শদান।

(৫) শাখা কর্মীদের মতামত, সুপারিশ, কার্যের সুবিধা ও অসুবিধা, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপকদের নিকট উপস্থাপন।

(৬) কার্যের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের দিকে দৃষ্টি প্রদান করে তাদের অনুপ্রাণিতকরণ।

(৭) বিভিন্ন শাখা কর্মীগণের কার্যের সমন্বয়সাধন।

(৮) নিজ নিজ বিভাগের কর্মীদের কার্যের মূল্যায়ন করে তাদের কার্যের ত্রুটি সংশোধনে সাহায্যদান।

(৯) যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিকা শক্তি (Productivity) বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১০) নিজ নিজ শাখার অগ্রগতি সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের অবহিতকরণ।

## ৪.৭ কর্তৃত্ব অর্পণ বা ভার অর্পণ

বাস্তবে দেখা যায় যে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক তার উপর ন্যস্ত সমস্ত কাজ করতে সক্ষম হয় না। সেজন্য ব্যবস্থাপক তার অধঃস্তন কর্মীদের সাথে তার কাজ ও সাথে সাথে কর্তৃত্ব ভাগ করে নেয়। অধঃস্তন কর্মীদের সাথে কাজ ও কর্তৃত্ব ভাগ করে নেওয়ার এই প্রক্রিয়াকেই ব্যবস্থাপনায় **কর্তৃত্ব অর্পণ** বা **ভার অর্পণ** বলা হয়। কোন প্রতিষ্ঠানেরই ব্যবস্থাপনামূলক কাজ কর্তৃত্ব অর্পণ ছাড়া সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বস্তুতঃ 'কর্তৃত্ব' ও 'অর্পণ' এই দুটি শব্দ নিয়ে ভারার্পণ শব্দটি গড়ে উঠেছে। সুতরাং বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে হলে এই দুটি শব্দ সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

● **কতৃত্ব কি? (What is authority?) :**

কর্তৃত্ব শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কর্তৃত্ব বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তির ইচ্ছার প্রয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নির্দেশ দেওয়া, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ব্যবহার করা বা কর্মীদের আদেশ করার অধিকার বা ক্ষমতা। এটি হল একজন কর্মী যাতে তার কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে সেজন্য যে পরিমাণ অধিকার ও ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয় তার যোগফল।

**কুনজ্** এবং **ও' ডোনেল** (Koontz and O'Donell)-এর মতানুসারে কর্তৃত্ব হল আইনানুগ ও অধিকারগত ক্ষমতা, আদেশ দানের ক্ষমতা বা কিছু করার ক্ষমতা। 'কর্তৃত্ব হল সেই শক্তি যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কাউকে কিছু করা বা না করার আদেশ দিতে পারে'। আবার **হেনরী ফেয়ল** (H. Fayol) কর্তৃত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'কর্তৃত্ব হল আদেশ দানের অধিকার এবং বশ্যতা আদায় করার ক্ষমতা'।

**উৎসের** উপর নির্ভর করে কর্তৃত্বকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল **আইনানুগ বা রীতিসম্মত কর্তৃত্ব** (Formal authority), **যোগ্যতাসূচক কর্তৃত্ব** (Competence authority) ও **স্বীকৃতিসূচক কর্তৃত্ব** (Acceptance authority)। আইনানুগ পদ্ধতিতে যে কর্তৃত্ব পাওয়া যায় তাকেই **রীতিসম্মত কর্তৃত্ব** বলে। উদাহরণস্বরূপ, শেয়ারহোল্ডাররা পরিচালক পর্ষদকে কোম্পানী পরিচালনার অধিকার দেয়। পরিচালন পর্ষদ আবার মুখ্য ব্যবস্থাপককে কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দিয়ে থাকে। সুতরাং মুখ্য ব্যবস্থাপক যে কর্তৃত্ব পেয়ে থাকে তা আইনানুগ ও কোম্পানীর রীতি অনুসারে। অন্যদিকে কোন ব্যক্তি যখন তার নিজের যোগ্যতাবলে কর্তৃত্ব করার অধিকার পায় তখন তাকে যোগ্যতাসূচক কর্তৃত্ব বলে। একে জ্ঞানের কর্তৃত্ব (Authority of knowledge)-ও বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ডাঃ দেবী শেঠিকে হার্ট সার্জারীর ক্ষেত্রে একজন 'অথরিটি' হিসাবে গণ্য করা হয়। এই বিষয়ে তিনি যে কর্তৃত্ব করেন তা হার্ট অপারেশনের ক্ষেত্রে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের

জন্য। আবার **স্বীকৃতিসূচক কর্তৃত্ব** একজন ব্যক্তি তখনই পায় যখন তার আদেশ ও নির্দেশ অন্যরা মান্য করে। সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির আদেশ তখনই মেনে চলা হয় যখন ঐ ব্যক্তির পুরস্কৃত করার বা শাস্তি দেওয়ার অধিকার থাকে। আবার অনেকসময় বিশ্বাস থেকেও এরূপ স্বীকৃতির উদ্ভব ঘটে।

## ৪.৭.১ ভারার্পণ কী (What is Delegation)

'ভারর্পণ' শব্দটি 'ভার' ও 'অর্পণ' এই দুটি শব্দের সন্ধি করে গড়ে উঠেছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভার শব্দের অর্থ ওজন। তবে বাস্তবক্ষেত্রে ভার বলতে কাজের বোঝা বা কাজের দায়িত্বকে বোঝায়। অন্যদিন অর্পণ শব্দটির অর্থ হল দেওয়া বা নিবেদন করা। সুতরাং এই দুটি শব্দের অর্থ থেকে ভারার্পণ বলতে বোঝায় কাজের বোঝা বা চাপ হাল্কা করার উদ্দেশ্যে কিছু অংশ (কোন কোন সময় সম্পূর্ণ অংশ) অপরকে ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া। তবে ভারার্পণ বলতে কেবলমাত্র দায়িত্বের অর্পণই বোঝায় না, সাথে সাথে কর্তৃত্বের অর্পণও বোঝায়। কারণ কর্তৃত্ব ছাড়া দায়িত্ব পালন করা যায় না। সুতরাং যে প্রক্রিয়ায় একজনের কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অন্যজনের কাছে যায় তাকেই বলে ভারার্পণ।

ভারার্পণ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোন প্রতিষ্ঠানেই ব্যবস্থাপকের একার পক্ষে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। সেজন্য বিভিন্ন কাজের মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি সে নিজে সম্পাদন করে ও বাকী কাজগুলি অধঃস্তন কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। এর ফলে ব্যবস্থাপকের পক্ষে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণের মত ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলি করার জন্য যথেষ্ট সময়, শ্রম ও মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। তবে কাজ ভাগ করে দিলেই ব্যবস্থাপকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। কারণ দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মীদের যে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার প্রয়োজন তাও ব্যবস্থাপককে অর্পণ করতে হয়। আর দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের মিলিত প্রভাবে কর্মী তার কাজ সম্পাদনের জন্য দায়বদ্ধ থাকে।

বস্তুতঃ ভারার্পণ কেবলমাত্র ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় না, প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ ঘটে। এমনকি পারিবারিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভারার্পণ খুব বেশী অনুসৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পরিবারের কর্তা তাঁর দায়িত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ তাঁর স্ত্রীকে, কিছু অংশ তাঁর বড় ছেলেকে দিয়ে থাকেন। কর্ত্রী আবার কিছু ক্ষমতা তাঁর বউমাকে দিয়ে দেন। সুতরাং এভাবে পারিবারিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং তার ভারার্পণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। অনুরূপভাবে, একটি কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডাররা পরিচালকমণ্ডলী তৈরি করে এবং তাদের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেয়। পরিচালকমণ্ডলী আবার একজনকে মুখ্য ব্যবস্থাপক হিসাবে নিয়োগ করে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব করার অধিকার ঐ মুখ্য ব্যবস্থাপককে হস্তান্তর করে। আর এই সমগ্র প্রক্রিয়াকেই বলে ভারার্পণ।

বস্তুতঃ ভারার্পণ হল প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর গুণগত মানের দিক। সাংগঠনিক দক্ষতা ও কার্যকারিতা ভারার্পণের মাধ্যমেই ফলপ্রসূ হয়। ভারার্পণ প্রক্রিয়া তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। এগুলি হল **কর্তব্য** বা **কাজ** (duty or task), **ক্ষমতা** বা **কর্তৃত্ব** (power or authority), **দায়** বা **জবাবদিহিকরণ** (obligation or accountability)। আবার ভারার্পণ বিভিন্ন ভাবে কার্যকর হতে পারে। ভারার্পণের এই ধরণগুলি হল— (1) সাধারণ বা নির্দিষ্ট, (2) লিখিত বা অলিখিত, (3) রীতিবদ্ধ বা ঘরোয়া, এবং (4) নিম্নগামী, ঊর্দ্ধগামী বা অনুভূমিক (lateral)।

## ৪.৭.২ কর্তৃত্বের ভারার্পণ (Delegation of Authority)

ছোট-বড় সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই একজন ব্যবস্থাপকের উপর যে পরিমাণ কাজের দায়িত্ব থাকে তা পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সমস্ত কাজই সম্পাদন করা প্রয়োজন। সেজন্য ব্যবস্থাপক তার কাজের মধ্যে যেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলি তার পক্ষে করা সম্ভব হবে না বলে মনে করে সেই কাজগুলি তার অধঃস্তন কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। আর এই কাজের দায়িত্ব অংশতঃ বণ্টন করার মধ্য দিয়েই 'কর্তৃত্বের ভারার্পণ'-এর সৃষ্টি হয়। কারণ অধঃস্তন কর্মী বা ব্যবস্থাপকদের কেবলমাত্র কাজের দায়িত্ব দিলেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় না। ঐ দায়িত্ব যাতে তারা সঠিকভাবে পালন করতে পারে সেজন্য তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বা কর্তৃত্বও দিতে হয়। এর দ্বারা অধঃস্তন কর্মী ও ব্যবস্থাপকরা ঐ কাজ সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকে। এভাবে প্রাপ্ত কাজের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তারা ব্যবস্থাপকের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। সুতরাং কর্তৃত্বের ভারার্পণ বলতে বোঝায় অধঃস্তনদের উপর কাজের ভার দেওয়া, কর্তৃত্ব দেওয়া ও দায়িত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া।

● **সংজ্ঞা (Definition) :** কর্তৃত্বের ভারার্পণ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোকে কার্যকর ও গতিশীল করে তোলে। এটি হল এমন এক প্রক্রিয়া যার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের মানবিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ফলপ্রসূ হয় এবং সংগঠনের মধ্যে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের প্রবাহ অবিরাম চলতে থাকে। কর্তৃত্বের ভারার্পণ সংক্রান্ত কতকগুলি জনপ্রিয় সংজ্ঞা নিচে তুলে ধরা হল :

**থিও হেম্যান (Theo Haimann) :** 'কর্তৃত্বের ভারার্পণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় নির্ধারিত সীমার মধ্যে অধঃস্তনরা যাতে কাজ করতে পারে তার জন্য কর্তৃত্ব অনুমোদন করা।'

**কুন্‌জ এবং ও'ডোনেল (Koontz and O'Donnel) :** 'কোন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যখন প্রতিষ্ঠানিক ইচ্ছাপূরণের দায়িত্ব কোন অধঃস্তনের উপর ন্যস্ত করেন তখন কর্তৃত্বের ভারার্পণ ঘটে।'

**ম্যাক্‌ফারল্যাণ্ড (D. E. McFarland) :** 'ভারার্পণ হল সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সেই অংশ যার দ্বারা একজন আধিকারিক কোম্পানীর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য করণীয় কাজকে অন্যের সাথে ভাগ করে নেয়। এর মধ্যে কর্তব্য, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে।'

**অ্যালেন (Louis A. Allen) :** 'ভারার্পণ হল অন্যদের সাহায্যে উদ্দেশ্যসাধনের প্রচেষ্টা। এটি হল ব্যবস্থাপনার গতিশীল ব্যবস্থা। এটি হল এমন এক প্রক্রিয়া যা একজন ব্যবস্থাপক তাঁর উপর ন্যস্ত কাজ অধঃস্তনদের মধ্যে বণ্টনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করে এবং কেবলমাত্র সেই কাজগুলিই সম্পাদন করে যেগুলি কেবলমাত্র তিনিই তাঁর পদমর্যাদার সুবাদে করতে পারে। আর বাকী কাজগুলি যাতে অন্যদের সহায়তায় করা সম্ভব হয় তার জন্য অধীনস্থদের অর্পণ করে।'

উপরের সংজ্ঞাগুলি থেকে কর্তৃত্বের ভারার্পণ সম্বন্ধে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হল ব্যবস্থাপকদের অতিরিক্ত কাজের অংশবিশেষ তাদের অধীনস্থ ব্যবস্থাপক বা কর্মীদের উপর অর্পণ করা ও কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব অনুমোদন করার প্রক্রিয়াই হল কর্তৃত্বের ভারার্পণ। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কার্যকরী ও গতিশীল হয়ে উঠে এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধন সহজ হয়।

## ৪.৭.৩ কর্তৃত্বের ভারার্পণ—বৈশিষ্ট্য (Delegation of Authority—Features)

কর্তৃত্বের ভারার্পণ সংক্রান্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় :

**(1) সংগঠনের অন্যতম উপাদান (Elements of organisation) :** কর্তৃত্বের ভার অর্পণ একটি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার অন্যতম উপাদান। ইহা সংগঠনকে প্রাণবন্ত, কার্যকরী ও গতিশীল করে তোলে। এর মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামোয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের প্রবাহ সৃষ্টি হয় এবং সাংগঠনিক উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়।

**(2) এটি একটি বণ্টন প্রক্রিয়া (An allocation process) :** ভারার্পণ হল একটি বণ্টন প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে অন্যদের সাথে কর্তৃত্ব ভাগ করে নেওয়া হয়। তবে বণ্টনকারী কখনই তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বণ্টন করতে পারে না কারণ তাহলে বণ্টনকারীর অস্তিত্বই লোপ পাওয়ার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই বণ্টনকারী সাধারণতঃ পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব নিজের কাছে রেখে দেয়।

**(3) ভারার্পণকারী কর্তৃত্বের সীমা স্থির করে দেয় (Delegator sets the limit of authority) :** ভারার্পণ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়। কর্তৃত্বের ভার অর্পণ করার সাথে সাথে ব্যবস্থাপক অধীনস্থ কর্মচারীর কর্তৃত্ব প্রয়োগের সীমাও নির্দিষ্ট করে দেয়। এই সীমার বাইরে কর্মচারী তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে না।

**(4) ভারার্পণ দায়িত্ব এড়ানো নয় (Delegation does not mean abdiction of responsibility) :** ভারার্পণের অর্থ এই নয় যে ভারার্পণকারী তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়। কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ভার অর্পণ করার পরও ব্যবস্থাপক কাজ সম্পাদনের জন্য সমান দায়বদ্ধ থাকে।

**(5) সাময়িক কর্তৃত্ব হ্রাস (Temporary reduction in authority) :** কর্তৃত্বের ভারার্পণের মাধ্যমে ভারার্পণকারী ব্যবস্থাপকের কর্তৃত্ব স্থায়ীভাবে হ্রাস পায় না। যেকোন সময় তিনি অর্পিত ক্ষমতা ফিরিয়ে নিতে পারেন। সুতরাং এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপকের কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে হ্রাস পায়।

**(6) কর্মবিভাজন এর ভিত্তি (Based on division of work) :** ভারার্পণ যে নীতির উপর গড়ে উঠে তা হল **কর্মবিভাজনের নীতি**। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। এর ফলে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা অর্জন করা সম্ভব হয়।

**(7) কর্তৃত্বহীনরা ভারার্পণ করতে পারেন না (Authority-less persons can not delegate) :** কোন ব্যক্তি তখনই কর্তৃত্বের ভারার্পণ করতে পারে যখন সে নিজে কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। অর্থাৎ ভারার্পণকারী কেবলমাত্র তার নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অংশ অপরকে অর্পণ করতে পারে। যে কাজের দায়িত্ব তার উপর নেই বা যে কর্তৃত্বের অধিকার তার থাকে না, তা অর্পণ করা যায় না।

**(8) পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া (Systematic process) :** ভারার্পণ একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। যখন উচ্চ ব্যবস্থাপনার স্তর থেকে নিম্ন ব্যবস্থাপনার স্তরে ভারার্পণ করা হয় তখন কর্তৃত্ব বিভিন্ন মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপকদের মাধ্যমে নিম্নস্তরে গমন করে।

## ৪.৭.৪ ভারার্পণের নীতিসমূহ (Principles of Delegation)

ভারার্পণের ক্ষেত্রে ভার অর্পণকারীকে কতকগুলি নীতি মেনে চলতে হয়। এই নীতিগুলি মেনে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের ভারার্পণ করলে উদ্দেশ্য সফল হয়। তবে সব নীতিগুলিই যে সবক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে তার

কোন মানে নেই। ভারার্পণকারীর পদমর্যাদা ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে এই নীতিগুলি মেনে চলতে হয়। নিচে ভারার্পণের নীতিগুলি তুলে ধরা হল ও সংক্ষেপে প্রতিটি নীতি আলোচনা করা হল :

**ভারার্পণের নীতিসমূহ**

- (1) দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সমতার নীতি
- (2) ন্যূনতম হস্তক্ষেপের নীতি
- (3) ভুল-ভ্রান্তির ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার নীতি
- (4) চরম দয়িত্বের নীতি
- (5) কার্যভিত্তিক সুস্পষ্টতার নীতি
- (6) কর্তৃত্বের স্তর নীতি
- (7) ব্যতিক্রমের নীতি
- (8) আদেশের একতার নীতি

**(1) দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সমতার নীতি (Principle of parity between responsibility and authority) :** এই নীতি অনুসারে ভারার্পণের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে অবশ্যই সমতা থাকবে। দায়িত্ব বেশী, কর্তৃত্ব কম বা দায়িত্ব কম কর্তৃত্ব বেশী এরূপ হওয়া চলবে না। কর্তৃত্ব সবসময় দায়িত্বের সমানুপাতিক হবে। অন্যথায় ভারার্পণের উদ্দেস্য সফল হয় না। এই নীতি তাই দাবী করে যে কোন অধঃস্তন কর্মচারীকে যকন কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন সেই দায়িত্ব পালনের জন্য যে পরিমাণ কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয় তা অবশ্যই তাকে দিতে হবে। অন্যথায় কর্তৃত্বের অভাবে তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না।

**(2) ন্যূনতম হস্তক্ষেপের নীতি (Principle of minimum interference) :** এই নীতি অনুসারে যখন কোন একজন ব্যবস্থাপক তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর উপর কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করেন তখন ঐ কর্মচারীকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভারার্পণকারীর উপর অহেতুক হস্তক্ষেপ যত কম হয় ততই ভাল। অর্থাৎ এই নীতি অনুসারে ভারার্পণকারী অবশ্যই সমস্ত বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখবেন কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী যদি তাঁর পরামর্শ, উপদেশ, সহযোগিতা ইত্যাদি চায় তাহলে অবশ্যই তিনি কর্মচারীকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন।

**(3) ভুল-ভ্রান্তির ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার নীতি (Principle of tolerance of mistakes) :** বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যায় যে অধঃস্তন কর্মীকে যে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল তা পালন করতে গিয়ে সে ভুল করছে। হয়তো সে এমন কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর। এরূপক্ষেত্রে ভারার্পণকারীকে অবশ্যই সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে। তার কাজ হবে ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা। তা না করে যদি তাকে তিরস্কার করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে ঐ কর্মচারী কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং ভারার্পণকারীর উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তবে এই নীতি একথা বলে না যে অধঃস্তন কর্মচারীরা যত খুশী ভুল-ভ্রান্তি করতে পারবে। বরঞ্চ এই নীতি বলে যে কাজের ক্ষেত্রে ছোট ছোট ভুল-ভ্রান্তিগুলি অগ্রাহ্য করতে হবে এবং গুরুতর ভুলভ্রান্তিগুলিকে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

**(4) চরম দায়িত্বের নীতি (Principle of absolute responsibility) :** এই নীতি অনুসারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রতি একজন অধঃস্তন কর্মচারীর দায়িত্ব চরম ও অবিমিশ্র। এই দায়িত্ব অর্পণ করা যায় না। কোন

ব্যক্তি তার কর্তৃত্ব অন্য কাউকে অর্পণ করলেও কাজ সম্পাদনের চূড়ান্ত দায়িত্ব তার উপরেই থাকে। অর্থাৎ এই নীতি অনুসারে মৌলিক দায়িত্ব অর্পণ করা যায় না বা দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায় না। তাই একজন ব্যবস্থাপক যখন কোন কর্মীকে কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তখনই তিনি বলতে পারেন না যে ঐ কাজ সম্পাদনের কোন দায়িত্ব তাঁর নেই, কারণ তিনি দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই নীতি অনুসারে ভারার্পণকারী তাঁর কাজের জন্য এবং তাঁর অধঃস্তন কর্মচারীদের কাজের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ী থাকেন।

**(5) কার্যভিত্তিক সুস্পষ্টতার নীতি (Principle of functional clarity) :** এই নীতি অনুসারে কর্তৃত্ব অর্পণের আগে অধঃস্তন কর্মচারীকে কাজের দায়িত্ব ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। কাজের ব্যাপারে কর্মচারীর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা যেন না থকে। যে কাজ করতে হবে সেই কাজের প্রকৃতি এবং তাৎপর্য, অন্যান্য কাজের সাথে সম্পর্ক এবং তার কর্তৃত্বের সীমা ইত্যাদি বিষয়গুলি যাতে সে খুব ভালভাবে বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করার পর ভারার্পণ করতে হবে।

**(6) কর্তৃত্ব স্তর নীতি (Authority level principle) :** এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক স্তরের কর্মীরা তাদের নিজ নিজ স্তরের সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং যেসব সিদ্ধান্ত নিজেদের স্তরে নেওয়া যায় না কেবলমাত্র সেগুলিই উর্দ্ধতান কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবে। যেসব কাজ তাদের কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত সেসব কাজ তারাই সম্পাদন করবে। কিন্তু যদি সব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই তারা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ চায় তাহলে ভারার্পণের কোন অর্থই থাকে না। অনুরূপভাবে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষও তাদের অধঃস্তনদের এক্তিয়ারভুক্ত কাজের ক্ষেত্রে অযথা হস্তক্ষেপ করবে না।

**(7) ব্যতিক্রমের নীতি (Principle of exception) :** এই নীতি অনুসারে ব্যবস্থাপক কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই তার কর্তৃত্বের ভারার্পণ করবে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপক অতিরিক্ত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ করে দেবে। অন্যদিকে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেগুলি নিজে সম্পাদনের জন্য রাখবে। উপরন্তু অধঃস্তন কর্মীদের কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে যদি ব্যতিক্রমী ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে তাহলেই তিনি হস্তক্ষেপ করবেন। অন্যথায় সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি অগ্রাহ্য করবেন। অর্থাৎ এই নীতিতে ব্যতিক্রমী অবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়।

**(8) আদেশের একতার নীতি (Principle of unity of command) :** এই নীতির মূল বক্তব্য হল একজন অধঃস্তন কর্মী কেবলমাত্র একজন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই আদেশ পাবে, একাধিক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নয়। একজন কর্মী একাধিক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অধীনে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না। কারণ একাধিক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করতে হলে কর্মী বিহ্বল হলে পড়ে এবং তার আনুগত্য বিভক্ত হয়ে যায়। সুতরাং এই দ্বৈত-অধীনতা পরিহার করা উচিৎ। তাই ভারার্পণের ক্ষেত্রেও আদেশের একতার নীতি মেনে চলা হয়।

## ৪.৮ ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তি বা পরিধি

### ৪.৮.১ অর্থ ও সংজ্ঞা

● **অর্থ (Meaning) :** 'ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তি বা পরিধি' (Span of management) বলতে বোঝায় একজন ব্যবস্থাপক তার ব্যবস্থাপনামূলক কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে সীমিত সংখ্যক অধঃস্তন কর্মচারীর কাজ

কার্যকরভাবে পরিদর্শন করতে সক্ষম। বস্তুতঃ ব্যবস্থাপনার পরিধি ধারণাটি এসেছে মানুষের সীমাবদ্ধতা থাকে। কারণ একজন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকে, যেমন—চিন্তা-ভাবনার সীমাবদ্ধতা, জ্ঞানমূলক ও অভিজ্ঞতামূলক সীমাবদ্ধতা, শ্রম বা প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতা, সময়ের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি। বলা যায় একজন মানুষ হিসাবে একজন ব্যবস্থাপকের দৈহিক বা শারীরিক, মানসিক ও মেধাজনিত সীমাবদ্ধতা থাকে। এর উপর নির্ভর করে তার কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। আর একারণেই সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় পরস্পরযুক্ত পদ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার স্তর গড়ে ওঠে। ব্যবস্থাপনার কাজ এই পরস্পরযুক্ত প্রশাসনিক স্তরের মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

ব্যবস্থাপনার প্রামাণ্য পুস্তকে **'ব্যবস্থাপনার পরিধি'** (span of management) কথাটি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ একে **'কর্তৃত্বের পরিধি'** (span of authority) বলে আখ্যা দেন, কেউ আবার **'পরিদর্শনের পরিধি'** (span of supvervision) বা **'দায়িত্বের পরিধি'** (span of responsibility) হিসাবেও অভিহিত করেন। তবে এদের মধ্যে **'নিয়ন্ত্রণের পরিধি'** কথাটির ব্যবহার সবচেয়ে বেশী দেখা যায়, যদিও **'ব্যবস্থাপনার পরিধি'** কথাটি অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ। **পি. এফ. ড্রাকার** (P.F. Drucker) একে **'ব্যবস্থাপনামূলক সম্পর্কের পরিধি'** (span of managerial relationships) হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে সম্পর্কের পরিধি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোয় একজন ব্যবস্থাপকের স্থান, কাজের প্রকৃতি, কর্তৃত্বের সীমার মধ্যে কাজ সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়গুলি এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

● **সংজ্ঞা (Definition) :** ব্যবস্থাপনার পরিধির যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তা হল—'এটি সংগঠন কাঠামোর অনুভূমিক দিকের সাথে যুক্ত এবং একজন ব্যবস্থাপক যতজন অধঃস্তন কর্মীকে কার্যকরভাবে পরিদর্শন করতে ও নির্দেশ দিতে সমর্থ হন সেই সংখ্যাকে বোঝায়'। ব্যবস্থাপনার **সনাতন মতবাদ গোষ্ঠী** (classical school) ব্যবস্থাপনার পরিধিকে অত্যন্ত সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ব্যবস্থাপনার পরিধি বলতে বোঝায় 'যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অধঃস্তন কর্মচারীকে একজন ব্যবস্থাপক কার্যকরভাবে পরিদর্শন করতে পারে' (the specific number of subordinates that a manager can supervise effectively)।

সংগঠন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কতকগুলি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত পদের সৃষ্টি করে ও সেগুলিকে নিয়ে সাংগঠনিক স্তর বা ব্যবস্থাপনার স্তর গড়ে তোলে। যেহেতু মানুষের যোগ্যতা ও ক্ষমতা সীমিত তাই প্রতিষ্ঠানে স্তরভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে স্তরভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠে কারণ ব্যবস্থাপকদের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের অতিরিক্ত কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। আর এর থেকেই অধঃস্তন কর্মীদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই অধঃস্তন কর্মীরা ব্যবস্থাপকের অতিরিক্ত কাজের অংশ ভাগ করে নেয় ও ব্যবস্থাপকের সমস্যার সমাধান করে। আবার একজন ব্যবস্থাপক কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক অধঃস্তন কর্মীকে পরিচালনা করতে পারেন। এর ফলেও ব্যবস্থাপনা স্তরের উদ্ভব হয়। তাই বলা হয় যে ব্যবস্থাপনার স্তর সবসময় প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক স্তরক্রমের সাথে যুক্ত।

নিচে রেখা চিত্রের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের আন্তঃসম্পর্ক যুক্ত সাংগঠনিক স্তর তুলে ধরা হল :

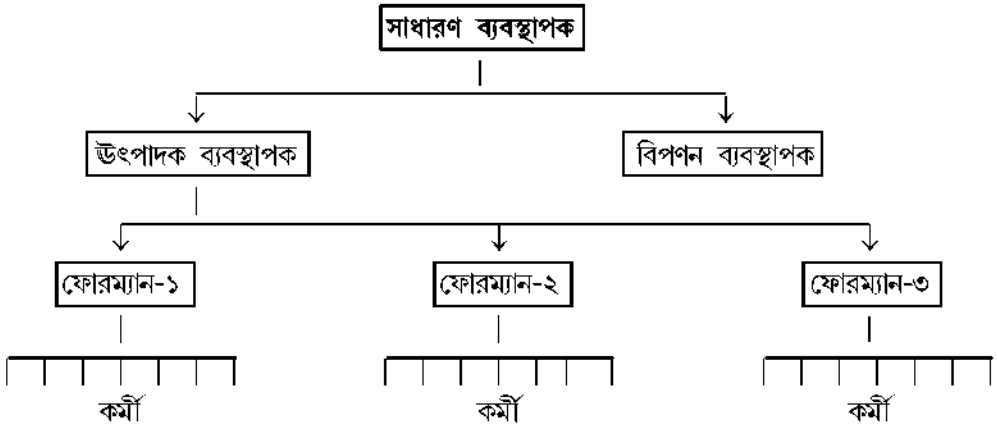


ব্যবস্থাপনার পরিধি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক স্তরের সাথে যেমন যুক্ত তেমনি সংগঠন কাঠামোর ধরনের সাথেও যুক্ত। ব্যবস্থাপনার পরিধি যখন **বিস্তৃত** হয় (wider span), তখন ব্যবস্থাপনার **স্তরসংখ্যা** (levels) কম হয়। অন্যদিকে ব্যবস্থাপনার পরিধি যখন সংকীর্ণ হয় (narrow span) তখন ব্যবস্থাপনার স্তরসংখ্যা (levels) বেড়ে যায়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার পরিধি ও স্তরের মধ্যে সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। আবার ব্যবস্থাপনার বিস্তৃত পরিধি যখন কম সংখ্যাক স্তর নিয়ে গড়ে উঠে তখন সংগঠন কাঠামো চ্যাপ্টা আকৃতির (flat type) হয়। অন্যদিকে যখন ব্যবস্থাপনার সংকীর্ণ পরিধি বেশী সংখ্যাক স্তর নিয়ে গড়ে উঠে তখন সংগঠন কাঠামো লম্বা আকৃতির (tall type) হয়।

## ৪.৮.২ ব্যবস্থাপনার পরিধির ধরন (Types of Span of Management)

ব্যবস্থাপনার পরিধি সংক্রান্ত আলোচনায় প্রাথমিকভাবে দু'ধরনের ব্যবস্থাপনার পরিধির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম ধরনের ব্যবস্থাপনার পরিধি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। তাই একে কাঠামোগত বা আকারগত ধরন বলা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিধির দ্বিতীয় ধরনটি স্তরভিত্তিক ধারনার উপর গড়ে উঠেছে। তাই একে কার্যভিত্তিক ধরন বলা হয়। নিচের রেখাচিত্রে এদের তুলা ধরা হল :

## ৪.৮.৩ ব্যবস্থাপনার পরিধি নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ বা উপাদানসমূহ (Elements of Determinant Factors of Span of Management)

ব্যবস্থাপনার পরিধি প্রকৃতপক্ষে একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলিকে প্রাথমিকভাবে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। নিচে প্রধান বিষয়গুলি ও তাদের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়গুলি তুলে ধরা হল ও সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

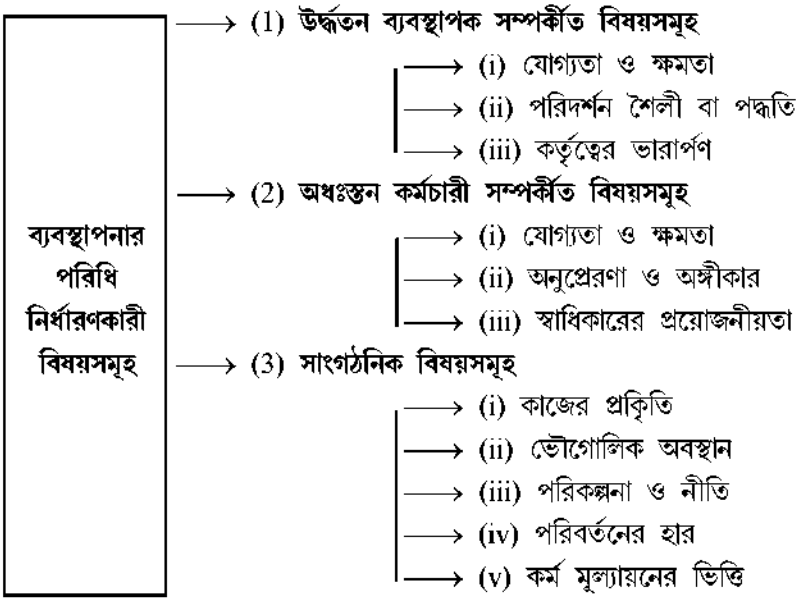


**(1) উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক সম্পর্কীত বিষয়সমূহ (Superior related factors) :** একজন ব্যবস্থাপক কতজন কর্মচারীকে তত্ত্বাবধান করতে পারবে তা নির্ভর করে ঐ ব্যবস্থাপকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর। এদের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ হল—

**(i) যোগ্যতা ও ক্ষমতা (Competence and ability) :** একজন ব্যবস্থাপক তার অধীনে কতজন কর্মীকে তত্ত্বাবধান করতে সমর্থ তা নির্ভর করে ব্যবস্থাপকের যোগ্যতা ও ক্ষমতার উপর। যদি ব্যবস্থাপক সমস্যাকে সহজেই চিহ্নিত করতে পারেন, দ্রুত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কখন কাজের গভীরে যাবেন এবং কখন কৌশল অবলম্বন করবেন তা স্থির করতে পারেন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারেন তাহলে তিনি বেশী সংখ্যক অধঃস্তন কর্মচারীকে সহজেই এবং ভালভাবে পরিচালনা করতে সমর্থ হবেন। এরূপক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার পরিধি বড় ও বিস্তৃত হবে। অন্যথায় ব্যবস্থাপনা পরিধি সংকীর্ণ হবে।

**(ii) পরিদর্শন পদ্ধতি বা পরিদর্শন শৈলী (Supervisory style) :** যদি ব্যবস্থাপক খুব নিকট থেকে পরিদর্শনের কাজ করেন তাহলে তিনি কম সংখ্যক কর্মীর কাজ পরিদর্শন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার পরিধি ছোট হবে। অন্যদিকে তিনি যদি কর্মচারীদের কাজ ও তাদের দায়িত্বের বিষয়টি ভালভাবে বুঝিয়ে দেন এবং পরিদর্শনের ক্ষেত্রে "ব্যতিক্রমের নীতি" অনুসরণ করেন তাহলে তিনি বেশী সংখ্যক কর্মীর তত্ত্বাবধান করতে সমর্থ হবেন। ফলস্বরূপ, ব্যবস্থাপনার পরিধিও বড় হবে।

**(iii) কর্তৃত্বের ভারার্পণ (Delegationof authority) :** এই বিষয়টিও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কীত ও ব্যবস্থাপনার পরিধিকে প্রভাবিত করে। ব্যবস্থাপক যদি অধঃস্তন কর্মচারীদের উপযুক্ত পরিমাণে কর্তৃত্ব অর্পণ করে, কাজ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়, দায়িত্ব গ্রহণ করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে এবং উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হয় তাহলে তার পক্ষে বেশী সংখ্যক কর্মচারীর তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয়। ফলে ব্যবস্থাপনার পরিধিও বিস্তার লাভ করে।

**(2) অধঃস্তন কর্মচারী সম্পর্কীত বিষয়সমূহ (Subordinate related factors) :** একজন ব্যবস্থাপক কতজন কর্মচারীর তত্ত্বাবধান করতে পারবে তার অনেকটাই নির্ভর করে কর্মচারীদের গুণগত মানের উপর। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিধি নির্ধারণে ব্যবস্থাপক ও কর্মচারী উভয়েরই গুণগতমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। কর্মচারী সংক্রান্ত বিষয়গুলি হল—

**(i) যোগ্যতা ও ক্ষমতা (Competence and ability) :** অধঃস্তন কর্মচারীদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা ব্যবস্থাপনার পরিধি নির্ধারণে একটি প্রভাবশালী উপাদান হিসাবে গণ্য হয়। অধঃস্তন কর্মীরা যদি দায়িত্ব সচেতন হয় ও কাজ সম্পাদনে দক্ষ হয় তাহলে তাদের পরিদর্শকের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এর ফলে ব্যবস্থাপকের পরিদর্শন সংক্রান্ত সময় কম লাগে এবং বেশী সংখ্যক কর্মীকে পরিদর্শন করা ও পরিচালনা করা সম্ভব হয়। এর ফলে ব্যবস্থাপনার পরিধি প্রসার লাভ করে। অন্যদিকে অধঃস্তন কর্মচারীরা যদি মোটাবুদ্ধির মানুষ হয়, কাজের ক্ষেত্রে অদক্ষ হয় এবং দায়িত্বহীন হয় তাহলে ব্যবস্থাপকের পরিদর্শনজনিত সময় বেশী লাগে এবং পদে পদে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

**(ii) অনুপ্রেরণা ও অঙ্গীকার (Motivation and commitment) :** অধঃস্তন কর্মীরা দায়িত্ববান ও উৎসাহী হলে, উদ্যমী ও পরিশ্রমী হলে ব্যবস্থাপকের পরিদর্শনজনিত সময় অনেক কম লাগে। একই যুক্তি তুলে ধরা যায় যদি তারা তাদের কর্তব্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। এর ফলে ঐ ব্যবস্থাপককে কর্মচারীর প্রতি বিশেষ সাহায্য করতে হয় না। সুতরাং অধঃস্তন কর্মীদের অনুপ্রেরণার পরিমাণ ও অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করেও ব্যবস্থাপনা পরিধির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

**(iii) স্বাধিকারের প্রয়োজনীয়তা (Need for autonomy) :** যেসব অধঃস্তন কর্মচারী স্বাধিকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তারা সাধারণতঃ স্বাধীনচেতা হয় এবং নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করে। অন্যদিকে নির্ভরশীল কর্মচারীরা তাদের সমস্যা নিজেরা সমাধানের চেষ্টা না করে ব্যবস্থাপকের কাছে সমাধানের জন্য নিয়ে আসে। এর ফলে এদের জন্য ব্যবস্থাপককে অনেক বেশী সময় দিতে হয়। সুতরাং এর উপরও ব্যবস্থাপনার পরিধি নির্ভরকরে।

**(3) সাংগঠনিক বিষয়সমূহ (Organisational factors) :** এমন অনেক সাংগঠনিক বিষয় রয়েছে যেগুলি ব্যবস্থাপনা পরিধিকে প্রভাবিত করে। এদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে তুলে ধরা হল—

**(i) কাজের প্রকৃতি (Nature of tasks) :** যদি কাজের প্রকৃতি সরল ও পৌনঃপুনিক ধরনের হয় তাহলে কাজের পরিকল্পনা তৈরি, পরিদর্শন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবস্থাপককে বিশেষ সময় দিতে হয় না। কিন্তু যদি জটিল ও পরিবর্তনশীল কাজ হয় তাহলো ব্যবস্থাপকদের অনেক বেশী সময় ব্যয় করতে হয়। আবার যদি কর্মচারীরা একই ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকে তাহলেও ব্যবস্থাপককে বেশী সময় ও মনোযোগ দিতে হয় না। সুতরাং কাজের প্রকৃতি অনুসারে অধঃস্তন কর্মচারীর সংখ্যা কম বা বেশী হয়।

**(ii) ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical location) :** যদি সকল বা অধিকাংশ অধঃস্তন কর্মচারী একই জায়গায় বা একই অট্টালিকায় কাজ করে তাহলে ব্যবস্থাপনার পরিধি বড় হয়। অন্যদিকে যদি অধিকাংশ অধঃস্তন কর্মচারী বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে তাহলে এই পরিধি ছোট হয়।

(iii) **পরিকল্পনা ও নীতি (Plans and plicies) :** প্রতিষ্ঠানে যদি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতি থাকে তাহলে এগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো হিসাবে কাজ করে। যেসব প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট নীতি থাকে সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের পক্ষে বেশী সংখ্যক কর্মচারীকে তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয়। ফলে ব্যবস্থাপনার পরিধি বৃদ্ধি পায়।

(iv) **পরিবর্তনের হার (Rate of change) :** যেসব প্রতিষ্ঠানে অতি দ্রুত হারে পরিবর্তন ঘটে সেসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার পরিধি ছোট হয়। কারণ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিকল্পনা, নীতি, কৌশল ইত্যাদির মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হয়। তাই পরিবর্তনের সাথে সাযুজ্য রাখতে ব্যবস্থাপনার পরিধি ছোট হওয়া দরকার।

(v) **কর্ম মূল্যায়নের ভিত্তি (Basis of performance evaluation) :** অধঃস্তন কর্মচারীদের কর্ম মূল্যায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানে যদি একটি প্রতিষ্ঠিত মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকে তাহলে একজন ব্যবস্থাপক বড় পরিধিতেও কাজ করতে পারে। কারণ পূর্বানির্ধারিত ভিত্তি অনুসারে অধঃস্তন কর্মচারীদের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এর ফলে ব্যবস্থাপক বেশী সংখ্যক কর্মচারীর কাজ পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করতে পারেন।

## ৪.৯ কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ

কেন্দ্রীকরণ হল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যখন উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপকদের কুক্ষিগত থাকে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত যখন কেবলমাত্র উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকরাই গ্রহণ করেন এবং অধস্তন কর্মী বা ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকে না। অন্যভাবে বলা যায় যে সাংগঠনিক ব্যবস্থায় উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপকের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায় তাকেই বলে কেন্দ্রীকরণ।

আবার বিকেন্দ্রীকরণ হল কেন্দ্রীকরণের ঠিক বিপরীত, বিকেন্দ্রীভূত সাংগঠনিক ব্যবস্থায় উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের যেমন নিজ নিজ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে তেমনি নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপক ও কর্মীদেরও নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে অর্থাৎ যখন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অধস্তন কর্মচারীদের হাতে কোনরূপ ক্ষমতা বণ্টন করে, তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হবে। কিন্তু ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে বিকেন্দ্রীকরণ আরও স্থূল অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেখানে ক্ষমতা বণ্টনের একটি স্তর অতিক্রম করলেই তবে তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হবে। সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ বলতে সাংগঠনিক ভিত্তিতে নিম্নস্তরে ভার অর্পণ বোঝায়। তাই ভার অর্পণ অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা সংরক্ষিত থাকলে কেন্দ্রীকরণের উদ্ভব হয়; আর সংরক্ষণ অপেক্ষা বেশী ক্ষমতার ভার অর্পণ করলে বিকেন্দ্রীকরণ উদ্ভূত হয়। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। অর্থাৎ পুরোপুরি কেন্দ্রীকরণ যেমন অসম্ভব ব্যাপার কারণ কিছু পরিমান ভার অর্পণ না করলে ব্যবস্থাপনার কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ে, তেমনি পুরোপুরি বিকেন্দ্রীকরণও সম্ভব হতে পারে না কারণ বিভিন্ন বিভাগ বা ডিভিশনের মধ্যে সংহতি বজায় রাখা যায় না। ডিভিশন গঠনের সঙ্গে বিকেন্দ্রীকরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে ডিভিশন গঠনের ফলই হল বিকেন্দ্রীকরণ—আবার বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসৃত হতে হলে ডিভিশন সংগঠনের প্রয়োজন। এই দুয়ের উদ্দেশ্য এক, পদ্ধতি এক এবং ফলাফলও এক। সেইজন্য বলা হয় যে, বিকেন্দ্রীকরণ হল ডিভিশন গঠনের ফল; আর ডিভিশন গঠন হল বিকেন্দ্রীকরণের উপায়।

## ৪.৯.১ বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা নিরূপনকারী উপাদানগুলি (Factors determining the degree of Decontralisation)

কমই হোক আর বেশীই হোক বিকেন্দ্রীকরণ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায়। কোন প্রতিষ্ঠানের বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা কয়েকটি উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবে নির্ণয় করা হয়। **আরনেস্ট ডেল** (Earnest Dale) বিকেন্দ্রীকরণ পরিমাপের চারটি পরীক্ষার কথা বলেছেন। সেগুলি হল—সিদ্ধান্তের সংখ্যা, সিদ্ধান্তের গুরুত্ব, সিদ্ধান্তের ফলাফল এবং সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রণ। এগুলিকে ভিত্তি করে উপাদানগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা হল :

**(ক) উন্নয়নের প্রকৃতি (Nature of Growth) :**

যদি প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটে, তাহলে যতক্ষণ না পর্যন্ত তা নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য হয় ততক্ষণ মূল কাঠামোতেই তা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। অপরদিকে, যদি বিভিন্ন কারবারী সংস্থার একত্রীকরণ, গ্রসন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন ঘটে, তখন কর্মধারার ক্ষেত্রে ডিভিশন গঠন বা বিভাগীকরণকে বেশী পছন্দ করা হয়। কারণ এর মাধ্যমে প্রতিটা ইউনিটের উপযোগিতা থেকে সুফল পাওয়া যাবে।

**(খ) উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি (Outlook of Top-management) :**

যদি উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা সমতার পক্ষপাতী হয়, অথবা একীভূত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পছন্দ করে, তাহলে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দেখা যায়। আবার, ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গী যখন উদার হয় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হয়, তখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কঠোরতাকে শিথিল করে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে ঝুঁকবে।

**(গ) কার্যাবলীর আয়তন ও ধরন (Size and pattern of Operation) :**

কোন ক্ষুদ্র আকারের প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি ডিভিশনে ভাগ করলে তা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষা ব্যাপার হয়ে যায়। সেই কারণে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলী যেমন উৎপাদন, বিপনন, অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যভিত্তিক গঠনপ্রণালী গ্রহণ করাই হবে সর্বোত্তম পন্থা। কিন্তু বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যাদের কার্যাবলীর ব্যাপক বিভিন্নতা দেখা যায়, সেখানে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভাগ গঠন ও ডিভিশন গঠন করা হলে দক্ষতা ও মুনাফাযোগ্যতাও বৃদ্ধি পাবে।

**(ঘ) বহুমুখীকরণের প্রকৃতি (Extent of Diversification) :**

যদি প্রতিষ্ঠানটি একাধিক দ্রব্য নিয়ে ব্যবসা করে, তাহলে কার্যভিত্তিক ডিভিশন গঠনের মাধ্যমে এর দক্ষতা বজায় থাকে না। কারণ প্রতিষ্ঠানে যে সব দ্রব্য তৈরি হয় তাদের প্রত্যেকটির জন্য উৎপাদন বিভাগ কিংবা বিক্রয় বিভাগ সমান গুরুত্ব বা মনোযোগ দিতে পারে না। সেই কারণে প্রতিটি দ্রব্যের জন্য পৃথক ডিভিশন গঠন করা শ্রেয়।

**(ঙ) কার্যাবলীর প্রকৃতি (Nature of Functions) :**

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজগুলির, যেমন—ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, বিপণন, অর্থসংস্থান ইত্যাদির জন্য বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা বেশী থাকা প্রয়োজন। কারণ এই সমস্ত মূল কাজে যে সব কর্মী নিযুক্ত থাকবে তারা

আরও দক্ষতার সাথে কাজ করতে উৎসাহিত হবে। অন্যদিকে, কর্মী সংগঠনের ক্ষেত্রে, যেমন—কর্মী নির্বাচন, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদির কেন্দ্রীভবন অধিক ফলপ্রসূ।

**(চ) দক্ষ ম্যানেজারের সহজলভ্যতা (Availability of Able Managers) :**

যখন প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপকগণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিজ্ঞ এবং সক্ষম, তখনই বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। যেখানে অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকের অভাব থাকবে, সেখানে বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে কেন্দ্রীকরণই অধিক উপযোগী বলে মনে হয়।

## ৪.৯.২ বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Decentralisation)

বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল :

**(ক) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভার লাঘব (Reduction of burden of higher authority) :**

বিকেন্দ্রীকরণের ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পায়। প্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় হলে এবং ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ না হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কিংবা কেন্দ্রীয় সংগঠনকে অধিক মাত্রায় কাজের চাপ সহ্য করতে হয়। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ইউনিট তৈরি হয় এবং সেগুলিকে এক-একজন ম্যানেজারের উপর দায়িত্ব দেওয়ার ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদন-সংক্রান্ত অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার থেকে মুক্ত হতে পারেন।

**(খ) কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্দীপিত করে (Inspires the workers in active participation) :**

যেহেতু অধস্তন কর্মীদের উপর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং যেহেতু নিজেদের কাজ করতে স্বাধীনতা পায়, সেজন্য কর্মীদের কাজ সম্পাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে উদ্দীপিত করা যায় এবং কাজ সম্পাদনে কর্মীদের অংশগ্রহণের মাত্রা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়।

**(গ) অধস্তন কর্মীদের অনুপ্রাণিতকরণ (Motivation of the workers) :**

ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে সংগঠনে একনায়কতন্ত্রমূলক ভাবের পরিবর্তে গণতন্ত্রমূলক ভাবের সৃষ্টি হয়, ফলে কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। অধস্তনদের মধ্যে কর্তৃত্ব অর্পণ করার ফলে তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয় এবং মুক্ত পরিবেশে কাজ করার ফলে তারা নিজেদের আরও উন্নত করতে অনুপ্রাণিত হয়।

**(ঘ) উন্নত ধরনের সিদ্ধান্ত তৈরির পথ প্রশস্ত হয় (Broaden the way for high quality decision-making) :**

প্রতিটি বিকেন্দ্রীভূত ইউনিটগুলিতে যে অবস্থা ও পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে, তার ভিত্তিতে ডিভিশনের ম্যানেজারগণ যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেগুলি অধিকাংশই বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে। উপরন্তু এসব ক্ষেত্রে

দেখা যায় যে, নিম্নস্তরের কর্মিগণও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেজন্য সেগুলির যথাযথ প্রয়োগও সম্ভব হয়ে ওঠে।

**(ঙ) উৎপন্ন দ্রব্যের বহুমুখীতার ক্ষেত্রে সাহায্য করে (Helps in the diversification of products) :**

বিকেন্দ্রীকরণ উৎপন্ন দ্রব্যের বহুমুখিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যেহেতু কেবল একটি দ্রব্য কিংবা তৎসম্পর্কিত দ্রব্যের পথটিকে ডিভিশন গঠনের ভিত্তি হিসেবে মনে করা হয়, তাই প্রতিটি দ্রব্যের বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং তুলনামূলক দক্ষতা প্রভৃতি বিষয় অতি সহজেই নিরূপণ করা যায়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দ্রব্যের বিপণনের জন্য যথাযথ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় বিক্রয় প্রচেষ্টা চালানো হয়। সে কারণে প্রতিষ্ঠানে আয়তন বড় হলে, বাজারের পরিধি বৃদ্ধি পেলে এবং বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদন করা হলে—বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

**(চ) কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করে (Affirms the effective control) :**

যখন প্রতিটি ডিভিশনকে মুনাফা অর্জনকারী একক হিসেবে গণ্য করা হয়, তখন প্রতিটি ডিভিশনের কাজের নিয়ন্ত্রণ অনেক সহজ হয়ে যায়। ফলে মান নিরূপণ ও প্রকৃত কাজ সম্পাদনের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়। প্রতিটি ডিভিশনের ম্যানেজারের দক্ষতা পর্যালোচনা করতে মোট মুনাফা ও মোট বিনিয়োগের প্রতিদানের হার পাওয়া যায়। প্রত্যেক ম্যানেজার নিজ নিজ কেন্দ্রের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনে অধিক যত্নবান হন।

## বিকেন্দ্রীকরণের অসুবিধা (Disadvantages of Decentralisation) :

**(ক) ব্যয়বহুল পদ্ধতি (Costly system) :**

বিকেন্দ্রীগত সংগঠনের বেশী কার্য-নির্বাহ ব্যয় মেটাতে প্রতিষ্ঠানের আয়তন যথেষ্ট বড় হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি ডিভিশনের জন্য পৃথকভাবে উৎপাদন ও বিপণনের সুযোগ-সুবিধা, ডিভিশনগুলিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে তোলা এবং তাদের জন্য পৃথকভাবে সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজের জন্য অধিকমাত্রায় ব্যয়ের সম্ভাবনা থাকে আবার বিভিন্ন কাজের জন্য সম্পদের অপচয় ঘটারও সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় অফিসের ব্যবস্থা হয় বলে তার জন্য অধিকমাত্রায় ব্যয় করতে হয়।

**(খ) নীতি নিয়ন্ত্রণের সমস্যা (Problem of policy control) :**

স্বাধীন ইউনিট সৃষ্টির মধ্যে কাজের স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্তের বিভিন্নতা নিহিত থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের অবস্থান পরিবর্তন, সরকারী নিয়ন্ত্রণবিধি এবং শ্রমিক সংঘের চ্যালেঞ্জের জন্য সমস্ত কোম্পানীতে নীতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে নীতি নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে বিরাট সমস্যা দেখা দেয় কারণ এতে ডিভিশনের-শাসনের অবস্থাকে খর্ব করতে হবে—নতুবা নীতি প্রয়োগে অসুবিধা হয়।

**(গ) সুদক্ষ ব্যবস্থাপকের অভাব (Lack of quality-managers) :**

যেসব প্রতিষ্ঠানে ডিভিশন আছে, তাদের ডিভিশনের ম্যানেজারদের দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। যখন কোন প্রতিষ্ঠান তার সংগঠনকে কার্যগত প্রক্রিয়া থেকে ডিভিশন গঠনে পরিবর্তন করে এবং যখন দূর-দূরান্তে অবস্থিত মুল অফিসের নিয়ন্ত্রণের অধীনে ব্যবসা চালাতে হয়, তখন ব্যবসা চালানোর জন্য প্রধান এবং মূল দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম ব্যবস্থাপকের বড়ই অভাব দেখা দেয়।

**(ঘ) সংযোজন ও সংহতির অভাব (Want of co-ordination and integration) :**

বিকেন্দ্রীগত সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে। ফলে সংহতি ও সমন্বয় রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অযোগ্য এবং অদক্ষ ব্যক্তির হাতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা আরোপ করা হলে তার অপব্যবহার হওয়াই স্বাভাবিক, ফলে কারবারের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়তে পারে।

## ৪.১০ সারাংশ

সংগঠনের ভাষাগত অর্থ হল সম্যকরূপে গঠন বা প্রকৃষ্টরূপে গঠন। ব্যবস্থাপনার কাছে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাকেই সংগঠন বলা হয়। সংগঠন একটা কাঠামো সরবরাহ করে যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজ যেমন পরিকল্পনা, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্পাদিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণ সম্ভব হয়। সংগঠন এমন এক ভিত্তি তৈরি করে যার উপর ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাঠামো গড়ে ওঠে। ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়নের জন্য একটি কার্যকরী সংগঠন গড়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন হয় তাদেরকে একসূত্রে বাঁধার প্রয়োজন হয়। তাই একটি প্রতিষ্ঠানের কাজের সাফল্য নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানে সংগঠনের কার্যকারিতার উপর।

## ৪.১১ অনুশীলনী

(১) সংগঠন কাকে বলে? সংগঠনের কয়েকটি সংজ্ঞা দিন।

(২) সংগঠনের নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

(৩) সংগঠনের বিভিন্ন ধরনগুলি আলোচনা করুন।

(৪) নিয়মানুগ এবং ঘরোয়া সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

(৫) ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।

(৬) ভার অর্পন কাকে বলে? ভারার্পনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(৭) ভারার্পনের নীতিসমূহ আলোচনা করুন।

(৮) ব্যবস্থাপনার পরিধির সংজ্ঞা দিন। এর ধরণ আলোচনা করুন। ব্যবস্থাপনার পরিধি নির্ধারণকারী উপাদনসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

(৯) কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কি বোঝায়?

(১০) বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করুন।

(১১) বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা নিরূপণকারী উপাদানগুলি আলোচনা করুন।

# একক ৫ ❑ অনুপ্রেরণা (Motivation)

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ অনুপ্রেরণা—সংজ্ঞা
৫.৪ অনুপ্রেরণার বৈশিষ্ট্যসমূহ
৫.৫ অনুপ্রেরণার উপাদানসমূহ
৫.৬ অনুপ্রেরণার তত্ত্বসমূহ
৫.৬.১ পুরস্কার ও তিরস্কার তত্ত্ব
৫.৬.২ চাহিদা তত্ত্বসমূহ
৫.৭ সারাংশ
৫.৮ অনুশীলনী

## ৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- অনুপ্রেরণার সংজ্ঞা ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ
- অনুপ্রেরণার তত্ত্বসমূহ

## ৫.২ প্রস্তাবনা

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হল কর্মীদের অন্তর্নিহিত ইচ্ছার প্রকাশ যার প্রতিফলন তাদের কর্মসম্পাদনের উপর পড়ে। অনুপ্রাণিতকরণ কর্মীদের স্বেচ্ছায় তাদের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে। অর্থাৎ অনুপ্রেরণা কর্মীদের মধ্যে কর্ম-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। আধুনিককালের ব্যবস্থাপকরা কর্মীদের দিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে যে দুটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন তার একটি হল অনুপ্রাণিতকরণ আর অন্যটি হল নেতৃত্বদান।

## ৫.৩ অনুপ্রেরণা—সংজ্ঞা

প্রকৃতপক্ষে অনুপ্রেরণা হল নির্দেশদানের অংশ বিশেষ। অনুপ্রেরণা বা অনুপ্রাণিতকরণ বা অনুপ্রেষণা বা অনুপ্রাণনা যে নামেই একে অভিহিত করা হোক না কেন মনোবিজ্ঞান ও আচরণবিজ্ঞানের প্রামান্য গ্রন্থে এর অনেক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা নিচে তুলে ধরা হল।

**গলব্রেথ** (J.K. Galbraith)-এর মতে—'অনুপ্রেরণা হল উদ্দীপনার উপায়, যার দ্বারা একজন ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থ ভুলে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তার সমস্ত প্রচেষ্টাকে নিবদ্ধ করে'।

**ম্যাকফারলন্ড** (Dalton McFarland)-এর মতে—'অনুপ্রেরণা হল এমন এক উপায় যা' উৎসাহ, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা অথবা প্রয়োজন বুঝে মানুষের আচরণকে নির্দেশ দেয়, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাখ্যা করে।'

**স্কট্** (William G. Scott)-এর ভাষায়—'এটি হল এমন এক প্রক্রিয়া যা মানুষকে তার অভীষ্ট বা ঈপ্সিত লক্ষ্য পূরণের জন্য উৎসাহিত করে।'

**অ্যালেন** (L.A. Allen) অনুপ্রেরণার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে কাজে নিযুক্ত করার প্রক্রিয়াই হল অনুপ্রেরণা'। তিনি আরও বলেছেন যে অনুপ্রেরণা দুটি অর্থ প্রকাশ করে। অনুপ্রেরণার প্রথম অর্থ হল এটি ব্যবস্থাপনার একটি দর্শন (Philosophy of management)। এর দ্বিতীয় অর্থটি হল পরিদর্শন ও কর্মী প্রশাসনের নির্দিষ্ট কৌশলের প্রয়োগ।

উপরের সংজ্ঞাগুলি চরিত্রগতভাবে প্রায় একই ধরনের। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে অনুপ্রেরণার আরো দু'একটি সংজ্ঞা তুলে ধরা যায়—

**অ্যালেন** (L.A. Allen) বলেছেন—'কর্মীরা যাতে কাজের সময় প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করা, উদ্বুদ্ধ করা ও সক্রিয় করার জন্য ব্যবস্থাপক যে কাজ করেন তাকেই বলে অনুপ্রেরণা বা অনুপ্রাণিতকরণ।

**জুসিয়াস** (Michel J. Jucious)-এর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তাঁর মতে—'একটু প্রশংসা, একটু মজুরী বৃদ্ধি, এক চিলতে হাসি, পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি, একটি নতুন টাইপ রাইটার, পছন্দমত কাজের জায়গা অথবা একটি নতুন ডেস্ক ইত্যাদি অসংখ্য উপায়ের মধ্যে সঠিক বোতামটি টিপে প্রত্যাশিত ফল লাভ করাকেই অনুপ্রেরণা বলে।'

উপরের সংজ্ঞাগুলি থেকে অনুপ্রেরণা সম্বন্ধে বলা যায় যে অনুপ্রেরণা হল এমন এক ব্যবস্থাপনামূলক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে কাজ করার আগ্রহ, ইচ্ছা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং কর্মীদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের দিকে চালিত করে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব হয়।

## ৫.৪ অনুপ্রেরণার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Motivation)

কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে কাজে উদ্বুদ্ধ করা ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির একটি। অনুপ্রেরণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মানবিক সম্পদের কাম্য ব্যবহারের পথ প্রশস্থ হয় ও উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়। অনুপ্রেরণা বা অনুপ্রাণিতকরণের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলি নিচে তুলে ধরা হল :

**অনুপ্রেরণার বৈশিষ্ট্যসমূহ**

- (i) মানসিক অভিব্যক্তি
- (ii) ধারাবাহিক প্রক্রিয়া
- (iii) উদ্দেশ্যমুখী আচরণ
- (iv) ধনাত্মক বা ঋনাত্মক
- (v) প্রয়োজন ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল
- (vi) স্বতঃস্ফূর্ততা
- (vii) ব্যবস্থাপনার কাজ

(i) **মানসিক অভিব্যক্তি (Psychological expression) :** প্রত্যেক মানুষই কম বেশী আবেগপ্রবণ। মানুষের আবেগই বিভিন্ন পরিবেশে মানুষকে ক্রিয়াশীল করে। অনুপ্রেরণা মানুষের অন্তর্নিহিত আবেগের উপর ক্রিয়া করে তার প্রকাশ ঘটায় ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মীর মানসিকতার পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়, যার অভিব্যক্তি ঘটে কর্মীর আচরণের মাধ্যমে।

(ii) **ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Continuous process) :** অনুপ্রেরণা বা অনুপ্রাণিতকরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মানুষের প্রয়োজন উপলব্ধির সাথে সাথে ঐ প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রয়োজন মিটলে মানুষ একধরনের তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি লাভ করে এবং সাথে সাথে নতুন কোন প্রয়োজন উপলব্ধি হয় এবং সেই প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। তাই অনুপ্রেরণাকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বলে। অর্থাৎ কর্মীদের একবার অনুপ্রাণিত করলেই ব্যবস্থাপনার কাজ শেষ হয়ে যায় না। তাদের মধ্যে হতাশা যাতে না আসে তার জন্য ধারাবাহিকভাবে তাদের অনুপ্রাণিত করতে হয়।

(iii) **উদ্দেশ্যমুখী আচরণ (Goal-oriented behaviour) :** অনুপ্রেরণা উদ্দেশ্যমুখী। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি স্বার্থ পূরণ ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যপূরণ। বস্তুতঃ অনুপ্রেরণা কর্মীস্বার্থ পূরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণের উপায় বলে গণ্য হয়। অবশ্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণে কর্মীর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সবসময় পূরণ হয় না। তবে কর্মীর মৌলিক প্রয়োজন ও চাহিদাগুলি পূরণ না হলে অনুপ্রেরণা ব্যাহত হয়। তাই অনুপ্রেরণা সবসময়ই উদ্দেশ্যকেন্দ্রীক।

(iv) **ধনাত্মক বা ঋনাত্মক (Positive or Negative) :** অনুপ্রেরণার সংজ্ঞায় দেখা যায় যে অনুপ্রেরণা হল মানুষের সেই ইচ্ছাশক্তি যা তাকে কিছু করতে বা কিছু না করতে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মীরা যখন স্ব-ইচ্ছায় কাজে নিযুক্ত হয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে তখন তাকে ধনাত্মক অনুপ্রেরণা বলে। বস্তুতঃ কর্মীদের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন ও চাহিদাপূরণ হলে তাদের মধ্যে ধনাত্মক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কর্মীদের জোর করে, ভয় দেখিয়ে যখন কাজ করতে বাধ্য করা হয় তখন তাকে ঋণাত্মক অনুপ্রেরণা বলে। ঋণাত্মক অনুপ্রেরণায় কর্মীর ইচ্ছা শক্তি কাজ করে না। অর্থাৎ কর্মীদের আরো ভালভাবে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া ও উদ্দীপ্ত করাই হল ধনাত্মক অনুপ্রেরণা অন্য দিকে ভয় দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে জোর করে কাজ করানো হল ঋণাত্মক অনুপ্রেরণা।

(v) **প্রয়োজন ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল (Depends on needs and wants) :** মানুষের প্রয়োজন রয়েছে বলেই চাহিদার সৃষ্টি হয় ও চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। অনুপ্রেরণা সৃষ্টির পিছনে রয়েছে মানুষের প্রয়োজন মেটানো ও চাহিদা পূরণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণের মাধ্যমে যদি তাদের ব্যক্তিগত আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় বা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তারা অনুপ্রাণিত হয় ও প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পাদনে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টার প্রয়োগ ঘটায়। সেজন্য অনুপ্রেরণা সবসময় প্রয়োজন ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তির যদি কোন প্রয়োজন না

থাকে, যদিও বাস্তবে অসম্ভব, তাহলে তাকে অনুপ্রাণিত করা যায় না। বস্তুতঃ মানুষের উপলব্ধি বা অনুভূতি থেকে এর সৃষ্টি হয় আর যেহেতু বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও চাহিদার অনুভূতি বিভিন্ন ধরনের, তাই তারা বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। অর্থাৎ একই ফর্মুলায় সকলকে সমানভাবে অনুপ্রাণিত করা যায় না।

**(vi) স্বতঃস্ফূর্ত (Sponteneous) :** অনুপ্রেরণা মানুষের অভ্যন্তরস্থ আবেগ বা ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ ঘটায়। এই প্রকাশ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে তখন কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। জোর করে কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা যায় না। এ যেন অনেকটা ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু জল খাওয়ানো যায় না। কর্মীরা যখন স্বেচ্চায় স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয় তখনই বলা যায় যে কর্মীরা অনুপ্রাণিত হয়েছে। ঋণাত্মক অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে এই স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না।

**(vii) ব্যবস্থাপনার কাজ (Function of management) :** ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলির মধ্যে একটি হল কর্মীদের নির্দেশনার কাজ। আর এই কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে হলে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। এর প্রথমটি হল কর্মীদের **নেতৃত্বদান** ও দ্বিতীয়টি হল কর্মীদের মধ্যে সঠিক মাত্রায় **অনুপ্রেরণা** সৃষ্টি করা। কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার জুড়ি মেলা ভার। ব্যবস্থাপকদের দায়িত্বের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা ও তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা বজায় রাখা।

## ৫.৫ অনুপ্রেরণার উপাদানসমূহ (Elements of Motivation)

অনুপ্রেরণা হল কর্মীদের আচরণকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা বা প্রয়াস। প্রতিটি কর্মীই পরস্পরের থেকে আলাদা। কারণ তাদের রুচি, পছন্দ, প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা এক নয়, আলাদা। তাই প্রত্যেকের অনুপ্রেরণার কারণও আলাদা। কিন্তু কতকগুলি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মিল রয়েছে, যেমন—প্রত্যেকেরই ক্ষুধা, তৃষ্ণা রয়েছে, প্রত্যেকেই ভালভাবে বাঁচতে চায়, সচ্ছলতা চায়, জীবনে উন্নতি করতে চায়, শান্তি চায়, কাজের মধ্যে আনন্দ পেতে চায় ইত্যাদি। সুতরাং এগুলি পূরণের ব্যবস্থা করে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা সম্ভব। আগে কেবলমাত্র অর্থকেই অনুপ্রেরণার একমাত্র উপাদান হিসাবে গণ্য করা হত। কারণ কর্মীরা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে অর্থ-উপার্জনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক জলিতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে **আর্থিক উপাদানের** গুরুত্ব বর্তমানেও রয়েছে একথা সত্য। কিন্তু তার সাথে **অনার্থিক উপাদানও** সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। একটু প্রশংসা, এক চিলতে হাসি, পদোন্নতির সম্ভাবনা, উন্নত কাজের পরিবেশ এগুলিও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই অনুপ্রেরণার উপাদানগুলিকে প্রাথমিকভাবে তিনভাগে ভাগ করা হয় বা বলা যায় যে অনুপ্রেরণার উপাদানগুলির প্রকৃতি তিনধরনের। এগুলি হল—(1) ব্যক্তি মানসিকতা, (2) সাংগঠনিক অবস্থা ও (3) বাহ্যিক পরিবেশ। নিচে প্রতিটি উপাদানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল :

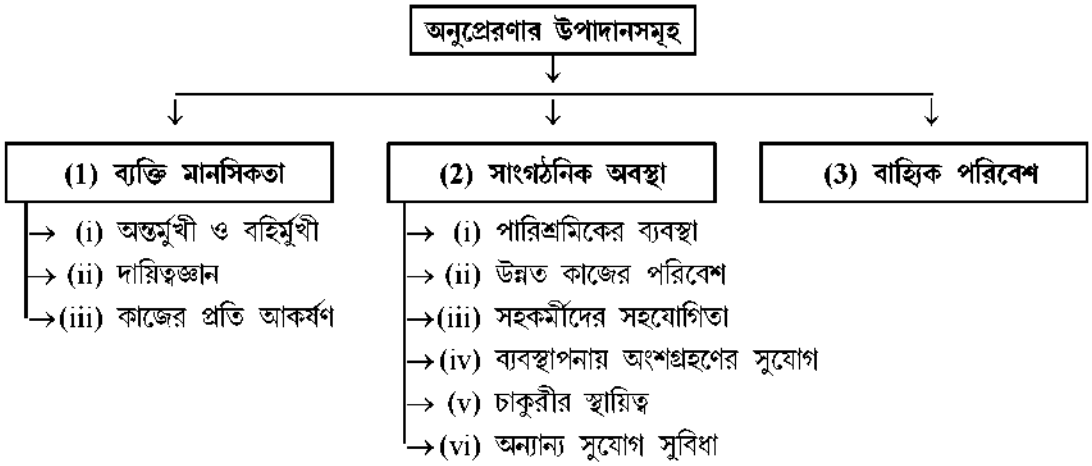


**(1) ব্যক্তি মানসিকতা (Individual menatality) :** বিভিন্ন কর্মীর ব্যক্তি মানসিকতা বিভিন্ন ধরনের হয়। কোন কর্মী উচ্ছল, কেউ চাপা, কেউ কথা বলতে ভালবাসে, কেউ শুনতে ভালবাসে, কেউ কাজের ব্যাপারে খুব মনযোগী, কেউ অমনযোগী, কেউ নিয়ম মানতে ভালবাসে, কেউ নিয়ম ভেঙ্গে আনন্দ পায়। তাই বলা হয় মানুষের চরিত্র বিধাতারও অজ্ঞাত। অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানসিকতা একটি অন্যতম উপাদান হিসাবে গণ্য হয় কারণ অনুপ্রেরণার মাত্রা নির্ভরকরে ব্যক্তি মানসিকতার উপর। কোন কর্মী হয়তো একটু মজুরী বৃদ্ধি হলেই খুব অনুপ্রাণিত হয়, অন্য কোন কর্মী হয়তো একটু প্রশংসা পেলেই উদ্বুদ্ধ হয়, আবার কোন কর্মী হয়তো কাজের ভাল পরিবেশ পেলেই অনুপ্রাণিত হয়। অনুপ্রাণিতকরণের মানসিকতার অন্তর্গত অনুপ্রেরণার উপাদানগুলি নিচে আলোচনা করা হল :

**(i) অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব (Introvert and extrovert personality) :** কর্মীদের ব্যক্তিত্বের উপর অনুপ্রেরণার মাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করে। একজন অন্তর্মুখী ব্যক্তি নিজস্ব জগতের চারসীমার মধ্যেই থাকতে ভালবাসে। তারা নিজেদের নিয়েই বাঁচতে চায়। বাহ্যিক পরিবেশ তাদের বিশেষ আকর্ষণ করতে পারে না। অন্যদিকে বহির্মুখী ব্যক্তিরা এদের ঠিক উল্টো। এরা বাহ্যিক পরিবেশের প্রতি বেশী আকর্ষণ বোধ করে। কর্মীদের এই মানসিক গঠন ও জীবনের প্রতি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তারা অনুপ্রাণিত হয়। তাই কর্মীর মানসিক প্রকৃতি অনুসারেই অনুপ্রেরণার প্রকৃত নির্ধারণ করতে হয়।

**(ii) দায়িত্বজ্ঞান (Sense of responsibility) :** সব কর্মীর দায়িত্বজ্ঞান সমান হয় না। তাই অনুপ্রেরণার মাধ্যমে তাদের দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। দায়িত্ব পালনের সুফল ও কুফলগুলি কর্মীদের সামনে তুলে ধরলে তারা দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়। তাই অনুপ্রাণিতকরণ কর্মীদের মধ্যে কর্তব্য ও দায়িত্ব সংক্রান্ত আচরণকে প্রভাবিত করে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে কাজ করে।

**(iii) কাজের প্রতি আকর্ষণ (Attraction to work) :** প্রতিষ্ঠানে দু'ধরনের কর্মী কাজ করে। কিছু কর্মী কাজের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এরা কাজ করে সন্তুষ্টি লাভ করে। অন্যদিকে কিছু কর্মীর কাছে কাজ খুব নীরস ও আকর্ষণহীন মনে হয়। এসব কর্মীদের কাছেও কাজকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে তারা অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাই কর্মীদের মধ্যে কাজের প্রতি আকর্ষণ যাতে গড়ে

তোলা যায় ও বজায় রাখা যায় সেই লক্ষ্যে ব্যবস্থাপকরা অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেন। তাই কাজের প্রতি আকর্ষণ গড়ে তোলা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অনুপ্রেরণার অন্যতম উপাদান।

**(2) সাংগঠনিক অবস্থা (Organisational conditions) :** প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো, কারিগরী অবস্থা, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ইত্যাদি অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সংক্ষেপে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অবস্থা যদি কর্মীদের সন্তুষ্টি দেয় তাহলে তা অনুপ্রেরণার সহায়ক হয়। সাংগঠনিক অবস্থার অন্তর্গত অনুপ্রেরণার উপাদানগুলি নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল :

**(i) পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা (Provision of remuneration) :** প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা যোগদান করে প্রাথমিকভাবে জীবিকার স্বার্থে। প্রতিষ্ঠানে তারা শ্রম দেয় আর বিনিময়ে পারিশ্রমিক পায়। এই পারিশ্রমিক দিয়ে তারা তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে ও বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়। তাই কর্মীদের পারিশ্রমিক যথাযত ও ন্যায্য হলে কর্মীরা অনুপ্রাণিত হয়, তাদের কাজে স্পৃহা জাগে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে কর্মীরা যদি তাদের পরিশ্রমের যথার্থ মূল্য অর্থাৎ পারিশ্রমিক না পায় তাহলে তারা ক্ষুব্ধ হয় এবং কাজের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। তাই ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদানের মাধমে কর্মীদের অনুপ্রামিত করার কৌশল আগেও যেমন ব্যবহার হত তেমনি বর্তমানেও ব্যবহৃত হয়। এর ফলে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার কাজ অনেক সহজ হয়।

**(ii) উন্নত কাজের পরিবেশ (Congenial work environment) :** প্রতিষ্ঠানে কাজের উন্নত পরিবেশ থাকলে কর্মীদের কাজ করার আগ্রহ জন্মে। কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা থাকে না বলে কর্মীরাও অনুপ্রাণিত হয় এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে। অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে যদি কাজ করতে হয় তাহলে তা শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তির কারণ হয়ে ওঠে। এর ফলে অনুপ্রেরণা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই উন্নত কাজের পরিবেশও কর্মীদের অনুপ্রেরণার একটি উপাদান হিসাবে গণ্য হয়।

**(iii) সহকর্মীদের সহযোগিতা (Co-operation of fellow workers) :** সহকর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা ও প্রীতির সম্পর্ক থাকলে তার থেকেও কর্মীরা অনুপ্রেরণা পায়। বস্তুতঃ সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক কাজের পরিবেশ ভাল করতে সাহায্য করে। আর ভাল কাজের পরিবেশ কর্মীদের কাজে উৎসাহ জোগায় ও অনুপ্রাণিত করে। তাই ব্যবস্থাপকরা কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক স্থাপনের বাতাবরণ সৃষ্টি করে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

**(iv) ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ (Scope for participation in management) :** ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠানেই বিরোধমূলক। কারণ ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়েরই লক্ষ্য এক—প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ। কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে বিরোধিতার সম্পর্কের পরিবর্তে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মীদের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারে। এর ফলে তাদের সম্মান লাভের প্রয়োজনীয়তা (esteem need) পূরণ হয় এবং তারা অনুপ্রাণিত হয়। তাই কর্মীদের ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করা হয়।

**(v) চাকুরীর স্থায়িত্ব (Stability in service) :** কর্মীদের চাকুরীর নিরাপত্তা অনুপ্রেরণার একটি অন্যতম উপাদান। **ম্যাসলো** (A. Maslow) তাঁর চাহিদার ক্রমানুসারে তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে মানুষের দৈহিক

প্রয়োজন পূরণ হলে তার নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাদের নিশ্চয়তা দেওয়া হলে তারা নিশ্চিন্ত বোধ করে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ তারা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কাজ করতে এগিয়ে আসে। অন্যদিকে চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকলে কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা বা স্পৃহা গড়ে ওঠে না। সেজন্য অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

**(vi) অন্যান্য সুযোগ সুবিধা (Other benefits) :** মজুরী বা মাইনে ছাড়াও কর্মীরা যখন প্রতিষ্ঠান থেকে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পায় তখন এই অতিরিক্ত প্রাপ্তির ফলে তারা অনুপ্রাণিত হয়। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বলতে বাসস্থানের সুবিধা, চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা, যাতায়াতের ব্যবস্থা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুবিধা ইত্যাদি। এরূপ সুবিধা প্রাপ্তির ফলে কর্মচারীদের সন্তুষ্টি বেড়ে যায় এবং তারা সহজেই অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হয়।

**(3) বাহ্যিক পরিবেশ (External environment) :** প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের মতই বাহ্যিক পরিবেশও কর্মীদের অনুপ্রেরণার উপর সদর্থক প্রভাব ফেলে। কারণ কাজের সময়ের বাইরে কর্মীকে বাইরের পরিবেশের মধ্যে কাটাতে হয়। তাই যে পরিবেশে কর্মী তার সামাজিক জীবন কাটায় তার উপরও তার অনুপ্রেরণার মাত্রা নির্ভর করে। এজন্য কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা, খেলাধুলা ও বিনোদন, ছেলেমেজেদের শিক্ষা, যাতায়াত ইত্যাদির ব্যবস্থা করে প্রতিষ্ঠান কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। এতদ্‌সত্ত্বেও অনেক সময় বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাবে কর্মীদের ঠিকভাবে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয় না, যেমন জটিল পারিবারিক জীবনযাত্রা, ছেলেমেয়েদের ব্যর্থতা, পারিবারিক ঝগড়া-ঝাঁটি ও অশান্তি কর্মীর মানসিকতায় একধরনের জাড্যতার সৃষ্টি করে যার ফলে তাদের অনুপ্রাণিত করা সহজ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন কর্মী বাড়িতে ঝগড়া-ঝাঁটি করে অফিসে এসে সে মন দিয়ে কাজ করতে পারে না। সুতরাং বাহ্যিক পরিবেশও কর্মীদের অনুপ্রেরণার একটি উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

উপরের নির্দেশগুলি মেনে চললে একজন ব্যবস্থাপক তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের সহজেই অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হন।

## ৫.৬ অনুপ্রেরণার তত্ত্বসমূহ (Theories of Motivation)

তত্ত্ব হল প্রতিষ্ঠিত নীতিসমূহ যা কোন ঘটনার পিছনে যে কার্য-কারণ সম্পর্ক (cause-effect relationship) থাকে তা' ব্যাখ্যা করে। অনেক সময়ই মনে হয় যে তত্ত্ব হল বিমূর্ত (abstract) যার বাস্তব জগতের সাথে কোন যোগ থাকে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জগতে কি ঘটবে তা বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও পূর্বানুমান করার ভিত্তি গড়ে ওঠে তত্ত্বের ওপর। সমাজ বিজ্ঞানী **কার্ট লিউইন** (Kurt Lewin) মন্তব্য করেছিলেন—"একটি ভাল তত্ত্বের থেকে আর কোন কিছুই বেশী বাস্তব নয়" (Nothing is more practical than a good theory)। ব্যবস্থাপকরা যখন কোন কাজ করেন তখন তাঁরা অবচেতনভাবে বা সচেতনভাবে কিছু তত্ত্ব মেনে চলেন।

অনুপ্রেরণা একটি ব্যবস্থাপনামূলক কাজ। এটি মানুষের আচরণকে পরিচালিত করে ও নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চরিত্র জটিল, তাই তাদের আচরণও জটিল। তাদের আচরণকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের দিকে চালিত করার প্রচেষ্টাই হল অনুপ্রেরণা। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্ক মতবাদ ও মানবীয় আচরণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তনের আগে কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে মূলতঃ নির্দেশনা, পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তাই **পুরস্কার ও তিরস্কার তত্ত্বকে** (Carrot and stick theory) অনুপ্রেরণার প্রাচীন তত্ত্ব হিসাবে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু আধুনিক যুগে, বিশেষতঃ **মায়ো** (Elton Mayo) ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত **হথর্ণ গবেষণার** পর মনোবিজ্ঞানীরা ও সমাজবিজ্ঞানীরা কর্মীদের অনুপ্রেরণার পিছনে কারণ অনুসন্ধান করতে ও তাদের কিভাবে অনুপ্রাণিত করা যায় তার উপায় খুঁজতে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালান। এসব গবেষণার ফলেই বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। অনুপ্রেরণার তত্ত্বগুলি বিভিন্ন ধরনের হলেও তাদের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এটি হল **'মানুষ সেই কাজটিই করে যেটি করলে সে পুরস্কৃত হয়'** (people do what they are rewarded for doing)। অর্থাৎ এটি হল একজন মানুষের কাজের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তি। তাই একে **পৃথিবীর সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার নীতি** (the greatest management principle of the world) বলে গণ্য করা হয়।

যাইহোক্, অনুপ্রেরণা সংক্রান্ত তত্ত্বগুলিকে প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলি হল—(1) **প্রাচীন যুগের অনুপ্রেরণার তত্ত্ব** ও (2) **আধুনিক যুগের অনুপ্রেরণার তত্ত্ব।** প্রাচীন যুগের অনুপ্রেরণা তত্ত্ব বলতে পুরস্কার ও তিরস্কার তত্ত্বকে বোঝায়। অন্যদিকে আধুনিক যুগের অনুপ্রেরণার তত্ত্বগুলিকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন—চাহিদা তত্ত্ব, সাহায্যকারী তত্ত্ব, প্রত্যাশার তত্ত্ব ইত্যাদি। এদের মধ্যে চাহিদা তত্ত্বকে **তৃপ্তি** বা **সন্তুষ্টি তত্ত্ব** (content theory) ও অন্যান্য তত্ত্বগুলিকে এককথায় **প্রক্রিয়া তত্ত্ব** (process theory) হিসাবে গণ্য করা হয়। অনুপ্রেরণার বিভিন্ন তত্ত্বগুলির এই শ্রেণীবিভাগ করার পিছনে সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। এই কারণগুলি হল—তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি তত্ত্ব **'কি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে'** (What motivates people) তার উপর গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে প্রক্রিয়া তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে প্রক্রিয়া তত্ত্ব গড়ে উঠেছে **'কিভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা যায়'** (How to motivate people) তার উপর। অনুপ্রেরণার তত্ত্বগুলিকে একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলে আমরা পাই—

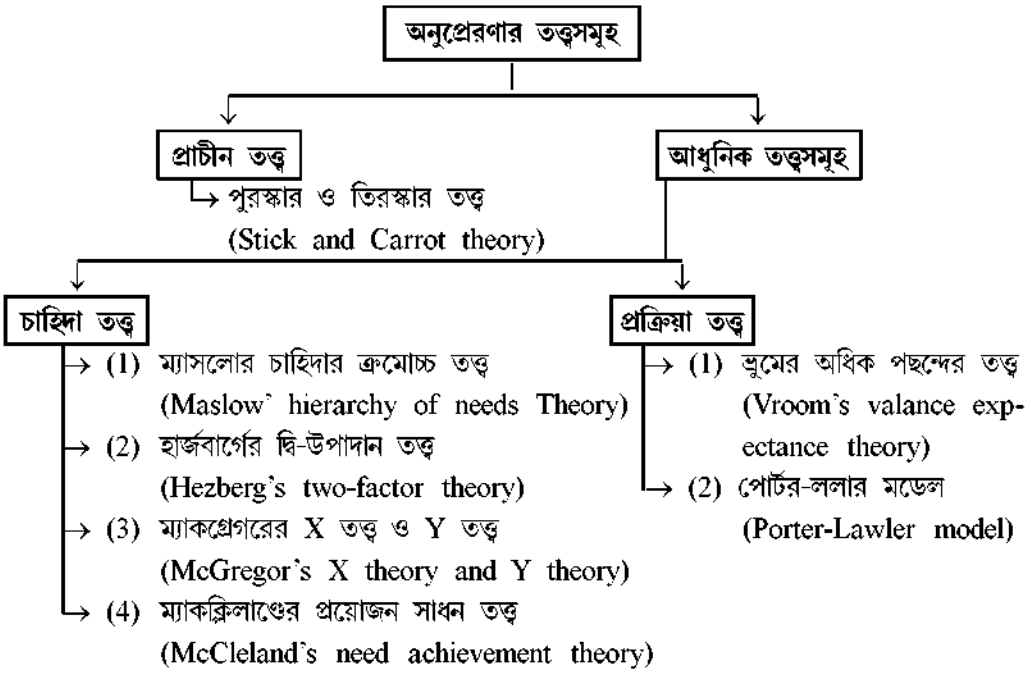


উপরের তালিকার বাইরেও কিছু অনুপ্রেরণার তত্ত্ব রয়েছে। তবে অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে উপরের তত্ত্বগুলিই সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এদের মধ্যে যেগুলি বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কেবলমাত্র সেগুলিই নীচে আলোচনা করা হল।

## ৫.৬.১ পুরস্কার ও তিরস্কার তত্ত্ব (Carrot and Stick theory)

অনুপ্রাণিতকরণের বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে সনাতন তত্ত্ব হল পুরস্কার ও তিরস্কার নীতি। এই নীতির মূল বক্তব্য হল কাজ সম্পাদন করলে পুরস্কার প্রাপ্য, না করতে পারলে তিরস্কার। অনুপ্রাণিতকরণের মাধ্যম হিসাবে এখানে ইংরাজীতে Carrot অর্থাৎ গাজর এবং Stick অর্থাৎ বেত্রাঘাতকে ব্যবহার করা হয়েছে। গাধা যদি মাল বহনে সক্ষম হয় তাহলে সে গাজর পাবে, না পারলে বেত্রাঘাত। কর্মীদের ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের প্রশ্নে **গাজর** হল পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি ও **বেত্রাঘাত** হল কর্মচ্যুতি, ভর্ৎসনা, তিরস্কার, সাময়িক বরখাস্ত ইত্যাদি। তাই পুরস্কার হল ধনাত্মক অনুপ্রাণিতকরণ ও তিরস্কার হল ঋণাত্মক অনুপ্রাণিতকরণ। যদিও অনেকে বলেন বর্তমান দিনে এই তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক নয় তা সত্ত্বেও এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই তত্ত্ব অনেক ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর হয়। Koontz এবং O'Donell-এর মতে "অনুপ্রাণিতকরণের যত গবেষণা এবং তত্ত্ব আজ পর্যন্ত অনুসৃত হোক না কেন, একথা ভুললে চলবে না যে পুরস্কার ও তিরস্কার তত্ত্ব এখনও অনুপ্রাণিতকরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম।"

## ৫.৬.২ চাহিদা তত্ত্বসমূহ (Need Theories)

**(1) ম্যাসলোর চাহিদার ক্রমোচ্চ তত্ত্ব (Maslow's Hieraechy of Needs Theory) :** 1940 সালে চাহিদার ক্রমোচ্চ তত্ত্বের ধারণাটি প্রথম অবতারণা করেন **ল্যাঙ্গার** (Langer)। কিন্তু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটান ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে একটি জনপ্রিয় তত্ত্ব হিসাবে একে প্রতিষ্ঠিত করেন **আব্রাহাম ম্যাসলো** 1943 সালে। ম্যাসলো একজন মার্কিন মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানী (Psychologists)। তিনি চাহিদার ক্রমোচ্চ তত্ত্বে কর্মীদের অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে **প্রয়োজন** বা **চাহিদার** (needs) ভূমিকা পর্যালোচনা করেন। ম্যাসলোর চাহিদা তত্ত্বটি চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে (four premises) গড়ে উঠেছে। এগুলি হল—

(i) অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে মিটে যাওয়া বা পূরণ হওয়া চাহিদার কোন ভূমিকা থাকে না এবং এসব চাহিদা মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে না।

(ii) মানবিক চাহিদাগুলিকে তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী একটি ক্রমোচ্চ শ্রেণীতে সাজানো যায়। এই শ্রেণীর প্রথম দিকে নিম্নমানের সরল প্রয়োজনগুলি যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি থাকে এবং উপরের দিকে শ্রদ্ধা, আত্মোপলব্ধির মত জটিল চাহিদাগুলি থাকে।

(iii) মানুষের একটি স্তরের প্রয়োজন বা চাহিদা মিটলে সে পরবর্তী স্তরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করে।

(iv) ব্যক্তির পূরণ হওয়া চাহিদার তৃপ্তি যদি বজায় না থাকে, তাহলে ঐ চাহিদা পুনরায় ব্যক্তি অনুভব করে ও পূরণ করার চেষ্টা করে। যেমন ব্যক্তির নিরাপত্তার চাহিদা মেটার পর সে সামাজিক চাহিদা মেটানোর স্তরে পৌঁছে যায়। কিন্তু এই স্তরে থাকাকালীন তার চাকুরী যদি চলে যায় তাহলে তার মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা আবার ফিরে আসে।

**ম্যাসলো** তাঁর তত্ত্বে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদাকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে মানুষ হল এমন এক জীব যার চাহিদার শেষ নেই (Man is a 'wanting animal')। এই চাহিদাগুলি অনুক্রমিক (sequential) এবং সকল চাহিদা কখনই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। চাহিদাগুলি স্তরভিত্তিক এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত এবং

সর্বনিম্নস্তরের চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ প্রথমে চেষ্টা করে এবং এই চাহিদা পূরণ হলে ক্রমাগতভাবে উপরের স্তরের চাহিদা পূরণের জন্য ক্রিয়াশীল হয়। তার এই প্রচেষ্টা অবিরামভাবে চলতে থাকে। ম্যাসলো তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে **মানুষের অতৃপ্ত চাহিদা থেকেই (unsatisfied need) অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়।** অর্থাৎ যেসব চাহিদা অপূর্ণ থাকে সেগুলি পূরণ করার লক্ষ্যে সে তার প্রচেষ্টাকে নিবদ্ধ করে। যেসব চাহিদা পূরণ হয়ে গেছে অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা থাকে না। **ম্যাসলো** তাঁর তত্ত্বে চাহিদার স্তরগুলিকে তাদের গুরুত্ব অনুসারে যেভাবে বিভক্ত করেছেন তা নীচে তুলে ধরা হল :

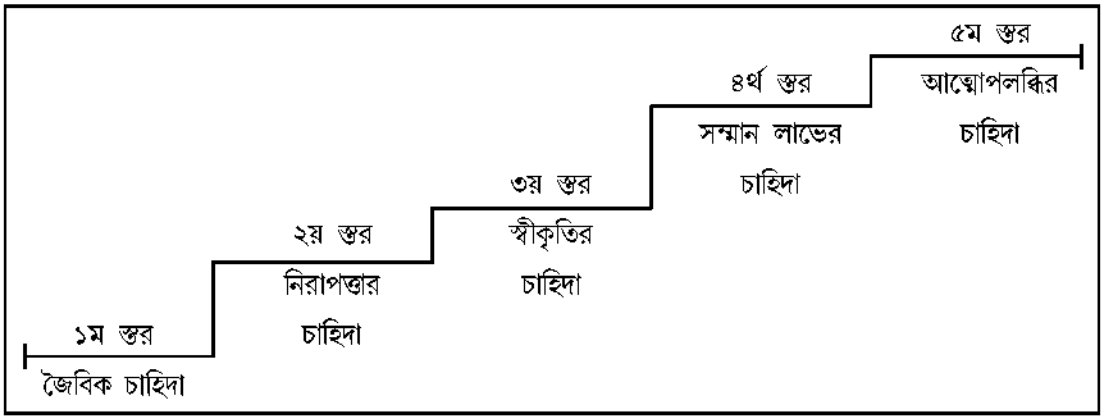


**ম্যাসলোর চাহিদার ক্রমোচ্চ তত্ত্ব**

**(i) দৈহিক বা জৈবিক চাহিদা (Physiological or Biological need) :** মানুষ জৈবকি চাহিদাগুলি নিয়েই এই পৃথিবীতে আসে। তাই এগুলিকে মৌলিক প্রাথমিক চাহিদা বলা হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, বিনোদন ইত্যাদির মতো চাহিদাগুলি মানুষের দৈহিক চাহিদার মধ্যে পড়ে। কর্মক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকরা পারিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে এবং ছুটি, কাজের সময়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা, টিফিনের জন্য সময়, আলো, পাখা ও জলের ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে দৈহিক চাহিদাগুলি পুরণের ব্যবস্থা করেন।

**বাইবেলে** একটি প্রবচন আছে যে 'মানুষ কেবলমাত্র খাদ্যের দ্বারা বাঁচে না' (Man does not live by bread alone)। আবার কবির লেখনীতে ফুটে উঠেছে 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়'। অর্থাৎ মানুষ যখন ক্ষুধার্ত হয় তখন খাবারের প্রয়োজনই তার কাছে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হিসাবে দেখা দেয়। অন্য কোন প্রয়োজনই তার অনুভূতির মধ্যে আসে না, ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটলে তবেই অন্য প্রয়োজন অনুভূত হয়। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে অন্যান্য দৈহিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও। তাই কাজের ক্ষেত্রে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তাদের প্রাথমিক চাহিদাগুলি পূরণের ব্যবস্থা করা হয় ন্যায্য পারিশ্রমিক দিয়ে ও কাজের পরিবেশ উন্নত করে।

**(ii) নিরাপত্তা চাহিদা (Security need) :** যখন মানুষের জৈবিক বা দৈহিক চাহিদাগুলি মিটে যায় তখন তার মধ্যে নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থাৎ মানুষ তার নিরাপত্তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ক্রিয়াশীল হয়। এই নিরাপত্তা তিন ধরনের—দৈহিক নিরাপত্তা, মানসিক নিরাপত্তা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা। আর এই প্রয়োজনগুলিই প্রতিফলিত হয় ভবিষ্যনিধি, অবসরকালীন সুবিধা, স্থায়ী চাকুরী, বীমা কর্মসূচী, শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। যেহেতু কর্মচারীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল থাকে, তাই তাদের কাছে নিরপত্তার চাহিদা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়। ব্যবস্থাপনার খামখেয়ালী আচরণ তাদের এই চাহিদাকে বাড়িয়ে দেয় এবং চাহিদার যে কোন স্তরেই নিরাপত্তার চাহিদা অনুভূত হতে পারে।

**(iii) স্বীকৃতির চাহিদা ও সামাজিক চাহিদা (Affiliation and social needs) :** যখনই ব্যক্তির ন্যূনতম নিরাপত্তায় চাহিদা পূরণ হয় তখনই তার মধ্যে ভালবাসার চাহিদা, যা স্বীকৃতির চাহিদা বা সামাজিক চাহিদা নামেও গণ্য হয়, গড়ে ওঠে। এই পর্যায়ে মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব, সঙ্গী বা সহচর এবং দলের মধ্যে জায়গা পাওয়ার ইচ্ছা গড়ে ওঠে। এই চাহিদা সহকর্মীদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া এবং অন্যদের সমর্থনের দ্বারা পূরণ হয়। ব্যক্তির সামাজিক চাহিদা পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের মিলিত উদ্যোগে পূরণ হয়। কর্মক্ষেত্রে কর্মীর এই চাহিদা পূরণ হয় যখন সে কর্মীদলের একজন বলে নিজেকে ভাবতে পারে।

ব্যবস্থাপকরা কর্মীদের এরূপ চাহিদাকে স্বীকৃতি দিলেও তাঁরা মনে করেন যে এধরনের চাহিদা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আশঙ্কার কারণ। এজন্য তারা অনেকসময় কর্মীদল গঠনের প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন কর্মীদের সামাজিক ও স্বীকৃতির চাহিদা বিফল হয় তখন তারা যেভাবে কাজ করে তাতে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন জটিল হয়ে পড়ে। কর্মক্ষেত্রে কর্মীর সামাজিক ও স্বীকৃতির চাহিদার প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন নিয়মমাফিক ও ঘরোয়া সংগঠন, হেল্‌থ ক্লাব, কমিউনিটি সেন্টার ও প্রতিষ্ঠান গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে।

**(iv) সম্মান লাভের চাহিদা বা অহমিকার চাহিদা (Esteem or ego needs) :** স্বীকৃতির চাহিদার পরবর্তী স্তর হল সম্মান লাভের চাহিদা। মানুষের চাহিদা অসীম এবং মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার পর তার মধ্যে সম্মান লাভের চাহিদা গড়ে ওঠে। এই স্তরে তার চাহিদার অপর একটি দিক হল অহমিকার চাহিদা। অহমিকার চাহিদা ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা, সাফল্য, সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে সম্মান লাভের চাহিদা ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা, সাফল্য, সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। এই প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য ব্যবস্থাপকরা বেশী করে কর্তৃত্বের ভারার্পণ করেন, তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করেন, তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেন, ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামতকে স্বীকার করেন ও তাদের কাজের স্বীকৃতি দেন।

**(v) আত্মোপলব্ধির চাহিদা (Self-actualisation need) : ম্যাসলোর (Maslow)** চাহিদা তত্ত্বে পাঁচটি চাহিদার স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটিই সর্বোচ্চ বা শেষ স্তর। **ম্যাসলোর** মতে মানুষের অন্যান্য চাহিদাগুলি পূরণ হলে তার মধ্যে আত্মোপলব্ধির চাহিদা দেখা দেয়। এই স্তরে মানুষ নিজেই নিজের মূল্যায়ন করে। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে সে তার যোগ্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পারে এবং তার মধ্যে উন্নতির যে সম্ভাবনা থাকে তা কাজে লাগাবার জন্য তার প্রচেষ্টাকে নিবদ্ধ করে। এই স্তরে মানুষ তার প্রাপ্তিকে সর্বাধিক করার চেষ্টা করে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আত্মোপলব্ধির চাহিদা পূরণ হয় জটিল কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে, সৃজনশীল কাজ করার মাধ্যমে এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। তবে নিম্নস্তরের চাহিদার মতই এই স্তরের চাহিদাও পুরোপুরি পূরণ হয় না।

**ম্যাসলোর (Maslow)** ক্রমোচ্চ চাহিদার গভীরতা বা তীব্রতা একটি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলে নীচের চিত্রটি পাওয়া যায়। চিত্রের ভূমিসংলগ্ন চাহিদার স্তরগুলিতে মানুষের চাহিদার তীব্রতা সব থেকে বেশী। আর যত উপরের স্তরের দিকে যাওয়া যায়, চাহিদার তীব্রতা তত কমতে থাকে এবং উচ্চতম স্তরে অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির স্তরে এই তীব্রতা সর্বনিম্ন হয়।

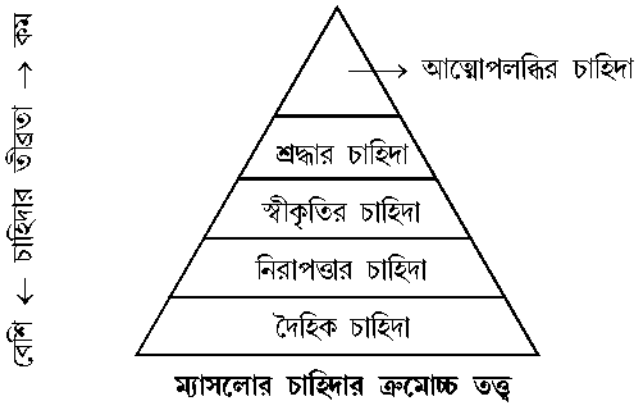


**ম্যাসলোর চাহিদার ক্রমোচ্চ তত্ত্ব**

**(2) হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Herzberg's Two-Factor Theory) :**

**হার্জবার্গের** (Frederick Herzberg) দ্বি-উপাদান তত্ত্বে কর্মী অনুপ্রেরণার পিছনে কোন কোন বিষয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুতঃ হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি ম্যাসলোর (Maslow) গবেষণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এবং একে **অনুপ্রেরণা-স্বাস্থ্য তত্ত্ব** (Motivation-hygiene theory) বা **অনুপ্রেরণা-সংরক্ষণকারী তত্ত্ব** (Motivation maintenance theory) নামেও আখ্যা দেওয়া হয়। অনুপ্রেরণার উৎস চিহ্নিত করার জন্য তাঁরা 200 জন ইঞ্জিনিয়ার ও হিসাবরক্ষকের উপর সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। প্রত্যেককে দুটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। এগুলি হল :

**প্রথম প্রশ্ন :** তুমি কি বিশদ্‌ভাবে বলতে পার যে কখন তোমার কাজের প্রতি **সবচেয়ে খারাপ** অনুভূতি হয়েছিল?

**দ্বিতীয় প্রশ্ন :** তুমি কি বিশদ্‌ভাবে বলতে পার যে কখন তোমার কাজের প্রতি **সবচেয়ে ভাল** অনুভূতি হয়েছিল?

সমীক্ষায় প্রাপ্ত উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখেন যে কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি **কর্ম-সন্তুষ্টি** (Job satisfaction) ও **অনুপ্রেরণা** সৃষ্টি করে এবং অন্য কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি কর্ম-অসন্তুষ্টি (Job dissatisfaction) সৃষ্টি করে। তিনি প্রথম প্রকার বিষয়গুলিকে **অনুপ্রেরণার উপাদান** হিসাবে চিহ্নিত করেন ও দ্বিতীয় প্রকার বিষয়গুলিকে **সংরক্ষণকারী উপাদান** হিসাবে চিহ্নিত করেন। হার্জবার্গ এই সমীক্ষা থেকে সিদ্ধান্তে আসেন যে কর্মসন্তুষ্টি সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাটি অসম্পূর্ণ। প্রচলিত ধারণা অনুসারে তৃপ্তি ও অতৃপ্তি বিষয় দুটি পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান করে। কিন্তু হার্জবার্গ দু'জোড়া পৃথক বিষয় সনাক্ত করেন এবং দেখান যে একটি জোড়া **তৃপ্তির উপস্থিতি** ও **তৃপ্তির অনুপস্থিতি** ও অন্য জোড়াটি **অতৃপ্তির উপস্থিতি** ও **অতৃপ্তির অনুপস্থিতি** গড়ে তোলে। প্রচলিত ধারণা অনুসারে তৃপ্তি-অতৃপ্তির মডেলটি কিভাবে হার্জবার্গ তুলে ধরেছিলেন তা পরের পাতায় তুলে ধরা হল :

**প্রচলিত মডেল :**

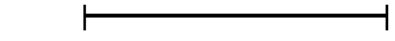

তৃপ্তি (Satisfaction) — অতৃপ্তি (Dissatisfaction)

**হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান মডেল :**

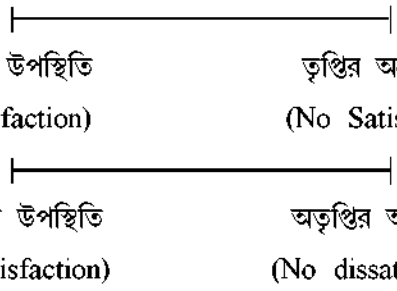


হার্জবার্গ বলেছেন যেসব বিষয়গুলি কর্মীর কাজের তৃপ্তির সাথে যুক্ত সেগুলিই হল **অনুপ্রেরণাকারী উপাদান** (motivating factor)। অন্যদিকে যেগুলি কাজের ক্ষেত্রে অতৃপ্তির সাথে যুক্ত তাদের অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেই। তিনি বিষয়গুলিকে **সংরক্ষণকারী উপাদান** (Hygiene factor or maintenance factor) বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে প্রথম প্রকারের বিষয়গুলি কর্মীর মধ্যে কর্মসন্তুষ্টি আনে তাই এগুলিকে **সন্তুষ্টি বিধানকারী** উপাদান বলা হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রকারের বিষয়গুলি **কাজের পরিবেশ** (Work environment) সম্পর্কিত বলে এদের **সংরক্ষণকারী উপাদান** বা **স্বাস্থ্য-উপাদান** হিসাবে গণ্য করা হয়। হার্জবার্গ এই দুই ধরনের উপাদানকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

**(1) স্বাস্থ্য বা সংরক্ষণকারী উপাদান (Hygiene or maintenance factors) :** এই বিষয়গুলিকে কাজের বাহ্যিক উপাদান (extrinsic factor) বলা হয়, কারণ এগুলি কাজের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়। হার্জবার্গ এগুলিকে কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে অতৃপ্তির কারণ বলে গণ্য করেছেন. কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলির প্রাচুর্য না থাকলে তাদের মধ্যে অতৃপ্তি (dissatisfaction) বা কর্ম-অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। অন্যদিকে যদি এগুলি যথেষ্টরূপে বর্তমান থাকে তাহলে তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি থাকে না বটে তবে সন্তুষ্টিও থাকে না। অর্থাৎ এগুলিকে **অনুপ্রেরণার** উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায় না। তাঁর মতে অসন্তুষ্টির কারণগুলি দূর করলেই তাদের মধ্যে সন্তুষ্টি আনা যায় না বা তাদের অনুপ্রাণিত করা যায় না। তিনি একটি তালিকার মাধ্যমে সংরক্ষণকারী উপাদানগুলিকে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছেন যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল :

(i) কোম্পানীর নীতি ও প্রশাসন,

(ii) প্রযুক্তিগত সম্পর্কের গুণগত মান,

(iii) আন্তঃ-ব্যক্তিক সম্পর্ক,

(iv) বেতন বা মজুরী,

(v) চাকুরীর নিরাপত্তা,

(vi) কাজের পরিবেশ,

(vii) কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা,

(viii) কাজের মর্যাদা,

(ix) ব্যক্তিগত জীবন ইত্যাদি।

**(2) অনুপ্রেরণাকারী উপাদান (Motivating factors) :** সংরক্ষণকারী উপাদানগুলি ছাড়াও কাজের ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি উপাদান রয়েছে যেগুলি কর্মীর কর্মসন্তুষ্টি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এগুলি কাজের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বলে এদেরকে **অন্তর্নিহিত উপাদান** (Intrinsic factor) বলা হয়। হার্জবার্গ এই বিষয়গুলিকেই **অনুপ্রেরণাকারী উপাদন** (Motivating factors) বলে গণ্য করেছেন। কাজের ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলি যদি যথেষ্ট পরিমাণে ও উন্নত মানে উপস্থিত না থাকে তাহলে কর্মীদের মধ্যে কর্মসন্তুষ্টি থাকে না। অন্যদিকে যদি এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ও উন্নত গুণমানে কাজের ক্ষেত্রে সরবরাহ করা যায় তাহলে কর্মীদের মধ্যে কর্ম-সন্তুষ্টি দেখা দেয়, তারা উদ্বুদ্ধ হয় ও উৎসাহিত বোধ করে এবং উচ্চ উৎপাদনশীলতার লক্ষ্যে তাদের প্রচেষ্টার প্রয়োগ ঘটায়। অবশ্য ব্যক্তিভেদে অনুপ্রেরণার উপাদানগুলি বিভিন্ন হয়। হার্জবার্গ একটি তালিকার মাধ্যমে অনুপ্রেরণাকারী উপাদানগুলি সন্নিবেশিত করেছেন। এগুলি হল :

(i) সাফল্য,

(ii) স্বীকৃতি,

(iii) দায়িত্ব গ্রহণ,

(iv) অগ্রগতি বা অগ্রগমন,

(v) সৃষ্টিশীল ও জটিল কাজ করার সুযোগ,

(vi) কর্মক্ষেত্রে উন্নয়নের সম্ভাবনা।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে হার্জবার্গ কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে এই দু'ধরনের উপাদানকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হিসাবে দেখিয়েছেন। এই দু'ধরনের উপাদানগুলি সম্পর্কে **গ্যানন** (M.J. Gannon) মন্তব্য করেছেন— "সংরক্ষণকারী উপাদানগুলি একজন কর্মীকে অসন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টিবিধান করতে পারে না। অন্যদিকে অনুপ্রেরণাকারী উপাদানগুলি কর্মীর অন্তর্নিহিত সন্তুষ্টিকে প্রভাবিত করে কিন্তু অসন্তুষ্টিকে নয়।" **রার্জবার্গের** দ্বি-উপাদান তত্ত্বের উপাদানগুলিকে চিত্রাকারে নীচে প্রকাশ করা হল :

**সংরক্ষণকারী উপাদান :**

| উচ্চ অসন্তুষ্টি | অসন্তুষ্টি নেই |
|---|---|
| ← | → |
| উপাদানগুলির অনুপস্থিতি | উপাদানগুলির উপস্থিতি |

**অনুপ্রেরণকারী উপাদান :**

| সন্তুষ্টি নেই | উচ্চ সন্তুষ্টি |
|---|---|
| ← | → |
| উপাদানগুলির অনুপস্থিতি | উপাদানগুলির উপস্থিতি |

**(3) ম্যাক্‌গ্রেগরের X-তত্ত্ব ও Y-তত্ত্ব**

**এলটন মায়ো** (E. Mayo) ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা হথর্ণ গবেষণা পরিচালিত করা ও পরবর্তীকালে **ফলেটের** (Miss Mary Parker Folett) মত মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানী ও দার্শনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর

প্রবর্তন ঘটান। বস্তুতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে শিল্প-ব্যবস্থাপনার উপর বিভিন্ন ধরনের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। এসব গবেষণার নেতৃত্ব দেন মূলতঃ মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা। ফলে ঐ সময়ে অনুপ্রেরণা ও সাফল্যের উপর বহু প্রবন্ধ, বই ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে **ম্যাকগ্রেগরের** (Douglas McGregor) তত্ত্বটি বিশেষ আলোড়ন তোলে। তিনি প্রথমে মানব প্রকৃতি ও মানবিক আচরণ সংক্রান্ত **X-তত্ত্বটি** প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বটি মূলতঃ কর্মী আচরণ সম্বন্ধে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গড়ে উঠেছিল। তত্ত্বটি প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ায় তিনি তাঁর দ্বিতীয় তত্ত্বটি অর্থাৎ **Y-তত্ত্বটি** প্রকাশ করেন। ১৯৬০ সালে তাঁর লেখা "The Human Side of the Enterprise" বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইতে তাঁর 'X-তত্ত্ব' ও 'Y-তত্ত্ব' স্থান পায়। এই তত্ত্বগুলিতে তিনি মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। ম্যাক্‌গ্রেগর বলেছেন মানব-প্রকৃতির দুটি দিক রয়েছে একটি **নেতিবাচক দিক** (Negative aspect) ও **অপরটি ইতিবাচক দিক** (Positive aspect)। তিনি মানুষের নেতিবাচক দিকগুলি X-তত্ত্বের মাধ্যমে ও ইতিবাচক দিকগুলি Y-তত্ত্বের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব ব্যবস্থাপকদের সাহায্য করে কারণ কর্মী কোন প্রকৃতির অন্তর্গত তা এই তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকরা জানতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের অনুপ্রেরণার ব্যবস্থা করেন। ম্যাক্‌গ্রেগরের তত্ত্ব দুটি একে অপরের বিকল্প হিসাবে গণ্য হয়। একটি মুদ্রাকে যদি মানুষের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে মুদ্রার যেমন দুটি পিঠ থাকে, তেমনি মানুষের প্রকৃতিও দু' ধরনের হয়। নীচে ম্যাক্‌গ্রেগরের তত্ত্ব দুটি নীচে আলোচনা করা হল :

- **X-তত্ত্ব (Theory X) :**

ম্যাক্‌গ্রেগরের X-তত্ত্বটি কর্মীদের প্রতি ব্যবস্থাপকদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি মানব প্রকৃতির নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের আচরণ সম্বন্ধে ম্যাক্‌গ্রেগরের অনুমানগুলি হল :

(1) স্বভাবগত ভাবে মানুষ হল অলস এবং দুর্বল,

(2) তারা কাজ করতে **অপছন্দ করে** এবং কাজ করতে চায় না বলে কাজ এড়িয়ে চলে।

(3) তারা কাজের ক্ষেত্রে বাধা পেতে চায়, **নির্দেশিত** ও **নিয়ন্ত্রিত** হতে চায়।

(4) মানুষকে পরিচালনা করতে হলে গাজর স্বরূপ বস্তুগত **পুরস্কারের** এবং বেত্রাঘাতের মত **শাস্তির** দরকার হয়। অর্থাৎ তাদের কাজে অনীহা থাকে বলে পুরস্কার দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করতে হয়।

(5) তারা নিজেদেরকে দায়িত্ব গ্রহণে অপারগ বলে মনে করে এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা মালিক বা ব্যবস্থাপকদেরই করতে হয়।

- **Y-তত্ত্ব (Theory Y) :**

মানব প্রকৃতির কেবলমাত্র নেতিবাচক দিকগুলি X-তত্ত্বের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য ম্যাক্‌গ্রেগর তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। তাই সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে এসে তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগে X-তত্ত্বের

বিপরীতমুখী একটি তত্ত্বের প্রবর্তন করেন এবং এর নাম দেন Y-তত্ত্ব। বস্তুতঃ এই তত্ত্বে মানুষের আচরণের প্রকৃত ও যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে এবং মানব প্রকৃতির ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। যেসব অনুমানের উপর নির্ভর করে ম্যাক্‌গ্রেগর এই তত্ত্বটি গড়ে তুলেছিলেন সেগুলি হল—

(1) মানুষ কর্মঠ, সম্পদশালী ও চিন্তাশীল।

(2) মানসিকভাবে প্রত্যেক মানুষের কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। পরিবেশ অনুকূল হলে কাজ তার কাছে খেলার মতোই আনন্দদায়ক বলে গণ্য হয়।

(3) উদ্দেশ্যের প্রতি দায়বদ্ধ হলে মানুষ আত্মনির্দেশ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ মেনে চলবে।

(4) আত্মনির্দেশনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ দায়িত্ব গ্রহণ ও উদ্দেশ্য সফল করতে চায়।

(5) কঠোর ব্যবস্থাপনামূলক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের রাশ আলগা করলে কর্মীরা তাদের দায়িত্ব পালনে ও উদ্দেশ্যসাধনে অধিক তৎপর হয়।

(6) কর্মীদের কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পুরস্কার ও তিরস্কারই একমাত্র উপায় নয়। এর জন্য তাদের সঠিক মাত্রায় অনুপ্রেরণার প্রয়োজন। চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের অনুপ্রাণিত করা সম্ভব।

ম্যাক্‌গ্রেগরের Y-তত্ত্বটি খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং প্রগতিশীল ব্যবস্থাপকরা এই তত্ত্বের প্রধান সমর্থক ছিলেন। কারণ এই তত্ত্ব মানব প্রকৃতির ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরে অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগের দিক্‌নির্দেশ সূচীত করেছিল। এই তত্ত্ব 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ' এই আপ্তবাক্যটিকে সার্থক করে তুলেছিল।

● **X-তত্ত্ব ও Y-তত্ত্বের মধ্যে তুলনা (Comparison between Theory X and Theory Y) :**

X-তত্ত্ব ও Y-তত্ত্বের মধ্যে তুলনা করলে প্রথমেই যে পার্থক্যটি চোখে পড়ে সেটি হল **X-তত্ত্বটি মানব প্রকৃতির নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরেছে,** অন্যদিকে **Y-তত্ত্বটি মানব প্রকৃতির ইতিবাচক দিকটি** তুলে ধরেছে।

## ৫.৭ সারাংশ

অনুপ্রেরণা হল কর্মীদের অন্তর্নিহিত ইচ্ছার প্রকাশ যার প্রতিফলন তাদের কর্ম সম্পাদনের উপর পড়ে। অনুপ্রাণিতকরণ কর্মীদের স্বেচ্ছায় তাদের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে। অনুপ্রেরণা কর্মীদের মধ্যে কর্ম-উদ্দীপনা তৈরি করে। অনুপ্রেরণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মানবিক সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের পথ প্রশস্থ হয় এবং উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়। এই এককটি পড়ে আমরা অনুপ্রেরণা সম্পর্কে এক সুন্দর ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হলাম।

## ৫.৮ অনুশীলনী

(১) অনুপ্রেরণার কিছু সংজ্ঞা দিন।

(২) অনুপ্রেরণার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

(৩) উদ্দেশ্যমুখী আচরণ বলতে কি বোঝেন?

(৪) অনুপ্রেরণার উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

(৫) অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝেন?

(৬) অনুপ্রেরণার তত্ত্বসমূহ আলোচনা করুন।

(৭) ম্যাক্‌গ্রেগরের X-তত্ত্ব ও Y-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

# একক ৬ ❑ নেতৃত্ব (Leadership)

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ নেতৃত্ব—অর্থ ও ধারণা

৬.৩.১ নেতৃত্বের সংজ্ঞা

৬.৩.২ নেতৃত্বের উপাদানসমূহ

৬.৪ নেতৃত্বের কার্যাবলী

৬.৫ নেতৃত্বশৈলী বা নেতৃত্বের ধরণ বা ভঙ্গী

৬.৬ নেতৃত্বের তত্ত্ব

৬.৭ সারাংশ

৬.৮ অনুশীলনী

## ৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- নেতৃত্বের অর্থ ও ধারণা
- নেতৃত্বের কার্যাবলী
- নেতৃত্বের ধরণ
- নেতৃত্বের তত্ত্ব

## ৬.২ প্রস্তাবনা

আদিম মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করল তখন থেকেই নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটেছে। দলের সদস্যরা তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী লোককে তাদের নেতা হিসাবে বেছে নিত এবং তার উপর দলের ভাল-মন্দের দায়িত্ব দিত। নেতার ইচ্ছানুসারেই তারা পরিচালিত হত এবং তার নির্দেশমতই বিভিন্ন সদস্য তাদের কাজে লিপ্ত থাকত। পরবর্তীকালে দল পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম-নীতির প্রচলন ঘটে। প্রথম দিকে দলের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী ও বলশালী বলে গণ্য হত তাকেই নেতা হিসাবে নির্বাচন করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে বুদ্ধিমান, দক্ষ, কৌশলী ব্যক্তির উপরেই নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয়। কারণ তারা ধীরে ধীরে অনুধাবন করল যে শারীরিক শক্তি নয়, জ্ঞান বা বুদ্ধিই হল সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। বস্তুতঃ আধুনিক

ব্যবস্থাপনার আত্মপ্রকাশ নেতৃত্বের হাত ধরেই ঘটেছে। কারণ প্রাচীন যুগে ও মধ্যযুগে নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য টানা হয়নি। নেতৃত্বকে অনুসরণ করেই ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি ঘটেছে।

## ৬.৩ নেতৃত্ব—অর্থ ও ধারণা

'নেতা' শব্দটি থেকেই 'নেতৃত্ব' কথার উদ্ভব ঘটেছে। দলকে পরিচালনার ক্ষেত্রে **নেতার ক্ষমতাকেই** নেতৃত্ব বলে। নেতৃত্ব হল নেতার অন্তর্নিহিত সেই অদৃশ্য শক্তি যা দলের সদস্যদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। নেতৃত্ব নেতা ও অনুগামীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। নেতার বিচক্ষণতা, সততা, অবিচলতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি ও অনুগামীদের বিশ্বাস, আস্থা ও আনুগত্যের মিলিত প্রভাবে নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। নেতৃত্ব হল সেই মানবিক গুণ যার দ্বারা দলের কোন সদস্য অন্য সদস্যদের নির্দেশ দেয়, পরিচালনা করে, নিয়ন্ত্রণ করে, পরামর্শ দেয়, সংকটে তাদের পাশে দাঁড়ায় ও পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এই গুণের জন্যই নেতা অপরের দ্বারা নির্দেশিত হয় না, পরিচালিত হয় না ও নিয়ন্ত্রিত হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যেসব **চারিত্রিক গুণের** কারণে একজন সদস্য দলের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে থেকেও আলাদা এবং মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের চেয়ে কিছুটা উঁচুতে অবস্থান করে তাকেই নেতৃত্ব বলে।

ব্যবস্থাপনামূলক কাজের মধ্যে কোটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল **'নেতৃত্বদান'**। প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যেহেতু কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়মমাফিক ও ঘরোয়া গোষ্ঠী বা দল তৈরি করে, তাই প্রতিটি দলের একজন দলপতি থাকে। এই দলপতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যকে কাজ সম্পাদনে নির্দেশ দেয় ও সাহায্য করে। কাজেই দলের উৎপাদনশীলতা দলপতি তথা দলের নেতার ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। কারণ দলের সদস্য হিসাবে একজন কর্মীর আচরণ যতটা না ব্যবস্থাপকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তার চেয়ে বেশী নিয়ন্ত্রিত হয় ঐ দলের যিনি নেতৃত্বদান করে থাকেন তাঁর ওপর। কর্মীদের সঠিক মাত্রায় অনুপ্রাণিত করতে ও উৎপাদনশীলতা সঠিক স্তরে বজায় রাখতে নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। তাই নেতৃত্বদান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুতঃ **নেতৃত্ব** হল প্রভাবিত ও কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা। নেতৃত্ব হল অনুগামীদের ওপর একধরনের প্রভাব বিস্তারের কাজ যার ফলে তারা স্বেচ্ছায় এবং উদ্যমের সাথে দলগত উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ নেতৃত্ব কেবলমাত্র কাজ করতে বলে না, আগ্রহ সহকারে কাজ করতে প্রভাবিত করে। তাই নেতৃত্বহীন সংগঠনকে কাণ্ডারীহীন তরণীর সাথে তুলনা করা হয়। নেতৃত্বের মাধ্যমে সম্ভাবনা বাস্তবে পর্যবসিত হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে, কর্মীদের কর্মদক্ষতার ৬০ শতাংশ যদি ব্যবস্থামূলক কাজের ওপর নির্ভরকরে তাহলে বাকী ৪০ শতাংশ নির্ভর করে নেতৃত্বের ওপর। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে নেতৃত্ব হল ব্যবস্থাপনার একটি হাতিয়ার যার সাহায্যে কর্মীদের পথ দেখানো হয়, চালনা করা হয়, নির্দেশ দেওয়া হয় ও দলনায়কের ভূমিকা পালন করা হয়। সাধারণভাবে নেতৃত্ব বলতে নেতৃত্বদানের কলা ও বিজ্ঞান উভয়কেই বোঝায়।

### ৬.৩.১ নেতৃত্বের সংজ্ঞা (Definition of Leadership)

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব একটি প্রাচীনতম শর্ত। আদি যুগে নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন সীমারেখা ছিল না। কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থাপনায় এদের মধ্যে প্রভেদের সীমারেখা টানা হয়েছে। **'নেতৃত্ব'** আধুনিক ব্যবস্থাপনার একটি উপাদান হিসাবে গণ্য হয় আর **'নেতৃত্বদান'** একটি ব্যবস্থাপনামূলক কাজ বলে চিহ্নিত হয়। নেতৃত্ব সম্পর্কে অনেক গবেষণা, অনেক আলোচনা ও অনেক সমীক্ষা এযাবৎ করা হয়েছে। আর সেজন্যই ব্যবস্থাপনার প্রামাণ্য গ্রন্থে নেতৃত্বের একাধিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নীচে তুলে ধরা হল :

**সমাজবিজ্ঞানের এনসাইক্লোপেডিয়ায়** (Encyclopedia of the social sciences) নেতৃত্বের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তা হল—"কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে একটি দল ও একজন ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং যে সম্পর্কের প্রভাবে ব্যক্তি যেভাবে স্থির করে বা নির্দেশ দেয় দলও সেভাবে আচরণ করে, সেই সম্পর্ককেই নেতৃত্ব বলে।"

**টেরী** (G.R. Terry) নেতৃত্ব সম্বন্ধে বলেছেন—"কর্মীরা যাতে পারস্পরিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে স্বেচ্ছায় প্রয়োগ করে সেজন্য তাদের প্রভাবিত করার কাজই হল নেতৃত্ব।"

**অ্যাপ্পেবী** (Robert C. Appleby) বলেছেন—"নেতৃত্ব হল নির্দেশনার উপায়। আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছার সাথে দলীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কর্মীদের প্রভাবিত করার কাজ-ই হল নেতৃত্ব।"

**কুন্‌জ** এবং **ও'ডোনেলের** (Koontz and O'Donnell) মতে—"সাধারণ উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে মানুষকে প্রভাবিত করাই হল নেতৃত্ব।"

**ডেভিস্** (Keith Devis) অত্যন্ত সুন্দরভাবে নেতৃত্বের সংজ্ঞাটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন—"উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অন্যকে দিয়ে পূরণ করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাই হল নেতৃত্ব। এটি হল একটি মানবিক বিষয় যা কোন দলকে একত্রিত করে উদ্দেশ্যসাধনে অনুপ্রাণিত করে।"

উপরের সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে যেসব বিষয় পাওয়া যায় সেগুলিকে একত্রিত করে বলা যায় যে, **নেতৃত্ব হল দলগত কাজের ক্ষেত্রে নির্দেশনা, পথনির্দেশ ও দলীয় সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী এমন এক প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি ও দলের মধ্যে এমন এক সম্পর্ক স্থাপতি হয় যা উভয়েরই উদ্দেশ্য পূরণ করে ও সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যও সাধিত হয়।**

## ৬.৩.২ নেতৃত্বের উপাদানসমূহ (Elements of Leadership)

নেতৃত্বের সংজ্ঞা থেকে নেতৃত্বের উপাদান সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। **কিথ ডেভিস** বলেছেন "উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অন্যকে দিয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করার ক্ষমতাই হল নেতৃত্ব"। সুতরাং প্রাথমিকভাবে নেতৃত্বের উপাদান হল দুটি—(1) অন্যকে অর্থাৎ অনুগামীকেপ্রভাবিত করা এবং (2) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূরণ। নেতৃত্বকে কলা হিসাবে গণ্য করা হলে এই দুটি উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করলে নেতৃত্বের অন্তর্গত উপাদানগুলি হল—(1) দল, নেতা ও অনুগামী, (2) পারস্পরিক সম্পর্ক, (3) যৌথ সাধারণ উদ্দেশ্য, (4) অনুপ্রাণিতকরণ এবং (5) পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থা। নিচে বিষয়টি আলোচিত হল—

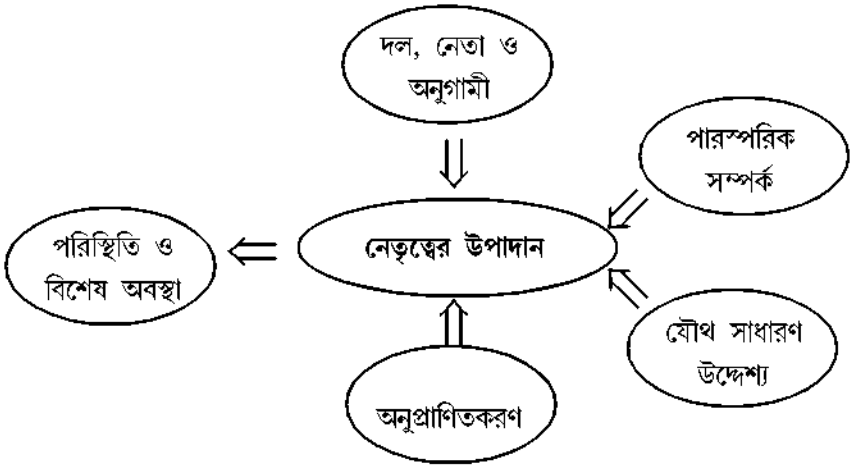

(1) **দল, নেতা ও অনুগামী (Group, leader and followers) :** নেতৃত্ব কেবলমাত্র দলবদ্ধ কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে কোন কাজ করে তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তির উপর বিভিন্নভাবে নির্ভর করতে শুরু করে ও তার আদেশ ও নির্দেশ দ্বিধাহীনভাবে মেনে চলে। দল থাকে বলেই দলের নেতা থাকে এবং দলের সদস্যরা ঐ নেতার অনুগামী হয়। আবার দলীয় নেতাকে ব্যবস্থাপক নেতৃত্ব প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিয়ে থাকেন যাতে দলীয় কার্যকলাপের ফলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়। সুতরাং দল, নেতা ও অনুগামী নেতৃত্বের উপাদান হিসাবে গণ্য হয়।

(2) **পারস্পরিক সম্পর্ক (Reciprocal relationship) :** নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের জোরেই নেতা দলের কর্মীদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। তাই পারস্পরিক সম্পর্কও নেতৃত্বের অন্যতম উপাদান হিসাবে গণ্য হয়।

(3) **যৌথ সাধারণ উদ্দেশ্য (Mutual common objectives) :** দল ও দলের কর্মীদের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যেই দল কাজ করে। তাই নেতৃত্ব দলের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্য যেমন পূরণ করে তেমনি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যও ফলপ্রসূ করে। অর্থাৎ নেতৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি যৌথ সাধারণ উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। আর একেই দলীয় উদ্দেশ্য বলে।

(4) **অনুপ্রাণিতকরণ (Motivation) :** নেতৃত্ব অনুগামীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। আর এই উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করার প্রক্রিয়াই হল অনুপ্রাণিতকরণ। তাই এটিও নেতৃত্বের একটি উপাদান।

(5) **পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থা (Particular situation) :** নেতৃত্ব সবসময় পরিস্থিতি সাপেক্ষ। তাই নেতৃত্বদান বিশেষ পরিস্থিতি বা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে।

আবার অনেকে মনে করেন যে নেতৃত্ব হল মূলতঃ চারটি বিশেষ ক্রিয়ার সংযুক্ত ফল। গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে নেতৃত্বকে তুলে ধরলে পাওয়া যায়—

$$L = f (F, G, W, S)$$

এখানে L নেতৃত্বকে (Leadership) সূচীত করে, f ক্রিয়াকে (function) সূচীত করে, F অনুগামী (followers), G উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (goal), W অনুগামীদের ইচ্ছা (willingness) ও S বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থাকে (situation) সূচীত করে।

আবার **কার্টার** (Carter) নেতৃত্বের পাঁচটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

(1) দলের সদস্যদের কোন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের অভিমুখী করা।

(2) নেতা অবশ্যই দলের সদস্যদের দ্বারা মনোনীত হবে।

(3) ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ নেতা দলকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করবে।

(4) নেতার অবশ্যই দলকে পরিচালনা করার যোগ্যতা থাকবে।

(5) নেতা অবশ্যই কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী হবে।

## ৬.৪ নেতৃত্বের কার্যাবলী (Functions of Leadership)

কারবারী ও সামাজিক যেকোন ক্ষেত্রে যেখানেই একাধিক ব্যক্তি কাজে নিযুক্ত থাকে সেখানেই নিয়মমাফিক (Formal) বা ঘরোয়া গোষ্ঠী (Informal) গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠী বা দলের যেমন বিশেষ ভূমিকা থাকে তেমনি দলভিত্তিক কাজের সাফল্য নির্ভর করে নেতৃত্বের ওপর। কারণ নেতৃত্বদান হল দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এবং তাদের সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণের ব্যবস্থা করা। নেতৃত্বই হল দলের চালিকাশক্তি, পথ প্রদর্শক, সাফল্যের চাবিকাঠি। নেতৃত্বের কাজ হল দলের সদস্যদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে সুসংহত করে দলীয় উদ্দেশ্যসাধনের দিকে পরিচালিত করা, কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা ও সমস্যাগুলি দূর করা, কাজের ভাল পরিবেশ গড়ে তোলা, তাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টি করা ইত্যাদি। যদিও নেতৃত্বের কাজ পরিস্থিতিভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়, তবুও কতকগুলি কাজকে মৌলিক কাজ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ সব ধরনের নেতৃত্বকেই সকল পরিস্থিতিতেই এই কাজগুলি সম্পন্ন করতে হয়।

**নেতৃত্বের কার্যাবলী**

- (1) দলীয় উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা
- (2) কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা
- (3) কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা
- (4) কর্মীদের বোঝা ও তাদের সহযোগিতা আদায় করা
- (5) কর্মীদের মধ্যে আস্থা গড়ে তোলা
- (6) সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রভাতি করা

**(1) দলীয় উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা (Determining group-goal) :** সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য স্থির করেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা বা উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকরা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য বিভাগীয় বা মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপকরা আবার নিজ নিজ বিভাগের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেন। তেমনি নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকরা কাজের রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মী দলের উদ্দেশ্য স্থির করে থাকেন। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনার কাজ ও নেতৃত্বের কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কোন প্রতিষ্ঠানই উদ্দেশ্যহীনভাবে তার কাজকর্ম চালাতে পারে না। তেমনি ব্যবস্থাপকরাও উদ্দেশ্যহীনভাবে তাদের কাজ করতে পারে না। আর কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে দলের সামনে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য না থাকলে দলীয় প্রচেষ্টাকে সুসংহত ও উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করা যায় না। তাই দলীয় কাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রাথমিক কাজ হল দলের উদ্দেশ্য স্থির করা ও ঐ উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে দলকে পরিচালিত করা।

**(2) কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা (Creation of work environment) :** কর্মীর কার্যসম্পাদন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এদের মধ্যে অন্যতম বিষয় হল কাজের পরিবেশ। কাজের পরিবেশ কর্মীদের পছন্দমত হলে তারা তাদের দৈহিক ও মানসিক প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করে দলীয় কাজে প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু কাজের পরিবেশ তাদের মনঃপূত না হলে তারা তাদের সামর্থ্যের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটায় না। সুতরাং নেতৃত্বের অন্যতম কাজ হল কাজের পরিবেশজনিত যেসব ত্রুটি বা বাধা থাকে সেগুলি দূর করে দলের কর্মীদের পছন্দসই পরিবেশ সৃষ্টি করা।

**(3) কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা (Motivating the workers) :** নেতৃত্বের কাজের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা। বস্তুতঃ নেতৃত্বের সাফল্য নির্ভর করে কর্মীদের কতটা অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয় তার ওপর। কারণ অনুপ্রাণিতকরণের মাধ্যমে কর্মীরা কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পায় ও স্বেচ্ছায় কাজে নিযুক্ত হয়। অনুপ্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে নেতা কর্মীদের ইচ্ছাশক্তিতে বিকশিত করে। ফলে তাদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা উভয়ই বৃদ্ধি পায় ও দলীয় উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়

**(4) কর্মীদের বোঝা ও তাদের সহযোগিতা আদায় করা (Understanding the workers and securing their co-operation) :** নেতৃত্বের অপর একটি কাজ হল কর্মীদের থেকে সহযোগিতা আদায় করা। কারণ দলীয় কাজে দক্ষতা আনতে হলে যেমন নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে সহযোগিতা থাকা দরকার তেমনি কর্মীদের নিজেদের মধ্যেও সহযোগিতা থাকা দরকার। পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে দলীয় সদস্যরা কাজে নিযুক্ত হলে কার্য সম্পাদনে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়। এর জন্য নেতৃত্ব ও অনুগামীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তুলতে হয়। অর্থাৎ কর্মীদের মানসিকতা অনুধাবন করে তাদের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলাও নেতৃত্বের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

**(5) কর্মীদের মধ্যে আস্থা গড়ে তোলা (Building confidence) :** কর্মীদের মধ্যে আস্থা গড়ে তোলাও নেতৃত্বের অন্যতম কাজ। আস্থা হল একধরনের মানসিক নির্ভরতা। অনুগামীদের মধ্যে আস্থা দু'ভাবে গড়ে তোলা হয়। **প্রথমতঃ** নেতৃত্ব অনুগামীদের মনে যে ভয়-ভীতি ও আশঙ্কা থাকে সেগুলি দূর করে তাদের আত্মবিশ্বাস বা নিজের প্রতি আস্থা গড়ে তোলেন। অন্যদিকে নেতৃত্বের ওপর যাতে তারা আস্থাশীল হয় তারও ব্যবস্থা করেন। কারণ অনুগামীদের কাছে নেতা পথ প্রদর্শক, দার্শনিক ও বন্ধু হিসাবে গণ্য হয়। তাই কর্মীদের আস্থা অর্জনে নেতা অনুগামীদের সমস্যাগুলির সমাধান করেন, প্রয়োজনমত পরামর্শ দেন, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে তাদের পাশে পাশে থাকেন,তাদের ব্যর্থতাকে নিজের মাথায় তুলে নেন ইত্যাদি। এভাবে তিনি অনুগামীদের আস্থা অর্জন করেন এবং এই আস্থার ফলে তারা দ্বিধাহীনভাবে তাদের কাজে মনোনিবেশ করতে পারে।

**(6) সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা (Influences the social system) :** সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীরই আনুষঙ্গিক উপাদান হল নেতৃত্ব। যে কোন মানব-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। তাই গোষ্ঠী ও নেতৃত্বের আলাদা সত্তা থাকে না। গোষ্ঠী বা দল না থাকলে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে না, আবার নেতৃত্ব ছাড়া দলের অস্তিত্ব ভাবা যায় না। যদি কোন সময় দলে নিয়মমাফিক নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয় তাহলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দলের সদস্যরা তাদের মধ্যে থেকে একজনের ওপর নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়। সবল নেতৃত্ব দলের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা, দূরদৃষ্টি ও কাজের স্পৃহা গড়ে তোলে। অন্যদিকে দুর্বল নেতৃত্ব দলের অসন্তোষজনক কাজের জন্য দায়ী থাকে। সামাজিক কাজগুলি মূলতঃ সামাজিক গোষ্ঠীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়, কারণ এই গোষ্ঠীগুলিকে নিয়েই সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে। আর এই গোষ্ঠীর সাফল্য নির্ভর করে নেতৃত্বের দক্ষতা ও কার্যকারিতার ওপর। তাই বলা হয় নেতৃত্ব সামাজিক ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে।

উপরের প্রধান প্রধান কাজগুলি ছাড়াও নেতৃত্বকে আরও অনেক কাজ করতে হয়। অবশ্য এই কাজগুলিও ওপরে আলোচিত কাজগুলির পরিসীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবুও অন্যান্য যেসব কাজ সাধারণভাবে নেতৃত্বকে করতে হয় সেগুলি হল—**পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণ, বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন, দলের ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করা, দায়িত্ব গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ, দৃষ্টান্ত স্থাপন, মধ্যস্থতা করা, কাজের দায়িত্ব বণ্টন করা ইত্যাদি।**

## ৬.৫ নেতৃত্বশৈলী বা নেতৃত্বের ধরণ বা ভঙ্গী (Leadership Types or Style)

নেতৃত্বশৈলী বা নেতৃত্বের ধরণ দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। একটি হল **নেতার আচরণ** এবং দ্বিতীয়টি হল **অবস্থা বা পরিস্থিতি**। নেতারাও অনুগামীদের মতই মানুষ ও তাদের আচরণ কখনো একরকম হয় না। তাই নেতাদের আচরণের ওপর নির্ভর করে এক-একধরনের নেতৃত্ব বা নৈতৃত্বশৈলী গড়ে উঠে। আবার পরিস্থিতি ভেদেও নেতৃত্বের ধরণ বিভিন্ন হয়। কারণ সব পরিস্থিতিতে একই ধরনের নৈতৃত্বশৈলী প্রয়োগ করা যায় না। তবে নেতৃত্বের ধরণ প্রধানতঃ নেতার আচরণ-নির্ভর। তাই নেতৃত্বের ভঙ্গী বা ধরণ বা শৈলী বলতে বোঝায় অনুগামীদের আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য নেতৃত্ব যে আচরণ করেন সেই আচরণ পদ্ধতি।

একটি দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বের ধরণকে দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়—(1) **কাজ-কেন্দ্রীক** (Work or task oriented) এবং (2) **কর্মী** বা **অনুগামী কেন্দ্রীক** (Employee or follwer-oriented)। প্রথম প্রকার নেতৃত্বে কর্মীদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে কর্মীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চিন্তা-ভাবনা, সমস্যা, অনুভূতি ইত্যাদির ওপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রকারের নেতৃত্বে কর্মীদের অভাব-অভিযোগ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অনুভূতি, সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাদের পরিচালনা করা হয়। অর্থাৎ এধরনের নেতৃত্ব সহানুভূতি সম্পন্ন হয়। অবশ্য বর্তমানে দ্বিতীয় পদ্ধতিটির ব্যবহারই বেশী হয়।

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বের ধরণকে আবার দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল—(1) **ব্যক্তিগত** (Personal) ও (2) **ব্যক্তি-নিরপেক্ষ** বা **অব্যক্তিক** (Impersonal)। প্রথম প্রকার নেতৃত্বের ধরণ অনুগামীদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে এবং দলের সদস্যদের সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ নেতা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে নেতৃত্বের কাজ সম্পন্ন করেন। অন্যদিকে নিরপেক্ষ বা অব্যক্তিক নেতৃত্বে অনুগামীদের সাথে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক সেভাবে গড়ে ওঠে না। অর্থাৎ যেক্ষেত্রে নেতা দূর থেকে অনুগামীদের নির্দেশ পাঠান সেক্ষেত্রে নেতৃত্বকে অব্যক্তিক বা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বলা হয়। এরূপ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে লিখিত নির্দেশের ওপর বেশী নির্ভর করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে কর্মীদের মনোবল ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কর্মীদের মনোবল ও উৎপাদনশীলতা সেভাবে বৃদ্ধি পায় না।

নেতৃত্বের উপরের ধরণগুলি সাধারণভাবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক ভাবে নেতৃত্বের তাত্ত্বিকরা যে বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের কথা বলেছেন সেগুলি নীচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল :

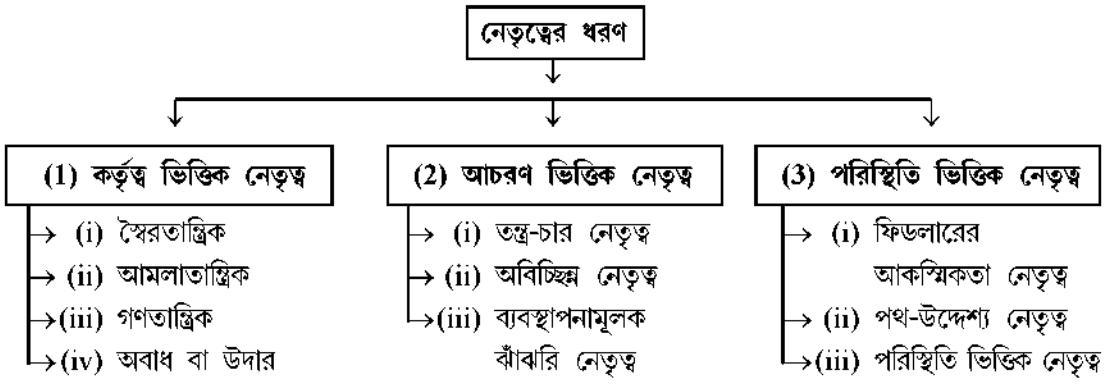


উপরের তালিকায় যতগুলি নেতৃত্বের ধরণ বা নেতৃত্বের মডেল স্থান পেয়েছে তার সবগুলি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ধরণগুলিই আলোচনা করা হল।

**(1) কর্তৃত্ব ভিত্তিক নেতৃত্বের ধরণ (Leadership style based on authority) :**

কর্তৃত্বের ভিত্তিতে নেতৃত্বকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন। এদের মধ্যে চার ধরনের নেতৃত্বই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। এগুলি নীচে আলোচনা করা হল :

**(i) স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Autocratic leadership) :** যেক্ষেত্রে নেতা মনে করেন যে তিনিই সর্বেসর্বা এবং তিনিই শেষ কথা বলবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই সবাইকে চলতে হবে সেক্ষেত্রে নেতৃত্বের ধরণকে **স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব** বলা হয়। এধরনের নেতৃত্বে সাধারণতঃ নেতা কারও পরামর্শ গ্রহণ করেন না, সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখেন এবং তিনি চান যে তাঁর অনুগামীরা নিঃশর্তে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে চলবে। এধরনের নেতৃত্ব পুরস্কার ও তিরস্কার তত্ত্বে বিশ্বাসী। অর্থাৎ শাস্তির ভয় দেখিয়ে বা পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে অনুগামীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চান। পুলিশ ও মিলিটারীতে এধরনের নেতৃত্ব দেখা যায়। হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব হিসাবে গণ্য হয়।

● **মূল্যায়ন (Evaluation) :** স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের **সুফলগুলি** হল—

(ক) নেতৃত্ব খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে ও সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ব্যবস্থা করতে পারে।

(খ) এরূপ নেতৃত্ব খুব অল্প পরিমাণে কর্তৃত্বের ভারার্পণ করে। অর্থাৎ এরা কর্তৃত্বের ভারার্পণ করতে পছন্দ করে না।

(গ) এরূপ নেতৃত্বে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। এতে নির্দেশের একতা বজায় থাকে।

(ঘ) উপযুক্ত ও দক্ষ ব্যক্তির হাতে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব খুব ভাল ফল দেয়। অন্যদিকে অযোগ্য, ক্ষমতালিপ্সু ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির হাতে এরূপ নেতৃত্ব পড়লে অচিরেই প্রতিষ্ঠানের বিনাশ ঘটে।

অন্যদিকে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের **কুফলগুলি** হল—

(ক) স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা যায় না এবং কর্মীদের মধ্যে অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

(খ) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর বলে কর্মীরা এধরনের নেতৃত্ব মেনে নিতে চায় না।

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্মীদের মতামতকে উপেক্ষা করা হয় বলে তাদের আনুগত্য সেভাবে গড়ে ওঠে না। ফলে কর্মীদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

**(ii) আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Bureaucratic leadership) :** নেতৃত্ব যখন নিয়মের বেড়াজালের মধ্যে বিচরণ করে তখন তাকে **আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব** বলে। এধরনের নেতৃত্ব নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি ও রীতি-নীতি মেনে চলতে ভালবাসে। অর্থাৎ এধরনের নেতৃত্ব নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক পদ্ধতির বাইরে এক পাও ফেলতে চায় না।এরা কাজ সম্পাদনের চেয়ে কাজের পদ্ধতির ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বকে তাই অব্যক্তিক, নিয়মসিদ্ধ ও যান্ত্রিক বলা হয়। সরকারী প্রশাসনে আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব খুব বেশী দেখা যায়। কারণ সরকারী আধিকারিক যাঁরা প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বদানের অধিকারী তাঁরা সরকারী নিয়ম-কানুন অনুসরণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ সরকারী নিয়ম অনুসারে যাতে কাজ সম্পাদন হয় সেদিকেই লক্ষ্য রাখেন এবং সেভাবেই কর্মীদের নির্দেশ দেন।

● **মূল্যায়ন (Evaluation) :** আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার জনক হলেন ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)। সরকারী প্রশাসনে আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব খুব বেশী দেখা যায়। এধরনের নেতৃত্বের **সুবিধাগুলি** হল নিম্নরূপ :

(ক) যেসব প্রতিষ্ঠানে নিয়মমাফিক প্রশাসন চালাতে হয় সেখানে এরূপ নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই।

(খ) এধরনের নেতৃত্ব নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি অনুসারে অধঃস্তন কর্মীদের নির্দেশ দেয় বলে কাজে ঝুঁকি কম থাকে।

(গ) আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কাজের পদ্ধতি একইরকম হয় বলে কাজ সম্পাদনে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

অন্যদিকে আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের অসুবিধাগুলি হল—

(ক) নিয়ম ও পদ্ধতির বজ্র আঁটুনির মধ্যে কর্মীদের কাজ করতে হয় বলে তাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব দেখা যায়। কর্মীদের মধ্যে একঘেঁয়েমি ও অনিচ্ছার ভাব দেখা দেয়।

(খ) কর্মীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা থাকে না। ফলে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটার সুযোগ থাকে না। এতে তাদের মনোবল নষ্ট হয়।

(গ) আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের আগাগোড়া লাল-ফিতার দৌরাত্ম্য দ্বারা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যেমন বিলম্ব ঘটে তেমনি কাজ সম্পাদনেও অনুরূপ বিলম্ব ঘটে। কারণ সবকিছুই নিয়ম-মাফিক হতে হবে, এর অন্যথা হলে চলবে না।

(ঘ) আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় কর্ম সম্পাদন পদে পদে বাধা পায়। ফলে কাজের গতিশীলতা নষ্ট নয়, কর্মীরা অলস ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে।

**(iii) গণতান্ত্রিক বা পরামর্শকারী নেতৃত্ব (Democratic or consultative leadership) :** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সকলের মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া এবং তাদের মতামতের ওপর গুরুত্ব প্রদান। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব হল সেই নেতৃত্ব যে অনুগামীদের সাথে আলোচনা করে, তাদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় এবং সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেকারণে এধরনের নেতৃত্বকে **পরামর্শকারী নেতৃত্ব** বা **অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব** (Participative) বলা হয়। এ ধরনের নের্তৃত্ব ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাস করে এবং প্রয়োজনমত কর্তৃত্বের ভারার্পণ করে। অনুগামীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নেতা সিদ্ধান্তগ্রহণ করে বলে এরূপ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দ্বি-মুখী জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যেক্ষেত্রে অনুগামীরা শিক্ষিত এবং যাদের স্বাধীন চিন্তাভাবনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকে সেক্ষেত্রে এধরনের নেতৃত্ব খুবই উপযোগী।

● **মূল্যায়ন (Evaluation) :** এধরনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যেসব **সুবিধা** পাওয়া যায় সেগুলি হল—

(ক) অনুগামীরা যেহেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামত জানাতে পারে তাই উচ্চমানের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।

(খ) অনুগামীদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে কর্মীদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, তাদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি গড়ে ওঠে ও মনোবল বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(গ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে দ্বি-মুখী জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা থাকার ফলে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয়, পরস্পর জানতে ও বুঝতে পারে। এর ফলে সৃজনশীল নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়।

(ঘ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে অনুগামীরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে। এর ফলে তাদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করা অনেক বেশী সহজ হয়।

(ঙ) এধরনের নেতৃত্বে সহকর্মীরাও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার হয়। ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হয় এবং তারা স্বেচ্ছায় কাজে যোগদান করে ও নেতার সাথে সহযোগিতা করে। এর ফলে প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়।

অন্যদিকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মধ্যে যেসব **অসুবিধা** দেখা দেয় সেগুলি হল—

(ক) এরূপ নেতৃত্বে অনুগামীদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। ফলে কর্মসম্পাদনও বিলম্বিত হয়।

(খ) অনুগামীরা শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান না হলে আলাপ-আলোচনায় বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না, সিদ্ধান্তের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটে না।

(গ) এরূপ নেতৃত্বে নির্দেশের নির্দিষ্টতার অভাব দেখা যায়। ফলে বহুক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব উপযোগী বলে গণ্য হয় না।

(ঘ) এরূপ নেতৃত্ব সকলের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। দায়িত্বের নির্দিষ্টতা না থাকায় অনেকে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

(ঙ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে অনেক সময়ই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা সম্ভব হয় না।

**(iv) অবাধ ও উদার নেতৃত্ব (Laissez-faire or free-rein leadership) :** অবাধ বা উদার নেতৃত্ব বলতে বোঝায় যখন নেতা দলীয় কাজে হস্তক্ষেপ করে না, অনুগামীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয় এবং দরকার হলে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়। এধরনের নেতৃত্বে অনুগামীরা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। তারা নিজেরাই সিদ্ধান্তগ্রহণ করে এবং কাজ সম্পাদন করে। অর্থাৎ নেতৃত্ব আর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে না বা অনুগামীদের নির্দেশদান থেকে বিরত থাকে। অনুগামীরা নিজেরাই লক্ষ্য স্থির করে ও লক্ষ্যপূরণের ব্যবস্থা করে। কেবলমাত্র অনুগামীরা যখন নেতার সাহায্য ও সহযোগিতা চায় কেবলমাত্র তখনই তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করে থাকেন।

● **মূল্যায়ন (Evaluation) :** অবাধ ও উদার নেতৃত্বের **সুফলগুলি** হল নিম্নরূপ :

(ক) এধরনের নেতৃত্ব কর্মীদের সর্বাধিক স্বাধীনতা দেয়। ফলে তাদের মধ্যে সন্তুষ্টি গড়ে ওঠে এবং তারা স্বেচ্ছায় কাজ করতে উৎসাহিত হয়।

(খ) কর্মীরা নিজেরাই উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী চূড়ান্ত করার সুযোগ পায়। ফলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে এবং নেতার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।

(গ) এধরনের নেতৃত্ব কর্মীদের যোগ্যতার উপর আস্থা প্রকাশ করে। এর ফলে তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয় এবং কাজ সম্পাদনে তারা অধিক যত্নবান হয়।

(ঘ) অবাধ নেতৃত্ব অনুগামীদের যোগ্যতা বৃদ্ধির সহায়ক হয় কারণ প্রত্যেকেই সিদ্ধান্তগ্রহণে ও কর্মসূচী প্রণয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এর ফলে তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।

অন্যদিকে অবাধ নেতৃত্বের **কুফলগুলি** হল নিম্নরূপ :

(ক) নেতৃত্বের অভাবে অনুগামীদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ বেশী গুরুত্ব পায়। ফলে দলীয় সংহতি ও ঐক্য সেভাবে গড়ে উঠে না।

(খ) এরূপ নেতৃত্ব, সব ধরনের কর্মীদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। যেসব কর্মী নেতার উপর নির্ভর করতে ভালবাসে তারা এধরনের নেতৃত্ব পছন্দ করে না।

(গ) কর্মীদের যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচী স্থির করার যোগ্যতা না থাকে তাহলে কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। ফলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

**(2) আচরণ-ভিত্তিক নেতৃত্বে ধরণ (Behaviour—based Leadership style) :**

যদিও নেতৃত্বের ধরণ প্রাথমিকভাবে নেতার নেতৃত্বদানের সামর্থ্য ও অনুগামীদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে তবুও অনেক গবেষক নেতাদের আচরণ কিভাবে নেতৃত্বের ধরণকে প্রভাবিত করে তা বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এদের মধ্যে তিনটি নেতৃত্বের ধরণ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। এগুলি হল : (ক) **লাইকার্টের** (Rensis Likert) **তন্ত্র-চতুরাংশ নেতৃত্ব**, (খ) **টনেনবম** (Robert Tonnenbaum) ও **স্মিদ্** (Warm Schmidt)-এর **অবিরাম** বা **অবিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব** (Continuum leadership) এবং (গ) **ব্লেক** (Robert R. Blake) ও **মাউটন্** (Jane S. Mouton)-এর **ব্যবস্থাপনার ঝাঁঝরি নেতৃত্ব বা ব্যবস্থাপনা শৃঙ্খল নেতৃত্ব** (Managerial Grid leadership) নীচে এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(ক) **লাইকার্টের তন্ত্র-চতুরাংশ নেতৃত্ব (Likert's system-four leadership) :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেনসিস লাইকার্ট** (Rensis Likert) ও তাঁর সহযোগী গবেষকরা নেতৃত্বের আচরণের ওপর প্রায় তিন দশক ধরে গবেষণা চালিয়েছিলেন। বহুসংখ্যক নেতৃত্বের আচরণ বিশ্লেষণ করে তাঁরা তন্ত্র চতুরাংশ তত্ত্বটির উদ্ভাবন করেন। তাঁরা নেতৃত্বকে চারটি তন্ত্রে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং বলেন যে এই প্রতিটি তন্ত্রে বা শ্রেণীতে কমপক্ষে সাতটি বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে। এই সাতটি বৈশিষ্ট্য হল—(i) অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য, (ii) জ্ঞাতকরণের বৈশিষ্ট্য, (iii) প্রভাবিতকরণের বৈশিষ্ট্য, (iv) সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈশিষ্ট্য, (v) উদ্দেশ্য নির্ধারণের বৈশিষ্ট্য, (vi) নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য এবং (vii) কর্ম সম্পাদনের বৈশিষ্ট্য।

- লাইকার্ট তাঁর তত্ত্বে চার ধরনের নেতৃত্বের উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকটিকে একটি তন্ত্র হিসাবে গণ্য করেছেন। এই চারটি তন্ত্র বা চার ধরনের নেতৃত্ব হল নিম্নরূপ—

**(1) তন্ত্র—1 বা শোষক কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্ব (Exploitative authoritative) :** এই শ্রেণীর নেতৃত্ব অনুগামীদের ওপর কোন গুরুত্ব প্রদান করে না। তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ভয় দেখিয়ে বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কর্মীদের কাজ করতে বাধ্য করে।

**(2) তন্ত্র—2 বা উদার কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্ব (Benevolent authoritative) :** এধরনের নেতৃত্ব অনুগামীদের বিশ্বাস করেন, তাদের ওপর নির্ভর করে কিন্তু তাদের নির্দেশ যাতে সঠিকভাবে মেনে চলা হয় তাও আশা করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্মীদের বক্তব্য এধরনের নেতৃত্ব শুনলেও সিদ্ধান্ত নেতা নিজেই নেয়। লাইকার্ট একে **'সদাশয় স্বৈরাচারী'** নামে অভিহিত করেছেন।

**(3) তন্ত্র—3 বা আলোচনাকামী নেতৃত্ব (Consultative leadership) :** এই ধরনের নেতৃত্ব অনুগামীদের বিশ্বাস করে, তাদের ওপর নির্ভর করে এবং তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেই

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এধরনের নেতৃত্ব দলের সমস্ত সদস্যদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। এছাড়াও অনেক সময় অনুগামীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও দেয়। নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত যাতে বিনা বাধায় রূপায়ণ হতে পারে তার জন্য তারা আগাম আলাপ-আলোচনার ওপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করে। আর এজন্যই এধরনের নেতৃত্বকে আলোচনাকামী নেতৃত্ব বা গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে।

**(4) তন্ত্র—4 বা অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব (Participative leadership) :** এই ধরনের নেতৃত্ব সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কর্মসম্পাদন উভয়ক্ষেত্রেই কর্মচারীদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করে। অর্থাৎ এরূপ নেতৃত্বে নেতা ও অনুগামীরা একটি গোষ্ঠী হিসাবে মিলেমিশে কাজ করে। লাইকার্ট ও তাঁর সহযোগীরা মনে করেন যে এই ধরনের নেতৃত্ব সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করে। অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে তাঁদের এই দাবী পুরোপুরি সত্য বলে গণ্য হয় না।

(খ) **অবিচ্ছিন্ন বা অবিরাম নেতৃত্ব (Continuum leadership) :** ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা নেতৃত্ব বা নেতৃত্বদানকে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করেন। নেতৃত্বের আচরণের ওপর নির্ভর করে **টনেনবম** (Robert Tannenbaum) ও **স্মিদ্** (Warran Schmidt) 1958 সালে নেতৃত্বের অবিরাম তত্ত্বটির প্রবর্তন করেন। তাঁরা নেতৃত্বকে একটি অবিরাম শৈলী হিসাবে গণ্য করেন। তাঁরা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক নেতৃত্বকে অনুসরণ না করে এবং কোনটিকেই শ্রেষ্ঠ আখ্যা না দিয়ে যেটি সুবিধাজনক বলে মনে হবে সেটিই গ্রহণ করার সুপারিশ করেছিলেন। এই ধরনের নেতৃত্বে ধারনা করা হয় যে স্বৈরতান্ত্রিক ও অবাধ নেতৃত্বের মধ্যবর্তী স্তরে নেতৃত্বের প্রসার ঘটে। অবিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করতেন যে নেতৃত্বের ধরণ নেতা, অনুগামী ও অবস্থার ওপর নির্ভর করে। যেসব উপাদান নেতৃত্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলি হল—

(1) **নেতার** ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ, অনুগামীদের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস, বিশেষ পরিস্থিতিতে তার মানসিক অবস্থা ইত্যাদি।

(2) **অনুগামীদের** দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্তগ্রহণের অংশগ্রহণের প্রত্যাশা, স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছা ইত্যাদি।

(3) **পরিস্থিতি** সংক্রান্ত উপাদানগুলি হল সংগঠনের ধরণ, দলের কার্যকারিতা, সমস্যার প্রকৃতি, পরিস্থিতির চাপ ইত্যাদি।

বস্তুতঃ অবিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব তত্ত্বের প্রবক্তাগণ **সাত ধরনের** নেতৃত্বের উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি নেতৃত্বের ধরণ সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নেতার স্বাধীনতার মাত্রা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় এবং শেষ হয় অবাধ নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ সিদ্ধান্তগ্রহণে অনুগামীদের স্বাধীনতা সর্বাধিক করার মধ্য দিয়ে। অন্যভাবে বলা যায় যে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের ধরণ ও অবাধ নেতৃত্বের ধরনের মধ্যে আরও পাঁচ ধরনের নেতৃত্ব পরিস্থিতি ভেদে দেখা যায়। অর্থাৎ নেতৃত্বের ধরণ অত্যধিক **নেতা-কেন্দ্রীক** (leader-centred) আচরণ থেকে অত্যধিক **অনুগামী-কেন্দ্রীক** (follower-centred) হয়। আর এই দুইয়ের সংযোগকারী রেখার ওপর সম্ভাব্য নেতৃত্বের ধরণগুলি অবস্থান করে। এই তত্ত্বে যে সাতটি সম্ভাব্য নেতৃত্বের ধরণ তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি হল—

(1) নেতা (ব্যবস্থাপক) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অনুগামীরা (কর্মীরা) তা মেনে নেয়। অর্থাৎ এটি হল **স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব** (autocratic leadership)।

(2) নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অনুগামীদের কাছে সিদ্ধান্ত **'বিক্রয়'** (sell) করেন। এখানে বিক্রয় করার অর্থ হল অনুগামীরা অল্প পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করে। অর্থাৎ এটি হল কম মাত্রায় স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Sleak autocratic)।

(3) নেতা ধারনা উপস্থাপন করেন এবং অনুগামীদের মতামত চান। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করেন। অর্থাৎ এটি হল **উদার স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব** (Benevolent authoritarian leadership)।

(4) ব্যবস্থাপক সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত অনুগামীদের কাছে উপস্থাপন করেন যা' পরিবর্তনযোগ্য। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুগামীদের মতামতকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই একে **অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব** (Participative leadership) বলা হয়।

(5) নেতা অনুগামীদের কাছে সমস্যা তুলে ধরেন, তাদের সাথে পরামর্শ করেন ও তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এধরনের নেতৃত্বকে **পরামর্শমূলক নেতৃত্ব** (Consultative leadership) বলা হয়।

(6) নেতা অনুগামীদের মধ্যে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেন যে সীমার মধ্যে তারা ছোটখাট সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করতে পারে। তবে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা থাকলেও সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রয়োজন হয়। তাই এধরনের নেতৃত্বকে **গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব** (Democratic leadership) বলা হয়।

(7) অবিচ্ছিন্ন নেতৃত্বের শেষ ধরণটি হল অবাধ বা উদার নেতৃত্ব (free-rein leadership)। এরূপক্ষেত্রে নেতৃত্ব অনুগামীদের একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ সম্পাদনের অনুমতি দেন। ঐ সীমার মধ্যে অনুগামীরা সর্বাধিক স্বাধীনতা ভোগ করে এবং নেতা তাদের কাজে অহেতুক হস্তক্ষেপ করে না।

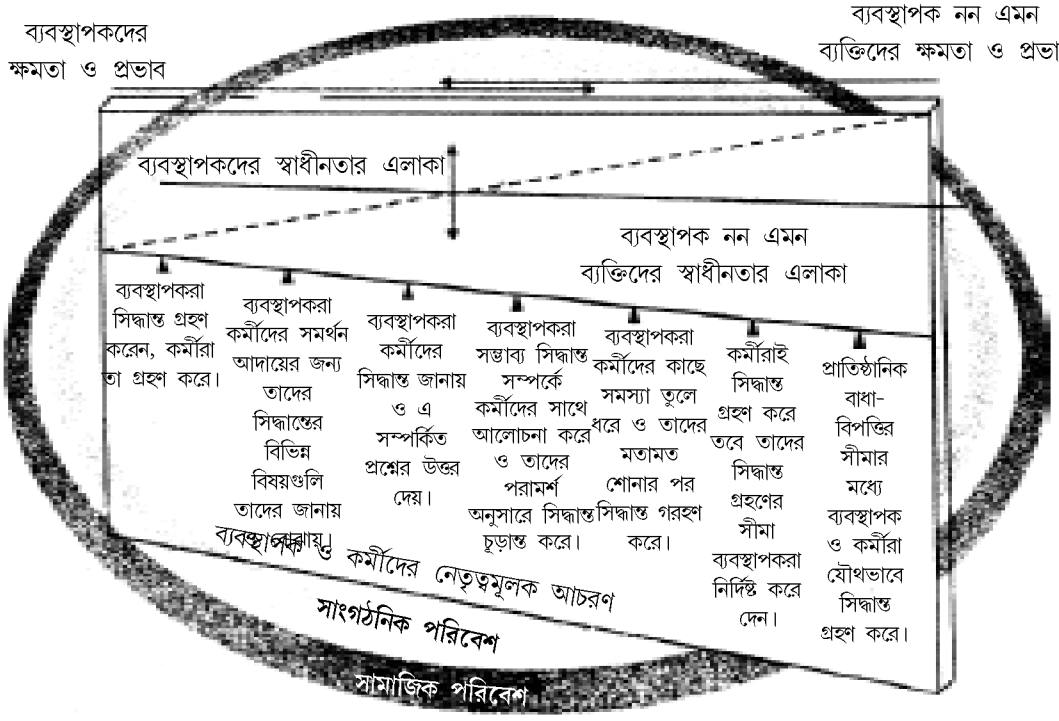

**টানেনবম্** ও **স্মিদ্** 1958 সালে তাঁদের অবিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব তত্ত্বের অন্তর্গত উপরোক্ত নেতৃত্বের ধরণগুলিকে একটি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু 1973 সালে তাঁরা তাঁদের মডেলের পুর্নমূল্যায়ন করেন এবং নেতৃত্বের ধরনের উপর সামাজিক ও সাংগঠনিক পরিবেশের প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করেন। অর্থাৎ নেতৃত্বের ধরণ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর এজন্য তাঁরা তাঁদের প্রাথমিক চিত্রের চতুর্দিকে দুটি বৃত্তের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংগঠনিক পরিবেশকে তুলে ধরেন। এই পরিবেশের মধ্যে শ্রমিক সংঘ, সামাজিক দায়িত্ব, নাগরিক অধিকার রক্ষা আন্দোলন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইত্যাদি স্থান পায়। এর ফলে নেতৃত্বের ধরনের মধ্যে পরিবেশ বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

(গ) **ব্যবস্থাপনার ঝাঁঝরি নেতৃত্ব (Managerial Grid Leadership) :** বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে (1950-1960) নেতৃত্বের ধরণ সংক্রান্ত যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালানো হয়েছিল তারই ফলস্বরূপ নেতৃত্বের এই তত্ত্বটির উদ্ভব ঘটে। **ব্লেক** (Robert R. Blake) ও **মাউটন** (Jane S. Mouton) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ঝাঁঝরি বা শৃঙ্খলের অবতারণা করেন। তাঁদের মতে নেতৃত্ব কোন একটি বিশেষ দিক বা আচরণের ওপর নির্ভর করে না। তাঁরা নেতার আচরণের দুটি মৌলিক দিক বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থাপনার ঝাঁঝরি নেতৃত্ব তত্ত্বটি গড়ে তোলেন। এই দুটি দিক হল—(i) **উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ** ও (ii) **কর্মীদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ।** প্রথম প্রকার আচরণকে তাঁরা নেতৃত্বের **কর্মমুখী** (task-oriented) আচরণ ও দ্বিতীয় প্রকার

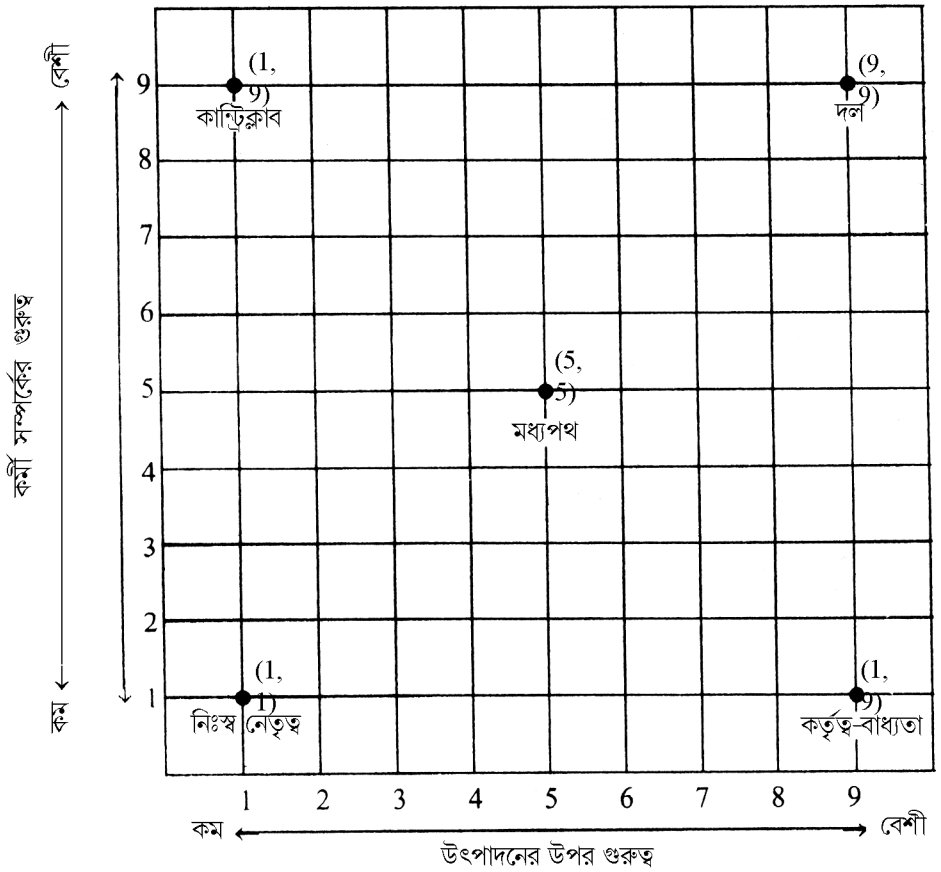

আচরণকে **কর্মীমুখী** (employee-oriented) আচরণ বা **সম্পর্কমুখী** (relationship-oriented) আচরণ আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, নেতৃত্বের ধরণ বা ভঙ্গী নির্ভর করে নেতার মধ্যে এই দুই আচরণের মিশ্রণের মাত্রার ওপর। ঝাঁঝরি তত্ত্বে পাঁচপ্রকার নেতৃত্বের ভঙ্গী বা ধরনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা নেতৃত্বের আচরণের এই দুটি দিক একটি **লেখচিত্রের** (Graph) মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। **এর উলম্ব অক্ষটি কর্মীসম্পর্কের ওপর গুরুত্বদানের মাত্রা প্রকাশ করে এবং অনুভূমিক অক্ষটি উৎপাদনের ওপর গুরুত্বদানের মাত্রা প্রকাশ করে।** এছাড়াও তাঁর এই Grid-এ গুরুত্বদানের মাত্রা প্রকাশের জন্য লেখচিত্রে 9 টি ঘর নিয়েছেন অর্থাৎ এদের মান সবচেয়ে কম। ও সর্বাধিক 9 হতে পারে। তাঁদের প্রকাশিত Grid-এ তাঁরা নেতৃত্বের **পাঁচটি ধরণ** তুলে ধরেছেন যেটি আগের পাতার চিত্রের অনুরূপ :

আগের পাতার চিত্রে যে পাঁচ ধরনের নেতৃত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল :

**(1) নিঃস্ব নেতৃত্ব (Impoverished leadership) :** এধরনের নেতৃত্বের ধরণকে নিঃস্ব নেতৃত্ব বলে। কারণ এধরনের নেতারা কর্মীদের সম্পর্কের ওপর গুরুত্বদানের ক্ষেত্রে যেমন নিস্পৃহ, তেমনি উৎপাদনের প্রতি গুরুত্বদানের ক্ষেত্রেও তাঁদের কোন আগ্রহ দেখা যায় না। নেতৃত্বের আচরণের উভয় উপাদানই অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয় যার জন্য এরূপ নেতৃত্বের অবস্থানের **স্থানাঙ্ক হল (1, 1)**। সেজন্য এধরনের নেতৃত্বকে নিঃস্ব নেতৃত্ব বলে অর্থাৎ নেতৃত্বের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করা নিরর্থক। এরূপক্ষেত্রে নেতৃত্ব তার কার্যকারিতা হারায় এবং কেবলমাত্র যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসাবে গণ্য হয়। যেসব ব্যবস্থাপক তাদের পদ বা অবস্থানের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট তাদের মধ্যে এধরনের নেতৃত্ব গড়ে ওঠে.

**(2) কান্ট্রি ক্লাব নেতৃত্ব (Country club leadership) :** যেসব নেতা মানবিক সম্পর্কের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে অনুগামীদের পরিচালনা করেন এবং উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন না তাঁদের নেতৃত্বের ধরণকে কান্ট্রি ক্লাব নেতৃত্ব বলা হয়। এধরনের নেতৃত্বের দর্শন হল অনুগামীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখ, সেগুলি পূরণ কর ও তাদের সন্তুষ্ট কর। এধরনের নেতৃত্ব কর্মীদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে ও সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে সদাসতর্ক থাকে। এরা চাপদিয়ে অনুগামীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করার ঘোর বিরোধী। এরূপ নেতৃত্বের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস থাকে এবং অনুগামীদের উপর খুব ভাল নিয়ন্ত্রণ থাকে। লেখচিত্রে এধরনের নেতৃত্বের **স্থানাঙ্ক মান হল (1, 9)**।

**(3) কর্তৃত্ব-বাধ্যতা নেতৃত্ব বা কর্মভিত্তিক নেতৃত্ব (Authority-obedience or functional leadership) :** এধরনের নেতৃত্বকে **স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বও** বলা হয়। কারণ এরা উৎপাদনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় এবং কর্মীদের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মী-সম্পর্কের ওপর ন্যূনতম গুরুত্ব দেয়। ব্যবস্থাপনার ঝাঁঝরিতে এদের অবস্থান অনুভূমিক অক্ষের শেষ প্রান্তে এবং **স্থানাঙ্ক মান (9, 1)**। এধরনের নেতৃত্ব কাজ সম্পাদনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সেজন্য কর্মী-দক্ষতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। অর্থাৎ এধরনের নেতৃত্বে মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ প্রয়োগ ঘটে না। এধরনের নেতৃত্ব কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে ভয়-ভীতির প্রয়োগ করে, কঠোরভাবে পরিদর্শনের কাজ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মীদের খুবই সামান্য সুযোগ দেয়। এধরনের নেতৃত্ব কর্মীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে।

(4) **মধ্যপথ নেতৃত্ব (Middle-of-the-road leadership) :** এই ধরনের নেতৃত্ব উৎপাদনের দিকটি যেমন বিবেচনা করে তেমনি কর্মী সম্পর্কের বিষয়টিও বিবেচনার মধ্যে রাখে। অর্থাৎ নেতৃত্বের আচরণ উভয় উপাদানের উপরই গুরুত্ব দেয়, কোন উপাদানকেই অগ্রাহ্য করে না। নেতৃত্বের ঝাঁঝরিতে (Grid) এধরনের নেতৃত্বের অবস্থানজনিত **স্থানাঙ্ক মান (5, 5)**। **উদার স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বকে** (benevolent autocratic leadership) মধ্যপথ নেতৃত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। এরা কাজ করানোর সময় কর্মীদের সাথে যেমন কর্তৃত্বমূলক আচরণ করে তেমনি কর্মী-সম্পর্ককেও যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। এধরনের নেতৃত্বে অনুগামী ও নেতার মধ্যে ভাল সম্পর্ক যেমন থাকে তেমনি কর্মীদের মধ্যেও সন্তুষ্টি থাকে।

(5) **দলভিত্তিক নেতৃত্ব (Team leadership) :** **ব্লেক** (Blake) ও **মাউটন** (Mouton) নেতৃত্বের যে চতুর্ভুজটি (Quadrant) গড়ে তুলেছেন তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব অবস্থান করে। তবে এদের মধ্যে আদর্শ অবস্থান হল যে নেতৃত্বের **স্থানাঙ্ক মান (9, 9)** হয়। অর্থাৎ এরূপ নেতৃত্ব উৎপাদন ও অনুগামী সম্পর্ক উভয়ের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তারা প্রকৃতপক্ষেই দলের নেতা হিসাবে গণ্য হয়। এধরনের নেতৃত্ব কর্মীদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও দলীয় উদ্দেশ্যকে সুসংহত করে এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে তাদের পরিচালিত করে। এর ফলে যেমন কর্মীদের কাজে যোগদান ও তৃপ্তিসাধন সর্বাধিক হয় তেমনি উৎপাদনও সর্বাধিক করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ এরূপ নেতৃত্বে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সাথে উৎপাদনের প্রয়োজনকে মেলানো সম্ভব হয়।

**ব্লেক** ও **মাউটনের** ঝাঁঝরি তত্ত্ব নেতৃত্বের ধরণ বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই তত্ত্বেও তাঁরা নেতৃত্বের বিভিন্ন মিশ্রণের (blend) ওপর দৃষ্টি দিয়েছেন। এটি বিভিন্ন নেতৃত্বের ধরণ সনাক্ত করতে ও সাথে সাথে ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণের একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে তাঁদের এই তত্ত্বে যে একটি ত্রুটি লক্ষ্য করার যায় সেটি হল যে নেতৃত্বের ধরণ ঝাঁঝরি বা চতুর্ভুজের চারটি বিন্দুর মধ্যেই কেন আবদ্ধ থাকে তার কারণ বিশ্লেষণ করেননি।

**(3) পরিস্থিতিনির্ভর নেতৃত্ব (Situational Leadership) :** বিগত শতকের শেষ দিকে অর্থাৎ সত্তরের দশক থেকে নেতৃত্বের উপর যেসব গবেষণা বিভিন্ন গবেষণাবিদ্ চালিয়েছিলেন, তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে নেতৃত্বের ধরণ কেবলমাত্র নেতার কর্তৃত্ব বা আচরণের ওপরই নির্ভর করে না। পরিস্থিতিও নেতৃত্বের ধরণ গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করে। পরিস্থিতিনির্ভর নেতৃত্বে **অনুগামী** বা **কর্মীদল কাজের ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা** ও **কাজের পরিবেশ** এই তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে, কারণ এগুলিই নেতৃত্বের ধরণকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে। এই তত্ত্বে বলা হয় যে সবক্ষেত্রে নেতৃত্বের ধরণ এক হয় না। পরিস্থিতিভেদে নেতৃত্বের ধরনের পরিবর্তন হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে নেতৃত্বের কোন একটি বিশেষ ভঙ্গী বা ধরণ সর্বোত্তম বলে গণ্য করা হয় না। পরিস্থিতিনির্ভর নেতৃত্বের যেসব মডেল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সেগুলি হল—

(i) **ফিডলার** (Fred Fiedler) আকস্মিকতা নেতৃত্ব তত্ত্ব;

(ii) **হাউসের** (Robert House) পথ-উদ্দেশ্য নেতৃত্ব; ও

(iii) **হারসী** (Hrsey) ও **ব্লানচার্ড** (Blanchard)-এর পরিস্থিতিনির্ভর নেতৃত্ব।

## ৬.৬ নেতৃত্বের তত্ত্ব (Theories of Leadership)

নেতৃত্বের প্রধান চারটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হল :

**1. নেতৃত্বের প্রতিভাগত তত্ত্ব (Trait theory of leadership) :**

1940 দশকে নেতৃত্বের অধিকাংশ তত্ত্বই ছিল কোন নেতৃত্বের প্রতিভার অনুসন্ধান করা। মনস্তত্ত্ববিদ এবং গবেষকদের প্রধান কাজই ছিল নেতৃত্বের প্রতিভার অনুসন্ধান করা কারণ এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলা হয় যে নেতৃত্ব অবশ্যই কতকগুলি ব্যক্তিত্বের অধিকারী আর ব্যক্তিত্বের এই প্রতিভা তার জন্মগত প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিছু কিছু গবেষক তাদের গবেষণার মাধ্যমে চেষ্টা করেছেন নেতৃত্বের বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিভাগুলিকে চিহ্নিত করতে। র‍্যাল্‌ফ এম. স্টকডিল (Ralph M. Stogdill), তার গবেষণায় দেখেছেন যে সকল গবেষকগণই নেতৃত্বের ক্ষমতা সম্পর্কে কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রতিভার কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রতিভাগুলো হল দৈহিক, মেধা ও কার্যক্ষমতা এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং কাজ সম্পর্কিত। দৈহিক প্রতিভা আবার পাঁচ প্রকার, উদাহরণস্বরূপ চেহারা, শক্তি, উচ্চতা ইত্যাদি। মেধা এবং কার্যক্ষমতাগত প্রতিভা আবার অনেক ধারণা, যেমন গ্রহণ করার ক্ষমতা, উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস, এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি। সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত প্রতিভা হল একে অপরের সাথে সম্পর্ক রক্ষার দক্ষতা, সহযোগিতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা ইত্যাদি। কাজ সম্পর্কিত প্রতিভা হল উদ্যোগ, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, লক্ষপ্রাপ্তি ইত্যাদি।

সাধারণভাবে এই তত্ত্ব বিশেষ সফল তত্ত্ব হিসেবে পরিগণিত নয় কারণ সব ব্যক্তি একই প্রতিভার অধিকারী হননা। তবে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিভার অধিকারী হন।

**2. আচরণগত তত্ত্ব (Behavioural Theory) :**

যদিও নেতৃত্বের ধরণ প্রাথমিকভাবে নেতার নেতৃত্বদানের সামর্থ, প্রতিভা ও অনুগামীদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে তবুও অনেক গবেষক নেতাদের আচরণ কিভাবে নেতৃত্বের ধরণকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে গবেষণা করে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই গবেষণালব্ধ নেতৃত্বের ধরণগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনটি নেতৃত্বের ধরণ হল : (ক) রেনসিস লাইকার্টের তন্ত্র-চতুরাংশ নেতৃত্ব, (খ) টনেনবম ও স্মিদ্ এর অবিরাম নেতৃত্ব, এবং (গ) ব্লেক ও মাউটন এর ব্যবস্থাপনা শৃঙ্খল নেতৃত্ব।

**3. পরিস্থিতি নির্ভর তত্ত্ব (Contingency on Situational Theories) :**

সত্তরের দশক থেকে নেতৃত্বের উপর যেসব গবেষণা বিভিন্ন গবেষণাবিদ চালিয়েছিলেন তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে নেতৃত্বের ধরণ কেবলমাত্র নেতার কর্তৃত্ব বা আচরণের উপরই নির্ভর করেনা, পরিস্থিতিও নেতৃত্বের ধরণ গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করে। পরিস্থিতি নির্ভর নেতৃত্বে অনুগামী বা কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা ও কাজের পরিবেশ এই তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে কারণ এগুলিই নেতৃত্বের ধরণকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে। এই তত্ত্বে বলা হয় যে সবক্ষেত্রে নেতৃত্বের ধরণ এক হয় না, পরিস্থিতি অনুযায়ী তা পরিবর্তন সাপেক্ষ।

**4. স্থানান্তকরণ তত্ত্ব (Transformational Theory) :**

সম্প্রতি এটা লক্ষ্য করা গেছে যে ম্যানেজাররা সর্বদা নেতা নন। ম্যানেজাররা ঠিক কাজ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু নেতারা আবিষ্কার করবেন আবার ঠিক কাজ করবেন। নেতারা প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন আর তার অনুগামিদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। বিশিষ্ট জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনায় নেতার এই বিশেষ গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। নতুন নতুন জিনিষ উদ্ভাবন এবং তার যথার্থ প্রয়োগকে ওয়েবার নেতৃত্বের বিশেষ গুণ বলে উল্লেখ করেছেন। উদ্ভাবন এবং তার প্রয়োগকেই স্থানান্তকরণ তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

## ৬.৭ সারাংশ

প্রাচীনকালে মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করল তখন থেকেই নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটেছে। দলের সদস্যরা তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিকে নেতা হিসেবে বেছে নিত এবং এই নেতার নির্দেশেই পরিচালিত হত। কিন্তু পরবর্তীকালে বুদ্ধিমান, শিক্ষিত এবং দক্ষ ব্যক্তির উপরেই নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয়, কারণ বর্তমান শারীরিক শক্তি নয়, জ্ঞান বা বুদ্ধিই হল সব থেকে বেশী শক্তিশালী। তাই এই এককটি পড়ে আমরা নেতৃত্ব সম্পর্কে এক সার্বিক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হলাম।

## ৬.৮ অনুশীলনী

(১) নেতৃত্বের কিছু সংজ্ঞা প্রদান করুন।

(২) নেতৃত্বের উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) নেতৃত্বের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

(৪) নেতৃত্বশৈলী বলতে কি বোঝেন? ব্যাখ্যা করুন।

(৫) পরিস্থিতি ভিত্তিক নেতৃত্ব এবং আচরণ ভিত্তিক নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

(৬) নেতৃত্বের বিভিন্ন তত্ত্বগুলো ব্যাখ্যা করুন।

(৭) ব্যবস্থাপনার ঝাঁঝারি নেতৃত্ব বলতে কি বোঝেন?

# একক ৭ ❑ সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ (Coordination and Control)

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ সমন্বয় বা সংযোজনা

৭.৩.১ সমন্বয় বা সংযোজনা—সংজ্ঞা

৭.৩.২ সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য

৭.৪ সমন্বয়ের কৌশলসমূহ

৭.৫ নিয়ন্ত্রণ

৭.৫.১ নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা

৭.৫.২ নিয়ন্ত্রণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

৭.৬ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

৭.৭ নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ

৭.৮ সারাংশ

৭.৯ অনুশীলনী

## ৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি সুন্দর ধারণা পাবেন—

- সমন্বয় বলতে কি বোঝায় এবং তার বৈশিষ্ট্য
- সমন্বয়ের বিভিন্ন কৌশলগুলি
- নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত অর্থ কি, কি তার বৈশিষ্ট্য এবং নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহ
- নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রকারভেদ

## ৭.২ প্রস্তাবনা

ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া এবং গোষ্ঠীবদ্ধ কাজ। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের কাজগুলি যাতে সঠিকভাবে সম্পাদন করে বা করতে পারে তার ব্যবস্থা করাই হল ব্যবস্থাপনার কাজ। কারণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মীগোষ্ঠী দলীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই বিভিন্ন কাজ করে। আবার প্রতিষ্ঠানের আকার ও আয়তনের উপর কর্মীগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ভর করে। শ্রমবিভাজনের নীতি অনুসারে প্রতিটি কর্মীদল এক একটি বিশেষ কাজের

দায়িত্ব পায়। প্রতিটি কর্মীগোষ্ঠী বা কর্মীদল তাদের দলীয় উদ্দেশ্যসাধন করতে পারলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন বা সাফল্য নির্ভর করে বিভিন্ন কর্মীগোষ্ঠীর কাজের সাফল্যের ওপর। এক-একটি কর্মীদলে একাধিক কর্মী থাকে এবং প্রত্যেক কর্মীর প্রকৃতি, চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য আলাদা। সুতরাং তাদের মধ্যে একধরনের আন্তর্ব্যক্তিক বিরোধ (inter-personal conflict) দেখা দেয়। আবার বিভিন্ন কর্মীদলের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য ইত্যাদি আলাদা হয় বলে বিভিন্ন দলের মধ্যেও সংঘাত বা বিরোধের সৃষ্টি হয়। আর এই সংঘাত বা বিরোধ যত বেশী হয় দলের কর্মদক্ষতা তত হ্রাস পায় ও উদ্দেশ্যসাধন তত জটিল হয়ে পড়ে। আর এই সংঘাত বা বিরোধ যাতে গড়ে উঠতে না পারে তার জন্যই সংযোজন বা সমন্বয় কাজ করে। সংযোজন বা সমন্বয় সাধন বলতে যেমন দলীয় ঐক্য গড়ে তোলা বোঝায় তেমনি বিভিন্ন দলের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলে কাজের মেলবন্ধন ঘটানোকেও বোঝায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মী ও কাজের মধ্যে যে ঐক্যতান গড়ে ওঠে তারই প্রভাবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়। সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকরা কাজ ও কর্মীর মধ্যে, বিভিন্ন কর্মীদলের মধ্যে এবং কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে এমন এক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলেন যাতে পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিষ্ঠানের কাজগুলি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। এর দ্বারা কাজ, কর্মী ও কর্ম উপাদানের মধ্যে এমন বোঝাপড়া গড়ে তোলা হয় যার ফলে একটি কাজ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ও সঠিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ **কর্মী ও কাজের মধ্যে সঠিক বোঝাপড়াই হল সংযোজনা** বা **সমন্বয়**।

## ৭.৩ সমন্বয় বা সংযোজনা

মানব শরীরকেও প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করা যায়। মানবদেহের মস্তিষ্ক ব্যবস্থাপনার কাজ করে। অন্যদিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে কর্মীদের সাথে তুলনা করা যায়। মস্তিষ্কের কাজ হল ভাবনা-চিন্তার মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, পরিকল্পনা রচনা করা, নির্দেশ দেওয়া এবং সর্বোপরি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলে তাদের সঠিকভাবে পরিচালনা করা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক-একটি নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বে থাকে, যেমন— হাত কাজ করে, চোখ দেখে, কান শোনে, নাক শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করে, পা হাঁটা-চলার কাজ করে, মুখ খাদ্য গ্রহণ করে, পাকস্থলী খাদ্য পরিপাকের কাজ করে ইত্যাদি। যে-কোন একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি তার কাজ ঠিকভাবে করতে না পারে তাহলে দেহের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। আবার অনেক সময় যেমন হৃৎপিণ্ড কাজ বন্ধ করে দিলে মানবশরীর মৃতদেহে পরিণত হয়। মস্তিষ্ক এই প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সবসময় এক ধরনের সমন্বয় বজায় রাখে। তাই হাত যে খাবার মুখের কাছে নিয়ে আসে, মুখ সেই খাবার গ্রহণ করে, দাঁত খাবার চর্বন করে, গলা গলাধঃকরণ করে, পাকস্থলি সেগুলি পরিপাক করে খাদ্যরস শরীরের পুষ্টির জন্য বিভিন্ন কোষে পাঠায়। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে কোন একটি যদি তার কাজ সঠিকভাবে না করে তাহলেই মানবশরীর বিকল হয়ে পড়ে, রোগ-অসুখের সৃষ্টি হয়, মানুষ তার স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন কর্মীর ওপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন কর্মী ও বিভিন্ন কাজের মধ্যে **একাত্মবোধ** (harmony) গড়ে তুলতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব হয় না। **বিভিন্ন কাজ ও বিভিন্ন কর্মী** বা **কর্মীদলের মধ্যে সংহতি সাধনই হল সংযোজনা** বা **সমন্বয়**। অন্যভাবে বলা যায় যে **সাধারণ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দলীয় প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করে যে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলা হয় তাকেই বলে সমন্বয়** বা **সংযোজনা**।

## ৭.৩.১ সমন্বয় বা সংযোজনা—সংজ্ঞা (Co-ordination—Definition)

বিভিন্ন কর্মীর কর্ম প্রচেষ্টা ও কর্মধারার একতা বিধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের পরিকল্পিত ব্যবস্থাই হল সমন্বয় বা সংযোজনা। একে **ব্যবস্থাপনার সারবস্তু** বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে একতা বিধান করার প্রক্রিয়াই হল সমন্বয়। সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের অভিসারী করা হয়। সমন্বয় গড়ে তোলার কাজ ব্যবস্থাপনার অন্যতম মৌলিক কাজ হিসাবে গণ্য হয়। বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ সমন্বয় বা সংযোজনার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নীচে তুলে ধরা হল :

**ফেয়ল** (Henry Fayol) বলেছেন, 'সমন্বয় হল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের সাফল্যের জন্য তাদের মধ্যে সমতাবিধান করা'।

**মুনী** (Mooney) এবং **রেইলী** (Reiley) সংক্ষিপ্তভাবে সমন্বয়ের একটি অত্যন্ত উপযোগী সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁদের মতে 'সমন্বয় হল সম-উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজের একতাবিধানের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া'।

**কুন্‌জ** এবং **ও'ডোনেল** (Koontz and O'Donnell) সমন্বয়ের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি হল—'সমন্বয় হল ব্যবস্থাপনার সারবস্তু যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে ঐক্য আনা যায়।'

**ম্যাকফারল্যান্ড** (D. E. McFarland) বলেছেন, 'সমন্বয় হল এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে একজন ব্যবস্থাপক তাঁর অধীনস্থ কর্মীদের মধ্যে যৌথ প্রচেষ্টার উন্নয়ন ঘটান এবং সাধারণ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কাজের একতা সৃষ্টি করেন।'

**টীড** (Tead)-এর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অনেক সুংসহত কারণ তিনি তাঁর সংজ্ঞায় ঘরোয়া গোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে 'ন্যূনতম বিরোধ ও সর্বাধিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ ও বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সাবলীল পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টাই হল সমন্বয় বা সংযোজন।'

উপরের সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় যে সংযোজনা বা সমন্বয় হল প্রতিষ্ঠানের সাধারণ উদ্দেশ্যসাধনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় কাজগুলির মধ্যে সংহতিবিধান ও একতা স্থাপনের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ সমন্বয়ের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাজগুলি অর্থাৎ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। কর্মীদের অন্যান্য কাজ বা ঘরোয়া গোষ্ঠীর কাজ ব্যবস্থাপনামূলক কাজের লক্ষ্য নয়। সমন্বয় হল সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার ফল। পরিশেষে বলা যায় যে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের প্রচেষ্টাই হল সমন্বয় বা সংযোজনা।'

## ৭.৩.২ সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য

প্রতিষ্ঠানের সাধারণ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিরুদ্ধ কাজের মধ্যে একতাবিধান ও বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে সংহতি সাধন করাই হল সংযোজন বা সমন্বয়। সংযোজনা বা সমন্বয় ব্যবস্থাপনার কোন পৃথক কাজ নয়, এটি হল **ব্যবস্থাপনার সারবস্তু**। একটি ফুলের মালায় যেমন ফুলগুলিকে একটি সুতো দিয়ে গেঁথে মালা তৈরি করা

হয়, তেমনি সমস্ত ব্যবস্থাপনামূলক কাজের অংশ হল সমন্বয়। মালার ক্ষেত্রে সুতোর যে ভূমিকা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ভূমিকাও অনুরূপ। সমন্বয়ের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল :

**(1) একটি অবিরাম প্রক্রিয়া (A continuous process) :** প্রতিষ্ঠান চলমান। সেকারণে প্রতিষ্ঠানে অবিরামভাবে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করা হয়। আর এই কাজগুলি যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য সংযোজনা বা সমন্বয়ও ধারাবাহিক ও অবিরামভাবে অনুসৃত হয়। অর্থাৎ সমন্বয় আলাদা কোন প্রক্রিয়া নয়। প্রতিষ্ঠান যতদিন তার কাজ-কর্ম অব্যাহত রাখে সমন্বয়ও ততদিন বিভিন্ন কাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ধারাকে অব্যাহত রাখে।

**(2) দলীয় প্রচেষ্টার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা (Orderly arrangement of group efforts) :** ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মীগোষ্ঠীর প্রচেষ্টাকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করা। দলভিত্তিক কাজের ক্ষেত্রে দলগত বিরোধ ও অন্তর্দলীয় কলহ স্বাভাবিক ব্যাপার। সমন্বয় দলগত বিরোধ ও অন্তর্কলহ দুর করে দলীয় একতা গড়ে তোলে ও বিভিন্ন দলের মধ্যে সংহতি স্থাপন করে। সুতরাং এটি হল দলীয় প্রচেষ্টার সুশৃঙ্খল বিন্যাস।

**(3) প্রচেষ্টার সংহতি ও সমন্বয়করণ (Integration and harmonisation of effort) :** সমন্বয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তি, দল ও বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন। কারণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের ও বিভিন্ন কর্মীর চরিত্র আলাদা হলেও তাদের উদ্দেশ্য এক—প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন। আর এই উদ্দেশ্যসাধন তখনই সম্ভব হয় যখন বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে সংহতি ও ঐক্য স্থাপন করে প্রচেষ্টাকে উদ্দেশ্য-অভিমুখী করা সম্ভব হয়। সমন্বয় প্রচেষ্টার এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করে। সেজন্য সমন্বয়কে অনেক সময় 'অর্কেষ্ট্রার' সাথে তুলনা করা হয় যেখানে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র একই তাল, লয় ও ছন্দে বাজে এবং সুরের ঐক্যতান সৃষ্টি করে।

**(4) সমন্বয় প্রত্যেক ব্যবস্থাপকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে (Responsibility of every manager) :** প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকরা এক একটি বিশেষ কাজের দায়িত্বে থাকেন। তাঁদের মুল কাজ হল কর্মীদের সঠিকভাবে পরিচালনা করা ও সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি সম্পাদনের ব্যবস্থা করা। সমন্বয় ছাড়া

তাদের পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই তাদের দায়িত্বের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে বিভিন্ন কাজ ও বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা যাতে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের প্রচেষ্টাকে কাজে প্রয়োগ করে।

(5) **উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা (Deliberative effort) :** সমন্বয় কোন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার নয়। অর্থাৎ সমন্বয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টার ফলে গড়ে ওঠে না। বিপরীত পক্ষে এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা। সচেতনভাবে অর্থাৎ প্রচেষ্টার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় গড়ে তুলতে হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে সমন্বয় পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হয়।

(6) **উপাদান (Elements) :** সমন্বয় তিনটি উপাদানের সাহয্যে গড়ে ওঠে। এগুলি হল—(i) **সময়** (timing), (ii) **ভারসাম্য স্থাপন** (balancing) ও (iii) **সংহতি স্থাপন** (integrating)। **সময়** বলতে বোঝায় বিভিন্ন বিভাগের সময়সূচীর মধ্যে সমন্বয় করা। ভারসাম্য স্থাপন বলতে কাজ অনুসারে কাজের উপাদানের সরবরাহ সুনিশ্চিত করা, যেমন—মেশিনের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামালের সরবরাহ। আর সংহতি স্থাপন বলতে বোঝায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে কর্মীদের উদ্দেশ্যকে একত্রিভূত করা।

(7) **সহযোগিতার উপস্থিতি (Presence of co-operation) :** সমন্বয়ের মধ্যে সহযোগিতার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সহযোগিতা হল কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এতে প্রচেষ্টার মাত্রা, গতি, সময় ইত্যাদি বিষয়গুলি অনুপস্থিত থাকে। অন্যদিকে সহযোগিতার সাথে এই উপাদানগুলি যুক্ত হয়ে সমন্বয়ের সৃষ্টি করে। তাই বলা হয় **সংযোজন ও সহযোগিতা পরস্পরর পরিপূরক।**

(8) **ব্যবস্থাপনার সারবস্তু (Essence of management) :** সমন্বয়কে ব্যবস্থাপনার পৃথক কাজ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সমন্বয় ঘটিয়ে দলীয় উদ্দেশ্যসাধন করা। এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়। **টেরী** (George R. Terry) বলেছেন, কোন উদ্দেশ্য সফল করতে বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে একসূত্রে আবদ্ধ করার কাজটি করে সমন্বয়। **প্রতিটি ব্যবস্থাপনামূলক কাজই হল সমন্বয়ের প্রয়োগ।** এসব কারণে সমন্বয়কে **ব্যবস্থাপনার সারবস্তু** বলা হয়।

## ৭.৪ সমন্বয়ের কৌশলসমূহ

পৃথক কোন ব্যবস্থাপনামূলক কাজ হিসাবে সমন্বয় গণ্য হয় না কারণ এটি সমস্ত ব্যবস্থাপনামূলক কাজের সাথে জড়িয়ে থাকে। তাই একে ব্যবস্থাপনার অংশবিশেষ ও ব্যবস্থাপনার সারবস্তু হিসাবে গণ্য করা হয়। বস্তুতঃ বিভিন্ন ব্যবস্থাপনামূলক কাজের গুণগত মান সমন্বয় বা সংযোজনের উপর নির্ভর করে। কি পরিকল্পনা, কি নির্দেশদান, কি নেতৃত্বদান বা অনুপ্রাণিতকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি ব্যবস্থাপনামূলক কাজেরই সাফল্য সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে। তবে এই সমস্ত কাজে সাফল্য পেতে হলে কাবরাবী ক্ষেত্রে যেমন কৌশলের ব্যবহার দেখা যায়, তেমনি সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও কিছু কৌশল প্রয়োগ করা হয়। বস্তুতঃ কৌশল বলতে আগাম ভাবনা-চিন্তা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে কোন কাজ করাকে বোঝায়। এর ফলে কাজের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বাধা-বিপত্তিগুলিকে মোকাবিলা করা ও প্রতিহত করা সহজ হয় এবং উদ্দেশ্যসাধনও সহজ হয়। সমন্বয়ের কৌশল বলতে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য যে উপায় বা কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা হয় তাকে বোঝায়। সমন্বয়ের কৌশল সহজেই বিভিন্ন কাজ, বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন কর্মীদল ও কর্মীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করে,

পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতা গড়ে তোলে ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যসাধন সহজ করে। অর্থাৎ সমন্বয়ের কৌশলগুলি প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় গড়ে তোলার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতি বা কৌশলগুলি হল নিম্নরূপ :

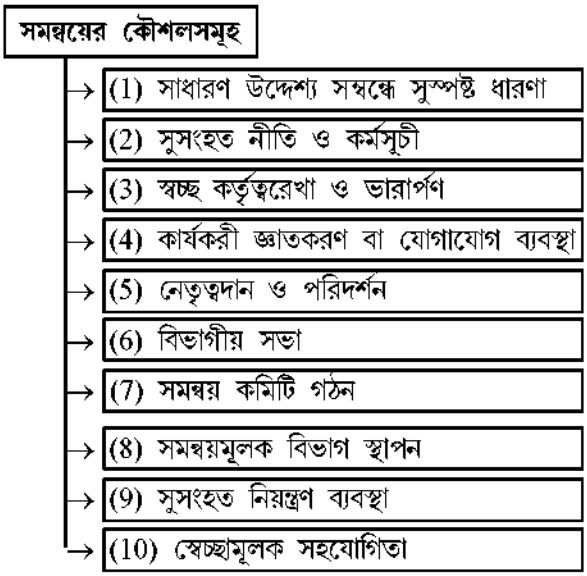


নীচে এগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

**(1) সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা (Clear idea of common objectives) :** প্রতিষ্ঠানে একটি কার্যকরী সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কর্মীদের ভালভাবে জানতে হবে ও স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। যেমন, বিভাগীয় কর্মীদের অবশ্যই বিভাগীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আবার কর্মীরা যখন দলবদ্ধভাবে কাজ করে তখন দলীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও তাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এছাড়াও এই উদ্দেশ্যগুলি কিভাবে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করবে সে সম্বন্ধেও তাদের ধারণা থাকতে হবে। এজন্যই ব্যবস্থাপনার সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংগঠনের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সমস্ত স্তরের কর্মীদের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে হবে। কারণ কার্যকরী সমন্বয় গড়ে তোলার পূর্বশর্তই হল **উদ্দেশ্যের একতা**। প্রত্যেক কর্মী যদি বুঝতে পারে যে তাদের কাজ কিভাবে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করে তাহলে সমন্বয় গড়ে তোলা অনেক সহজ হয়।

**(2) সুসংহত নীতি ও কর্মসূচী (Comprehensive policies and programmes) :** সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সমন্বয়কে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করার জন্য কতকগুলি নীতি অনুসরণ করতে হয়। এই নীতিগুলি সমন্বয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আদর্শমূলক নির্দেশ হিসাবে গণ্য হয়। আবার ব্যবস্থাপকরা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য আগাম কর্মসূচী তৈরি করে। এই নীতি ও কর্মসূচীগুলি যেন সুসংহত হয় অর্থাৎ কর্মসূচী যেন নীতিগুলি মেনে চলে। কারণ উপযুক্ত নীতি ও কর্মসূচী কাজে সমতা সৃষ্টি করে ও সমন্বয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

(3) **স্বচ্ছ কর্তৃত্বরেখা ও ভারার্পণ (Clear lines of authority and delegation) :** সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ কর্তৃত্বের সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে যা সমন্বয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কর্তৃত্বরেখা ও ভারার্পণই হল বিভিন্ন কর্মী ও দলের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কারণ এই রেখার মাধ্যমেই একজন কর্মী বা কর্মগোষ্ঠীর ওপর কাজের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। এর মাধ্যমেই তারা বুঝতে পারে কি তাদের করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। আর কর্মীদের এই বোঝাপড়া সমন্বয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

(4) **কার্যকরী জ্ঞাতকরণ বা যোগাযোগ ব্যবস্থা (Effective communication) :** কার্যকরী জ্ঞাতকরণ তথা ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা হল সমন্বয়ের চাবিকাঠি। এজন্য কেবলমাত্র নিয়মমাফিক জ্ঞাতকরণ প্রণালী ব্যবহার করলেই হবে না। তার সাথে নিয়মবহির্ভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুললে সমন্বয়সাধন সহজ হয়। এই উভয় ব্যবস্থার ফলে কর্মীরা অনেক বেশী আন্তরকি হয় ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক অনেক সুদৃঢ় হয়। সেজন্য কার্যকরী জ্ঞাতকরণ সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে গণ্য হয়।

(5) **নেতৃত্বদান ও পরিদর্শন (Leadership and supervision) :** পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিকল্পনা রূপায়ণ এই উভয় স্তরেই উৎসাহমূলক নেতৃত্বদান কার্যকরী সমন্বয় গড়ে তোলে। এছাড়াও কার্যকরী পরিদর্শন কর্মীদের প্রচেষ্টার মধ্যে ঐক্য স্থান করে সমন্বয় গড়ে তোলে। সেজন্য উৎসাহমূলক নেতৃত্ব-দান ও কার্যকরী পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় গড়ে তোলার কার্যকরী উপায় হিসাবে গণ্য হয়।

(6) **বিভাগীয় সভা (Departmental meeting) :** বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থাকে তা বিভাগীয় সভার মাধ্যমে দূর করা যায়। এরূপ সভার মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ও কর্মীরা আলাপ-আলোচনা দ্বারা পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে সমর্থ হয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়। সেজন্য বিভাগীয় সভা সমন্বয় গড়ে তোলার ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়।

(7) **সমন্বয় কমিটি গঠন (Formation of co-ordinating committee) :** বড় বড় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন বিভাগের সমস্যা, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি এই কমিটি দূর করার ব্যবস্থা করে ও একটি কার্যকরী জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এককথায়, সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠানে একটি কার্যকরী সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন অসুবিধা ও বাধাগুলি দুর করে ও বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে। এজন্য সমন্বয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি বা কৌশল হিসাবে গণ্য হয়।

(8) **সমন্বয়মূলক বিভাগ স্থাপন (Formation of co-ordinating departments) :** যেসব প্রতিষ্ঠানের আয়তন বেশ বড় এবং অনেক বিভাগের মাধ্যমে যাদের কাজ করতে হয়, যেসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আলাদা বিভাগ স্থাপন করা হয়। এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ও কাজ হল বিভিন্ন বিভাগ ও বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা। এই বিভাগ বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম পরিদর্শন করে ও পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা গড়ে তোলার পরামর্শ দেয়। বস্তুতঃ সমন্বয়মূলক বিভাগ গড়ে তুললে প্রতিষ্ঠানে সমন্বয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন

বিভাগের সম্পর্কের সেতু হিসাবে এটি কাজ করে। যেসব প্রতিষ্ঠান জটিল প্রকৃতির কাজে নিযুক্ত থাকে এবং কাজের ক্ষেত্রে একাধিক বিভাগ অংশগ্রহণ করে সেক্ষেত্রে সমন্বয়মূলক বিভাগ স্থাপন ভাল ফল দেয়। এই বিভাগ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা সম্পর্ক স্থাপন করে, ভারসাম্য সৃষ্টি করে ও সংহতিসাধন করে কার্য সম্পাদনকে সুনিশ্চিৎ করে।

(9) **সুসংহত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Integrated control system) :** কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠানে কিছু পরিমাণে সমন্বয় গড়ে তোলা সম্ভব হয়। কারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হল প্রতিষ্ঠানের সম্পদগুলির কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনা হয় ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যাতে সহজে সফল হয় তার ব্যবস্থা করা হয়। সেজন্য বলা হয় যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে পারলে সমন্বয় নিজে থেকেই গড়ে উঠে। একারণে সুসংহত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকরী কৌশল হিসাবে গণ্য হয়।

(10) **স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা (Voluntary co-operation) :** পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সমন্বয় গড়ে উঠতে পারে না। সহযোগিতা ছাড়া সমন্বয় একটি অলীক কল্পনা। আর এই সহযোগিতা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছামূলক হওয়া দরকার। সমন্বয় গড়ে তোলার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় তখন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে। তাই সমন্বয় কর্মীদের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমন্বয়ের উপরোক্ত কৌশলগুলি এককভাবে প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় গড়ে তুলতে পারে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী একাধিক কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। কারণ এটি হল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের অবস্তুগত বা গুণগত উপাদান। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজের সাথে এটি জড়িত এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য এর উপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। তাই একাধিক কৌশল অবলম্বন করে ব্যবস্থাপকরা প্রতিষ্ঠানে একটি কার্যকরী সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকেন।

## ৭.৫ নিয়ন্ত্রণ

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গড়ে ওঠে। আর ঐ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাকে কিছু কাজ সম্পাদন করতে হয়। যেহেতু প্রতিষ্ঠান নিজে কাজগুলি সম্পাদন করতে পারে না, তাই তাকে কর্মী নিয়োগ করতে হয়। এই কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে।

এখন এই কাজ সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক ব্যয়ে সম্পাদন করতে হলে প্রতিটি কাজের পরিকল্পনা রচনা করতে হয় এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সংগঠন গড়ে তুলতে হয়। প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের ভারার্পণ ঘটে। প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মী তার নিজ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী পরিকল্পনা অনুসারে সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সঠিক ব্যয়ে তার কাজ সম্পাদন করবে—প্রতিষ্ঠান কর্মীর কাছে এই প্রত্যাশাই করে থাকে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই 'প্রত্যাশা' ও 'বাস্তব অবস্থার' মধ্যে ফারাক দেখা যায়। আর এই ফারাক যত বেশি হয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন ততই কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ নিয়ন্ত্রণ হল পরিকল্পনা ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে যাতে কোন বিচ্যুতি বা ফাঁক না থাকে তারই এক সুসংহত প্রচেষ্টা। অর্থাৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার কাজই

হল নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 'প্রত্যাশিত ফল' ও 'প্রকৃত ফলের' তুলনা করা হয় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সনাক্ত করা হয়। এর সাথে ভবিষ্যতে যাতে ঐধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার ব্যবস্থা করা হয়। আর এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে বলে **নিয়ন্ত্রণ**।

সুতরাং নিয়ন্ত্রণ হল একটি মৌলিক ব্যবস্থাপনামূলক কাজ যা সাধারণতঃ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজকে অনুসরণ করে। পরিকল্পনা বা নির্দেশনার মত নিয়ন্ত্রণও ব্যবস্থাপনার একটি ধারাবাহিক কাজ। এর উদ্দেশ্য হল পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলি যাতে সম্পাদিত হয় তা সুনিশ্চিত করা। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের সবক্ষেত্রেই অর্থাৎ বস্তু, ব্যক্তি, কাজ, অর্থ, সময় ইত্যাদি সর্বত্রই প্রযোজ্য হয়।

নীতি ও পদ্ধতি হিসাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার একেবারে শুরু থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হয়ে আসছে। কারণ ব্যবস্থাপকরা বরাবরই তাদের আদেশ ও পরিকল্পনার ফল জানতে বিশেষভাবে আগ্রহী হন। একটি বাস্তব উদাহরনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা যায়। 'ভারতীয় রেলপথ' পরিবহণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে যুক্ত অসংখ্য রেলগাড়ি একই লাইনে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাতায়াত করছে। এই রেলগাড়ির চালকদের গতিশক্তির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং তারা যেভাবে খুশি রেলগাড়ি চালাতে পারে। কিন্তু যদি তারা নিজের ইচ্ছামত সেগুলিকে চালায় তাহলে রেল চলাচলে বিশৃঙ্খলা ঘটবে এবং দুর্ঘটনা ঘটাও কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। তাই তারা নিজের খেয়াল-খুশি মতো রেলগাড়িটি চালাতে পারে না। বাস্তবে চালকদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় সিগন্যাল, গার্ড ও স্টেশন মাস্টার দ্বারা। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ হল সেই প্রক্রিয়া যা রেল চলাচলকে নির্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী ও ন্যূনতম বিচ্যুতির মাধ্যমে গতিশীল রাখে। একই ঘটনা একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল রাখতে এবং বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে বিচ্যুতি ন্যূনতম করাই হল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য।

## ৭.৫.১ নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা (Definition of Control)

ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজ হিসাবে যেগুলিকে চিহ্নিত করা হয় সেগুলি হল পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন গড়ে তোলা, নির্দেশনা ও নেতৃত্বদান, সংযোজনা বা সমন্বয়, অনুপ্রাণিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণ হল ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ কাজ। নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা নীচে তুলে ধরা হল :

**হেনরি ফেয়ল** (Henry Fayol) নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'নিয়ন্ত্রণ হল গৃহীত পরিকল্পনা, প্রদত্ত নির্দেশ এবং প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে সব কিছু হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা, যাচাইকরণের ফলে উদ্‌ঘাটিত দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা ও ভবিষ্যতে যাতে অনুরূপ ত্রুটি বা বিচ্যুতি না ঘটে তার জন্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।' তিনি আরও বলেছেন যে নিয়ন্ত্রণ বস্তু, ব্যক্তি, কাজ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়।

**মেরী কাসিং নাইলস্** (Mary Cushing Niles) নিয়ন্ত্রণের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি হল—"পরিকল্পনা যেখানে পথ নির্দিষ্ট করে দেয়, নিয়ন্ত্রণ দেখে সেই পথ যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে কিনা। কোন বিচ্যুতি ঘটলে নিয়ন্ত্রণ ঐ পথে বা পরিবর্তিতপথে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।"

**ব্রেচ** (E.F.L. Brech) নিয়ন্ত্রণের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি হল—"নিয়ন্ত্রণ হল চলতি কাজের সম্পাদন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত পূর্বনির্ধারিত মান অনুসারে হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা যাতে কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতি সুনিশ্চিত হয় এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রের লব্ধ অভিজ্ঞতা লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে অনুসরণ করা যায়।"

**টেরী** (G.R. Terry) প্রদত্ত নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা হল—'এটি একটি নির্ধারণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কি করতে হবে অর্থাৎ আদর্শমান স্থির করা হয়; কি করা হয়েছে অর্থাৎ সম্পাদিত কাজ পরিমাপ করা হয়; সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন করা হয়; এবং যদি প্রয়োজন হয়, পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সম্পাদনের জন্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা অর্থাৎ আদর্শ মান অনুসারে কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা'।

উপরের সংজ্ঞাগুলি থেকে নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে নিয়ন্ত্রণ হল ব্যবস্থাপনামূলক এমন এক প্রক্রিয়া যার দ্বারা **প্রকৃত কাজ এবং প্রকৃত ফল** যাতে **পরিকল্পিত কাজ ও পরিকল্পিত ফল** অনুসারে সম্পন্ন হয় তা সুনিশ্চিত করা। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকরা আশ্বস্ত হতে পারেন যে পরিকল্পিত পথ ধরেই কাজ সম্পাদিত হচ্ছে। আর তা যদি না হয়, তাহলে কাজকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়।

নিচে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

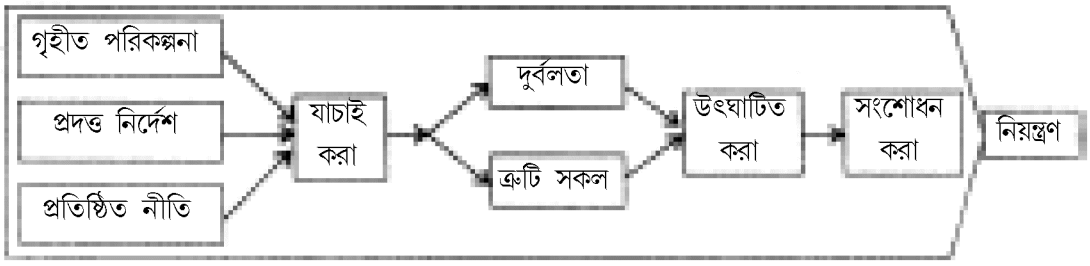


## ৭.৫.২ নিয়ন্ত্রণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Characteristic Features of Control)

নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যেসব চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল :

**(1) ব্যবস্থাপনামূলক কাজ (Management function) :** ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজ হিসাবে যেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়, তাদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হল অন্যতম। বস্তুতঃ এটি হল অনুবর্তনের কাজ। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজগুলি কতখানি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে তা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পূর্ণতা পায়।

(2) **ব্যাপ্তিমূলক কাজ (Pervasive function) :** নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ প্রতিটি ব্যবস্থাপকের ক্ষেত্রেই একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ। প্রত্যেক ব্যবস্থাপককেই কম-বেশী নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে হয়। সেজন্য বলা হয় যে ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরেই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় যদিও নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়।

(4) **সঠিক সময়ে কার্য সম্পাদন (Performance at right time) :** ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক ব্যয়ে সম্পাদনের ব্যবস্থা করা। ব্যবস্থাপনার এই দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় বলে এটিও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়।

(5) **সঠিক ব্যয়ে কার্য সম্পাদন (Performance at right cost) :** কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠান আশা করে ন্যূনতম প্রচেষ্টার দ্বারা ও ন্যূনতম ব্যয়ে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা করা। নিয়ন্ত্রণ এই উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে কাজ করে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হ্রাসের বিষয়টিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

(6) **প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন (Attainment of organisational objective) :** নিয়ন্ত্রণ হল একটি ব্যবস্থাপনামূলক ধারাবাহিক কাজ। একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কাজগুলির যথাযথ সম্পাদনের উপর। আর কাজগুলির যথাযথ সম্পাদন নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার কর্ম দক্ষতার উপর। পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় বা সংযোজন যেমন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় বলে গণ্য হয়, তেমনি নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বলা হয় যে নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন।

## ৭.৬ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হল শেষ পর্যায়ের কাজ। নিয়ন্ত্রণ হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার শুরু হয় কোন কাজের ক্ষেত্রে প্রমাণ মান স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় সম্পাদিত কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের মধ্য দিয়ে। পরের পাতায় রেখাচিত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ধাপসমূহ তুলে ধরা হল :

**(1) কাজের প্রমাণ মান প্রতিষ্ঠা (Establishment of standards) :** নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হল কাজের প্রমাণ মান নির্ধারণ যার সাথে তুলনা করে কৃত কাজের মূল্যায়ন করা হয়। এই মান বিভিন্ন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে। এই মান আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন উৎপাদনের পরিমাণ, শ্রম-ঘণ্টা ইত্যাদি হল ভৌতমান (Physical standard) বিক্রয়, আয়, ব্যয় ইত্যাদি হল আর্থিক মান (Financial standard) ইত্যাদি। এই মানগুলি স্পর্শনীয়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সুনাম সংক্রান্ত প্রমাণ মান হল অস্পর্শনীয়।

কোন কাজের প্রমাণ মান ঐ কাজের সম্পাদনজনিত প্রত্যাশাকে সূচীত করে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবস্থাপকরা এই মান নির্ধারণ করেন এবং এই মান-ই নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। সেজন্য অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে এই মান নির্ধারণ করতে হয়। সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রমাণ মানের আবশ্যিক শর্তগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) প্রমাণ মান অবশ্যই সরল ও সহজে বোধগম্য হতে হবে।

(ii) প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ মান যেন সঙ্গত পরিমাণ প্রচেষ্টা ও সময়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়।

(iii) প্রমাণ মান অবশ্যই নমনীয় হবে অর্থাৎ প্রয়োজন পড়লে সেগুলি যাতে পরিবর্তিত করা যায়।

(iv) বিজ্ঞানসম্মতভাবে গতি সমীক্ষা ও সময় সমীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ মান স্থির করতে হবে।

(v) পরিমাপের সুবিধার জন্য প্রমাণ মান যতটা সম্ভব পরিমাণগতভাবে প্রকাশ করতে হবে।

(vi) কর্মীদের সাথে যথাসম্ভব আলোচনার ভিত্তিতে এই মান নির্ধারণ করতে হবে।

**(2) সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (Measurement of performance) :** প্রত্যাশিত কাজের মান একবার স্থির হয়ে গেলে পরের ধাপটি হল **প্রকৃত কাজের পরিমাপ।** ধরা যাক একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় স্থির করা হয়েছে 50,000 ইউনিট। সুতরাং প্রকৃত বিক্রয় 50,000 ইউনিটের কম না বেশী তা দেখতে হবে। কাজ চলাকালীনও কাজের পরিমাপ করা হয়। এর ফলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ থাকে।

**(3) প্রত্যাশিত ও সম্পাদিত কাজের মধ্যে তুলনা (Comparison between the actual performance and standard performance) :** কাজের প্রমাণ মান হল প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত প্রত্যাশা। অন্যদিকে সম্পাদিত কাজ হল বাস্তব ঘটনা। প্রত্যাশার সাথে বাস্তবের তুলনা করে কর্ম সম্পাদনে প্রতিষ্ঠানের শক্তি (Strength) বা দুর্বলতা (Weakness) পরিমাপ করা যায়। যদি সম্পাদিত কাজ প্রমাণ মানের সাথে মিলে যায় তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে সব কিছু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যদি বিচ্যুতি দেখা যায় তাহলে বিচ্যুতির কারণগুলি চিহ্নিত করে তাদের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে ছোটখাট বিচ্যুতি অগ্রাহ্য করা হয়। যেমন, বিচ্যুতি যদি প্রমাণ মানের 'কম-বেশী 5%' হয় তাহলে ব্যবস্থাপকরা তা অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু এর বেশী হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। বস্তুতঃ **সঙ্কটজনক বা ব্যতিক্রমী বিচ্যুতির** (Critical or exceptional deviation) উপর গুরুত্ব আরোপ **'ব্যতিক্রমী নিয়ন্ত্রণ'** (Control by exception) নামে পরিচিত।

**(4) বিচ্যুতির কারণ চিহ্নিত করা বা সনাক্তকরণ (Identifying causes of deviation) :** তৃতীয় ধাপে কাজের প্রমাণ মান ও সম্পাদনার মধ্যে তুলনা করে যে বিচ্যুতি দেখা যায় তা তাৎপর্যপূর্ণ হলে এর

কারণ অনুসন্ধান করা হয়। এজন্য কাজ সম্পাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিচ্যুতির কারণটি চিহ্নিত করা হয়। সাধারণতঃ বিচ্যুতির পিছনে যেসব কারণ বর্তমান থাকে সেগুলি হল পরিকল্পনায় ভুল-ত্রুটি, কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অমনোযোগিতা, অথবা পরিকল্পনার দুর্বল রূপায়ণ।

**(5) সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ (Taking corrective actions) :** বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করে সেগুলি সংশোধনের ব্যবস্থা না করলে পরিকল্পনা কার্যকরী হয় না। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি অনুসন্ধানেই নিবদ্ধ থাকে না, সেগুলি যাতে সংশোধন করা যায় ও ভবিষ্যতে যাতে তাদের পুনরাবৃত্তি না ঘটে তারও ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া শেষ হয় কাজ সম্পাদনে উদ্‌ঘাটিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। অবশ্য যেখানে বিচ্যুতি ঘটে না বা অত্যন্ত কম বিচ্যুতি ঘটে সেক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, কাজের প্রকৃত সম্পাদন প্রমাণ মানের চেয়ে খারাপ হওয়ার পিছনে কারণ হল কর্মীদের প্রশিক্ষণের অভাব, পুরানো ও অকেজো যন্ত্রপাতি, লোডশেডিং, খারাপ মানের কাঁচামাল, কর্মীদের মধ্যে প্রণোদনার অভাব ইত্যাদি। সুতরাং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি স্থাপন, ভাল মানের কাঁচামালের ব্যবস্থা, কাজের পরিবেশের উন্নয়ন, পরিদর্শন ইত্যাদি গ্রহণ করলে কর্ম সম্পাদন উন্নত হয়। তবে যেক্ষেত্রে কোনভাবেই কর্ম সম্পাদন প্রমাণ মানের স্তরে উন্নীত করা যায় না, সেক্ষেত্রে প্রমাণ মানকেই সংশোধন করতে হয় ও কমাতে হয়। এরূপ ঘটনা দেখা যায় তখন বিচ্যুতির কারণ ব্যবস্থাপকদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না।

নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপগুলি অন্য একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করা যায় :

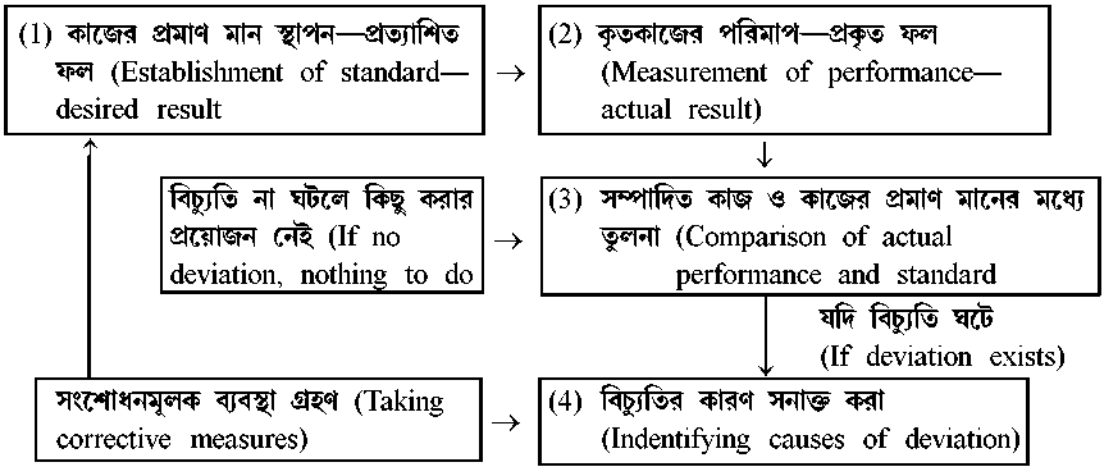


অতএব পরিকল্পিত পথ ধরেই যাতে কাজ সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করাই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। অন্যভাবে বলা যায় পরিকল্পনাই নিয়ন্ত্রণের কাজের ধারা ও পরিধি ঠিক করে দেয়। পরিকল্পনা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ অন্ধ। তাই বলা হয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা পরস্পরের পরিপূরক, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক নীচে উল্লেখ করা হল:

**(1) নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে সঠিক পন্থে চালিত করে (Control keeps the planning in the right track) :** নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পরিকল্পনা উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব নয়। পরিকল্পনার নির্দিষ্ট পথ ঠিক করে দেয়, নিয়ন্ত্রণ দেখে ঐপথে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কিনা। পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটলে নিয়ন্ত্রণ তা সনাক্ত করে ও কাজ যাতে পরিকল্পনা অনুসারে সম্পাদিত হয় তার ব্যবস্থা করে। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়। পরিকল্পনা তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। সেজন্য বলা হয় পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ হল ব্যবস্থাপনার **যমজ সন্তান** (twins of management)।

**(2) উভয়ই ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি দেয় (Both are forward-looking) :** যদিও অনেক সময় বলা হয় যে পরিকল্পনা ভবিষ্যৎমুখী কিন্তু নিয়ন্ত্রণ অতীতমুখী। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটি পুরোপুরি সত্য নয়। পরিকল্পনা হল ভবিষ্যতের কার্যক্রম যা' অতীত অভিজ্ঞতা ও পূর্বানুমানের সাহায্যে বর্তমানে স্থির করা হয়। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ অতীত কাজের পর্যালোচনা করে ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন নির্ধারণ করে তেমনি ভবিষ্যৎ কাজের ক্ষেত্রে অনুরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির পুনরাবর্তন যাতে না ঘটে তারও ব্যবস্থা করে। নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুসারে কর্মীদের কাজ করতে বাধ্য করে। নিয়ন্ত্রণের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা ভবিষ্যতে পরিকল্পনার রূপায়ণ যাতে আরও উন্নত হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করে। কাজেই নিয়ন্ত্রণও ভবিষ্যৎ-মুখী।

নীচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক তুলে ধরা হল।

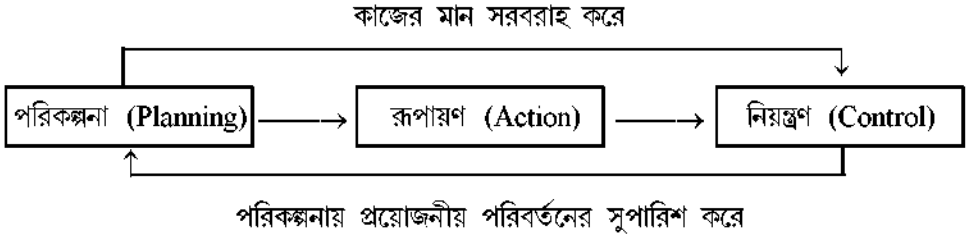


## ৭.৭ নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ

নিয়ন্ত্রণের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন প্রকারের হয়। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য একই প্রকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন দিক থেকে নিয়ন্ত্রণের শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে, যথা—

**(ক) কার্যক্ষেত্র অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ (Control in respect of activity) :**

এই নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদনের বিভিন্ন দিকে আরোপ করা হয়। যেমন, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production control), মুল্য নিয়ন্ত্রণ (Price control), গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (Quality control), সংগঠন নিয়ন্ত্রণ (Organisational control), মজুত পণ্যের নিয়ন্ত্রণ (Inventory control), সামগ্রিক কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ (Over-all performance control) ইত্যাদি।

**(খ) লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ (Control according to goals) :**

লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ আবার দুধরনের যেমন—ভৌত ও আর্থিক (Physical এবং Financial)। উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) দিক থেকে যাচাই করা হল ভৌত নিয়ন্ত্রণ।

পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পণ্যের মোট উৎপাদন, যন্ত্র ঘণ্টাপ্রতি উৎপাদন, শ্রম ঘণ্টাপ্রতি উৎপাদন প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়। আর গুণগত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পণ্যের দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও সূক্ষ্মতা জানা যায়। আবার আর্থিক নিয়ন্ত্রণে—উৎপাদন ব্যয় কত, বিক্রয়মূল্য কত এবং আয় কত ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

**(গ) মানদণ্ড অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ (Control according to standards) :**

বাজেট নিয়ন্ত্রণ (Budgetary control), পরিব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost control), আনুপাতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ (Control according to ratio analysis) ইত্যাদি মানদণ্ড অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত।

**(ঘ) প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ (Naturewise control) :**

এখানে নিয়ন্ত্রণ দুপ্রকারের—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ, যেমন—ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নিরীক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ (Control by management audit) এবং বাহ্যিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, যথা—কোন চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট কর্তৃক হিসাব পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ (Control by external audit by Chartered Accountant) ইত্যাদি।

**কারবারী প্রতিষ্ঠানে গৃহীত বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা**

ড্রাকার (P. F. Drucker) কারবারের আটটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের কথা বলেছেন যেখানে নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা প্রয়োজন। সেগুলি হল—বাজার ব্যবস্থা, নতুন আবিষ্কার, উৎপাদনশীলতা, ভৌত ও আর্থিক সম্পর্ক, সুনাম অর্জনের ক্ষমতা, ম্যানেজারের কাজ সম্পাদন ও দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মীদের কাজের ও দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ন এবং সর্বজনীন দায়িত্ব। আবার হোল্ডেন (Holden), ফীশ (Fish) এবং স্মিথ (Smith) ১৪টি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে নিয়ন্ত্রণের কাজ বলবৎ করা হয়। এই ১৪টি ক্ষেত্র যেখানে নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা হয় সেগুলি হল—(i) কাজের নীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ, (ii) কাজের পদ্ধতির ওপর নিয়ন্ত্রণ, (iii) সংগঠনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, (iv) কর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ, (v) দ্রব্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ, (vi) দ্রব্য উৎপাদনের ধারার ওপর নিয়ন্ত্রণ, (vii) উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, (viii) মজুত সম্ভারের ওপর নিয়ন্ত্রণ (Inventory control), (ix) দ্রব্যের গুণাগুনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, (x) বিক্রয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ, (xi) বেতন ও মজুরীর ওপর নিয়ন্ত্রণ, (xii) মূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ, (xiii) বাহ্যিক সম্পর্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ, (xiv) সার্বিক কার্য সম্পাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ।

## ৭.৮ সারাংশ

কারবারের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ও বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করাকে সমন্বয় বা সংযোজনা বলে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ আছে। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয় কিন্তু কারবারের সাফল্যের জন্য বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন কর্মীর কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন অপরিহার্য। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কিন্তু এই ভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে একতা ও অভিন্নতা সংযোজনের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়। কারবারের লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে বিভিন্নতার মধ্যে একতা সৃষ্টি করতে হবে আর সমন্বয় বা সংযোজনা। হল একতা ও একাত্মবোধ সৃষ্টির প্রধান হাতিয়ার। সংযোজন ব্যতিরেকে কারবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, ফলে কারবারের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

আবার পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজ ঠিকমত সম্পাদন হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা এবং যদি কোন ভুল ত্রুটি থাকে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করে দেওয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। অর্থাৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার কাজই হল নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ হল একটি মৌলিক ব্যবস্থাপনামূলক কাজ যা সাধারণত ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজকে অনুসরণ করে। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের সবক্ষেত্রেই অর্থাৎ বস্তু, ব্যক্তি, কাজ, অর্থ, সময় ইত্যাদি সর্বত্রই প্রযোজ্য হয়।

## ৭.৯ অনুশীলনী

(১) কয়েকটি সংজ্ঞা দিয়ে সংযোজনের অর্থ বুঝিয়ে দিন।

(২) সংযোজনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(৩) সমন্বয়ের বিভিন্ন কৌশল ব্যাখ্যা করুন।

(৪) সুসংহত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়?

(৫) নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে? নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(৬) ভালো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(৭) নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ধরণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(৮) নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

(৯) নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

# একক ৮ ❑ জ্ঞাতকরণ (Communication)

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ জ্ঞাতকরণ

৮.৩.১ জ্ঞাতকরণের সংজ্ঞা

৮.৩.২ জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব বা ভূমিকা

৮.৪ জ্ঞাতকরণের প্রক্রিয়া

৮.৫ জ্ঞাতকরণের বাধা

৮.৬ সারাংশ

৮.৭ অনুশীলনী

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

## ৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- জ্ঞাতকরণের অর্থ ও বিভিন্ন সংজ্ঞা
- জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব বা ভূমিকা
- জ্ঞাতকরণের প্রক্রিয়া
- জ্ঞাতকরণের বাধাসমূহ

## ৮.২ প্রস্তাবনা

কারবারি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিভাগ, উপ-বিভাগ, বিভিন্ন কর্মীগোষ্ঠী কার্যগতভাবে আন্তঃসম্পর্কিত (Interrelated)। এই সম্পর্কের সার্থকতা, স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন হল, প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক তথ্যের 'কার্যকর প্রবাহ' (Effective flow of information)। বিভিন্ন তথ্য, সংবাদ, ধারণা, ভাবধারা, আদেশ-উপদেশ, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতির বিনিময় সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকেই জ্ঞাতকরণ বা যোগাযোগ বলা হয়। ব্যবস্থাপনার কার্য হল কর্মীদের দিয়ে কারবারি কার্যকলাপ সুষ্ঠু সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণ করা। ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যাবলির মূল ভিত্তিই হল বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও কর্মীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক। সেই কারণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন হয় দক্ষ ও কার্যকরী জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা। ইহা সংগঠন সেতুবন্ধনের কার্য করে এবং ব্যবস্থাপনাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

## ৮.৩ জ্ঞাতকরণ

জ্ঞাতকরণ হল একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অপর একজন ব্যক্তির কাছে মানবিক চিন্তার সঞ্চালন (Transmission of human thought)। জ্ঞাতকরণের জন্য তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে তাই দ্বিমুখী প্রভাব প্রয়োজন। দ্বিমুখী প্রভাবের একদিকে থাকেন প্রেরক (Communicator) এবং অন্যদিকে থাকেন তথ্য প্রাপক (Recipient)। প্রেরক যে তথ্য প্রেরণ করেন প্রাপক সেই তথ্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন অথবা নাও করতে পারেন। প্রাপক যদি প্রেরিত তথ্যের অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন এবং যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তাহলে তাকে উত্তম জ্ঞাতকরণ বলা হবে। অপরপক্ষে প্রাপক তথ্যের অর্থ উপলব্ধি করতে পারলেও তিনি উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারেন অথবা নাও পারেন। তাই যে ক্ষেত্রে প্রেরিত তথ্যের বিষয়বস্তু প্রাপকের কাছে অবোধ্য থেকে যায় বা যেক্ষেত্রে প্রাপক প্রেরিত তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা করেন সেক্ষেত্রে জ্ঞাতকরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাই ব্যবস্থাপনায়, জ্ঞাতকরণের ক্ষেত্রে তথ্যের বর্ণন, শ্রবণ ও উপলব্ধির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। নীচে চিত্রের সাহায্যে জ্ঞাতকরণ প্রক্রিয়াটি দেখানো হল।

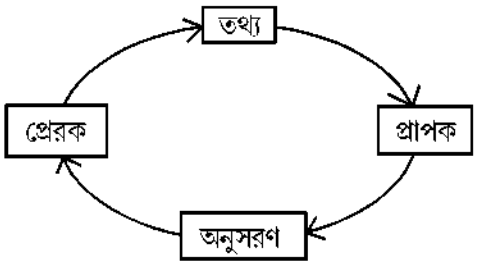


(Feed Back)

সংগঠনে উপযুক্ত জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তথ্য বা সংবাদ সরবরাহ করা এবং সরবরাহকৃত তথ্যাদি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আদর্শ জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণ তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। সেই কারণে ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান কার্য হল একটি কার্যকর জ্ঞাতকরণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও সেটি বজায় রাখা।

### ৮.৩.১ জ্ঞাতকরণের সংজ্ঞা (Definitions of Communication)

বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাবিদ্ জ্ঞাতকরণের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

অধ্যাপক এল. এ. অ্যালেন (Prof. L. A. Allen)-এর দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী "যখন কোনও ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির মনে কিছু ভাবধারা জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে যা কিছু করেন, তার সম্মিলিত রূপ হল জ্ঞাতকরণ। ইহা অভিপ্রায় প্রকাশের হেতু। সুব্যবস্থিত ও ধারাবাহিক বর্ণন, শ্রবণ এবং উপলব্ধিকরণ এর অন্তর্ভুক্ত।"

কুনজ এবং ওডোনেল (Koontz and O'Donnell)-এর মতে "জ্ঞাতকরণ বলতে বোঝায়, সেই উপায় যার মাধ্যমে কার্য সংগঠিত করা হয়, ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা যায় এবং তথ্যকে উৎপাদনশীল করে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য সফল করা যায়।"

নিউম্যান ও সামার (Newman and Summer)-এর মতে, "জ্ঞাতকরণ হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ঘটনা, ভাবধারা, মতামত এবং আবেগের বিনিময়।"

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাতকরণের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, "নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, ঘটনা, ধারণা, চিন্তা-ভাবনা বা মতবাদ বিনিময়ের জন্য বর্ণন, শ্রবণ এবং উপলব্ধিকরণ জনিত কার্যকলাপের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হল জ্ঞাতকরণ।"

## ৮.৩.২ সজ্ঞাতকরণের গুরুত্ব বা ভূমিকা

ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক ও জটিল ব্যবস্থাপনার যুগে জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কে. ডেভিস (K. Davis) বলেছেন "মানবদেহে রক্তধমনী যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জ্ঞাতকরণ ঠিক ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ।" জ্ঞাতকরণ সংগঠনকে গতিশীল করে তোলে এবং কার্য সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করে। প্রত্যেক বিভাগ, উপ-বিভাগ এবং প্রত্যেক স্তরের কর্মীদের কাছে কার্যকরী ও সঠিক তথ্য পরিবেশনের উপর ব্যবস্থাপনার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা উন্নত হলে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজসাধ্য হয়। সেই কারণে জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থাপনার এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যরূপে বিবেচিত হয়। ব্যবস্থাপনার জ্ঞাতকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়।

**(১) পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ভিত্তি :**

পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান হল তথ্যের প্রবাহ। তাই জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা ছাড়া উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনার পক্ষে কোনও বিষয়ে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব নয়। যে কোনও সিদ্ধান্তগ্রহণের আগে তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত জরুরি। আবার গৃহীত সিদ্ধান্তের কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও উত্তর জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। কোনও বিষয়ে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এবং সম্পাদিত কার্যের পর্যালোচনার জন্যও জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব অসীম।

**(২) পরিকল্পনা রূপায়ণে সহায়তা :**

ভবিষ্যতে সম্পাদনযোগ্য কার্যাবলির রূপরেখাই হল পরিকল্পনা। পরিকল্পনার মাধ্যমে নীতি, পদ্ধতি, নিয়মকানুন, কর্মসূচি প্রভৃতি স্থিরীকৃত হয় এবং উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যে অনুসৃত হয়। ব্যবস্থাপনার কার্য হল পরিকল্পনার বিষয়বস্তুগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া। জ্ঞাতকরণ সেই কার্য সম্পাদন করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

**(৩) সমন্বয়ের ভিত্তি :**

কারবারি প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষায়ণ ও শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য বিভিন্ন কার্যাবলির সুষ্ঠু সম্পাদন প্রয়োজন। সেই জন্য বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যিক। সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও কর্মীদের সম্পাদিত কার্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারাই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়। যথাযথ জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা ছাড়া সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। সুতরাং সমন্বয় প্রক্রিয়ার ভিত্তিই হল জ্ঞাতকরণ।

**(৪) ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি :**

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলির সুসংবদ্ধ ও দ্রুত রূপায়ণের জন্য জ্ঞাতকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা অধস্তন কর্মীদের বিভিন্ন তথ্য পাঠায় ও নির্দেশদান করে, দায়িত্বের বিভাজন ও কর্মীদের কার্যসম্পাদন তদারিক করে। এর ফলে কর্মীগণ তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়। জ্ঞাতকরণ, ব্যবস্থাপনার আদেশ-নির্দেশ অধস্তন কর্মীদের নিকট যথাযথভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

**(৫) সুষ্ঠু সাংগঠনিক কার্যকলাপ নিশ্চিতকরণ :**

কারবারি প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু কার্যসম্পাদন ও নিরবচ্ছিন্ন গতিধারা বজায় রাখতে জ্ঞাতকরণের ব্যবস্থা সাহায্য করে। সংগঠনের সমস্ত ধরনের ক্রিয়াকলাপ জ্ঞাতকরণের উপর নির্ভরশীল। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত কর্মীদের কী করতে হবে সে সম্পর্কে যদি স্পষ্ট ধারণা থাকে তবেই সংগঠনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। জ্ঞাতকরণের সাহায্যে এই স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। তাই উপযুক্ত জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে তথ্যের সঠিক প্রবাহ, ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ দূর করে সুষ্ঠু সাংগঠনিক কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করে।

**(৬) কার্যকর নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা :**

জ্ঞাতকরণ নেতৃত্বদানের ভিত্তি স্বরূপ। অধীনস্থ কর্মীদের সঙ্গে উপযুক্ত যোগাযোগ থাকলে তবেই নেতৃত্ব সফল হয়। নেতা যে নির্দেশ দান করেন অধীনস্থ কর্মীরা সেই নির্দেশ পালন করেন। উচ্চতর ব্যবস্থাপনার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট অধস্তন কর্মীদের জ্ঞাতকরণের উপরই নেতৃত্বদানের সাফল্য নির্ভর করে। জ্ঞাতকরণের দ্বারা কর্মীগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারেন। উত্তম জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপক ও অধস্তন কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে কার্যকর নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করে।

**(৭) অনুপ্রেরণায় সহায়তা :**

আদর্শ জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনাকে অধস্তন কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে থাকে। সাংগঠনিক সংঘাতের মূল কারণগুলি হল, ঘটনা সম্পর্কে কর্মীদের অজ্ঞতা, ব্যবস্থাপকদের অভিপ্রায় সম্পর্কে তাদের অস্পষ্ট ধারণা এবং পরস্পর ভুল বোঝাবুঝি। জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে মূল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে, কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং কার্যসম্পাদনে অনুপ্রাণিত হয়।

**(৮) জন-সম্পর্কের উন্নয়নে সাহায্যদান :**

কারবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর (যেমন, বিনিয়োগাকারী, ক্রেতা, কর্মচারী, পাওনাদার, সরকার ইত্যাদি) প্রতি কারবারের দায়বদ্ধতা থাকে। এই সমস্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে কারবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক বজায় রাখতে ব্যবস্থাপনাকে জ্ঞাতকরণের সাহায্য নিতে হয়। জ্ঞাতকরণের দ্বারাই জন-সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

## ৮.৪ জ্ঞাতকরণের প্রক্রিয়া

জ্ঞাতকরণ প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত চিত্র দ্বারা দেখানো হল :

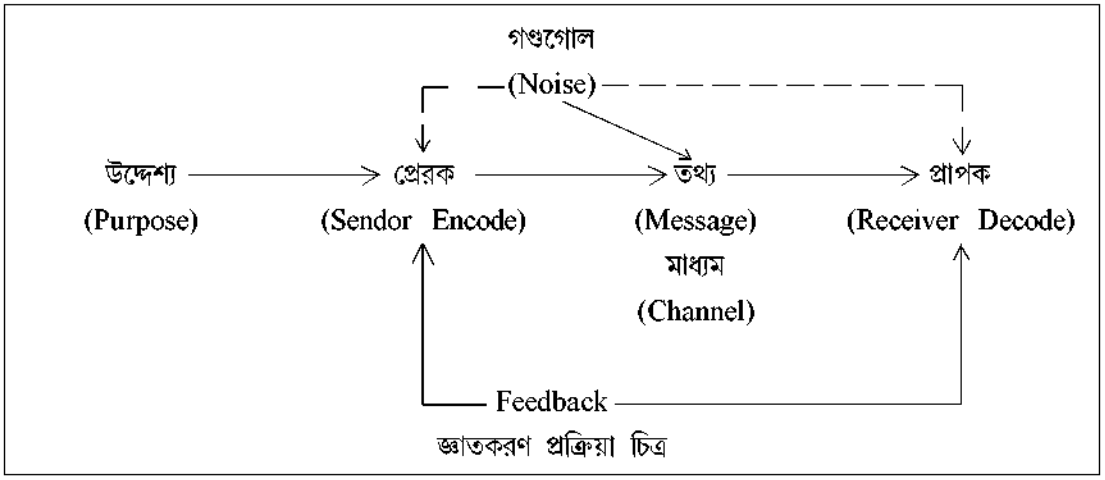

জ্ঞাতকরণ প্রক্রিয়া চিত্র

**উদ্দেশ্য (Purpose) :** জ্ঞাতকরণের প্রথম উপাদান হল উদ্দেশ্য। জ্ঞাতকরণ তখনই ঘটে যখন প্রেরক কোন তথ্য (Message) পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রেরকের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য আবার দুধরনের হতে পারে, যেমন—(i) মতামত বা ধারণা প্রকাশ করা যেখানে প্রেরক সাধারণত চাননা যে প্রাপক তথ্যের উপর তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুক। প্রাপক কেবল এখানে শ্রোতার ভূমিকা পালন করে থাকে। (ii) প্রাপকের নিকট থেকে দ্রুত সাড়া পাওয়া, যেমন কর্মচারীদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা। এখানে প্রেরক আশা করেন যে প্রাপক তথ্যের উপর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবেন।

**প্রেরক অথবা উৎস (The Sendor as the source) :**

প্রেরক একজন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা গোষ্ঠী যিনি তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করেন।

**পরিমার্জিতকরণ (Encoding) :** প্রেরক বিভিন্ন ধারণা, খবর এবং আবেগকে কিছু চিহ্নের মাধ্যমে তথ্যে রূপান্তর করেন।

**তথ্য (Message) :** চিহ্নিতকরণের দ্বারা রূপান্তরিত খবরের প্রেরণ।

**মাধ্যম (Channel) :** একে খবর পাঠানোর মাধ্যম বলা হয়। টেলিফোন, বেতার অথবা দূরদর্শন হল মৌখিক মাধ্যম আবার চিঠি, ই-মেল, ফ্যাক্স ইত্যাদি হল লিখিত মাধ্যম। উদ্দেশ্যের সাথে মিল করিয়ে মাধ্যম নির্বাচন করা হয়।

**প্রাপক (Receiver) :** প্রাপক হলেন সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি প্রেরক কর্তৃক পাঠানো তথ্য পেয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রাপক একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারেন।

**পুনরায় রূপান্তকরণ (Decoding) :** প্রেরকের পাঠানো তথ্যকে পুনরায় প্রাপক কর্তৃক রূপান্তকরণকে বোঝায়।

**গণ্ডগোল (Noise) :** তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে যেগুলো বাধাসৃষ্টি করে। তথ্য বোঝার ক্ষেত্রে যদি অসুবিধা তৈরী হয় তখনও তাকে গণ্ডগোল বলে। যন্ত্রপাতি, টেলিফোন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বাধা দেখা দিতে পারে।

**ফলাফল (Feedback) :** এই পদ্ধতিতে যিনি তথ্যের উৎস অর্থাৎ প্রেরকের কাছে তথ্য জ্ঞাপনের ফলাফল ফিরে আসে এবং এর ভিত্তিতে প্রেরক তার তথ্য প্রেরণ সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

## ৮.৫ জ্ঞাতকরণের বাধা

জ্ঞাতকরণের গুরুত্বপূর্ণ বাধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল :

**(ক) মনস্তাতিক বাধা (Psychological Barriers) :**

মানসিক এমন অনেক বিষয় থাকে যেগুলো জ্ঞাতকরণ কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু লোকের ভীতি, অবসাদ, বিকারগ্রস্ততা, কথা বলার অক্ষমতা ইত্যাদি জ্ঞাতকরণের বাধা হিসেবে কাজ করে থাকে।

**(খ) আবেগময় বাধা (Emotional Barriers) :**

যে ব্যক্তি আবেগপ্রবণতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক তিনি সহজেই জ্ঞাতকরণকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। অধিকমাত্রায় আবেগপ্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই বাধার সৃষ্টি করে থাকে।

**(গ) সাংস্কৃতিক বাধা (Cultural Barriers) :**

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ প্রতিষ্ঠানের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধর্ম, আচার-আচরণ, খাদ্যাভাষ, পোষাক-পরিচ্ছদ অনেকসময় সাংস্কৃতিক বাধা হিসেবে দেখা দিতে পারে।

**(ঘ) প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত বাধা (Organisational Structure Barriers) :**

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে জ্ঞাতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকে। প্রতিটি পদ্ধতির আবার নিজস্ব কিছু অসুবিধা থাকে। অধিকাংশ পদ্ধতির মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব এবং পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অনেক ভুল থাকার জন্য জ্ঞাতকরণের সময় বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

**(ঙ) ধারণাগত বাধা (Attitude Barrier) :**

সমাজে কিছু মানুষ আছেন যারা কেবলমাত্র একা থাকতে ভালবাসেন। তাঁরা অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করতে অপছন্দ করেন এমনকি অন্যের সঙ্গে খুব কম কথা বলেন। নিজেকে আড়াল করে রাখতে বেশি পছন্দ করেন। আবার কিছু মানুষ আছেন যারা কিনা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা সামাজিক, বেশি করে কথা বলেন, মানুষের সাথে মেলা-মেশা করতে অধিক আগ্রহী। এই উভয় ধরনের মানুষের ক্ষেত্রেই জ্ঞাতকরণে বাধা তৈরী হতে পারে।

**(চ) শারিরীক বাধা (Physical Barriers of Communication) :**

অনেক সময় বন্ধ দরজা, খারাপ যন্ত্রপাতি, গণ্ডগোল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে জ্ঞাতকরণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

**(ছ) প্রযুক্তিগত বাধা (Technological Barriers) :**

বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। প্রতিযোগিতাপূর্ণ আবহাওয়ায় কোন কারবারী প্রতিষ্ঠানকে সফলতা পেতে গেলে প্রযুক্তির ব্যবহার আবশ্যিক। আবার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের তার সঙ্গে মানিয়ে চলা, প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সাহায্যে প্রযুক্তি ব্যবহার শিখে নিতে হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিপ্রয়োগ জ্ঞাতকরণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

**(জ) সামাজিক বাধা (Social Barriers) :**

কারবারী প্রতিষ্ঠান যেহেতু সমাজে অবস্থান করে তাই সামাজিক বাধা অনেক সময় জ্ঞাতকরণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

## ৮.৬ সারাংশ

এই এককটি পড়ে আমরা ব্যবস্থাপনার এক অন্যতম কাজ জ্ঞাতকরণ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হলাম। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয় আর এই সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিতে হয়। জ্ঞাতকরণের ব্যবস্থা উন্নত হলে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। কারণ উন্নত জ্ঞাতকরণের ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করে, বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধন করে এবং কর্মীদের অনুপ্রাণিত করে প্রতিষ্ঠানে কার্যের সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

## ৮.৭ অনুশীলনী

(১) জ্ঞাতকরণের সংজ্ঞা দিন।

(২) ব্যবস্থাপনায় জ্ঞাতকরণের ভূমিকা বিবৃত করুন।

(৩) জ্ঞাতকরণের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

(৪) জ্ঞাতকরণের বাধা ব্যাখ্যা করুন।

(৫) সংস্কৃতি বাধা এবং মনস্তাত্ত্বিক বাধার মধ্যে পার্থক্য দেখান।

## ৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী


(১) Bhadra & Satpati, Management (Bengali) Dishari.

(২) Drucker, P.F., Management Challenges for the 21st Century, Butterworth, Oxford.

(৩) Koontz and Weirich, Essentials of Management, Tata McGraw Hill, New Delhi.

(৪) Tripathy, P.C., Reddy, P.N., Principles of Management, Tata McGraw Hill, New Delhi.

**NOTES**

**NOTES**

**NOTES**